ভাদ্র, ১৩৩১

প্রথম খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

আত্ম-সংযম

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

টলষ্টয় বলিয়াছেন,—

There has not been and cannot be a good life without self-control. Apart- from self-control no good life is imaginable. The attainment of goodness must begin with that.

Essays and Letters, p. 76 ("The First Step")

"আত্ম-সংযম ব্যতীত কেহ কখনও ভাল লোক হয় নাই, কেহ ভাল লোক হইতে পারে না। আত্ম-সংযম ব্যতীত ভাল জীবন কল্পনা করা যায় না। ভাল হইতে হইলে প্রথমে ইহা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।"

উপবাস দেওয়া এই আত্ম-সংযমের খুব সহায়ক বলিয়া টলষ্টয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Just as the first condition of a good life is self-control, so the first condition of a life of self-control is fasting (p. 78, Ibid)

"সাধুজীবনের পক্ষে আত্মসংযম যেরূপ সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আত্মসংযমের জন্য উপবাস সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়।" হিন্দুধর্ম্মে এত ব্রত উপবাসের ব্যবস্থা কেন, তাহার উত্তর টলষ্টয়ের উক্তিতে পাওয়া যাইবে। এই কারণেই হিন্দু বিধবার পক্ষে উপবাস দেওয়া এত প্রয়োজনীয় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উপবাস ব্যতীত আত্মসংযম অসম্ভব! আত্মসংযম সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু হিন্দু বিধবার পক্ষে আত্মসংযমের অভাব মৃত্যু তুল্য। এজন্য বিজ্ঞ চিকিৎসক যেরূপ তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ শাস্ত্রকার বিধবার পক্ষে নিয়মিত-ভাবে উপবাস দিবার বিধান দিয়াছেন।

উপবাসের প্রয়োজনীয়তা কেবল হিন্দুধর্মই স্বীকার করিয়াছেন, এমন নহে। রোজার সময় মুসলমানগণ দিনের পর দিন দীর্ঘকাল উপবাস দিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। খৃষ্টানধর্মেও উপবাস দিবার ব্যবস্থা আছে। রোমাণ ক্যাথলিকদের মধ্যে ধর্মভাব প্রোটেষ্টাণ্ট অপেক্ষা বেশী প্রবল। রোমাণ ক্যাথলিকদেরও ধর্মভাব এখনকার অপেক্ষা মধ্যযুগে (Mediaeval age) বেশী ছিল—এজন্য উপবাসেরও ব্যবস্থা প্রোটেষ্টাণ্ট অপেক্ষা রোমাণ ক্যাথলিকদের মধ্যে বেশী, এবং রোমাণ ক্যাথলিকদের মধ্যেও মধ্যযুগে ইহার আদর বেশী ছিল।

টলষ্টয় যে আত্মসংযমকে সাধু জীবনের মূল ভিত্তি বলিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রকারগণও তাহাকে সাধনার পথে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কঠোপনিষদে আছে,—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্য উপ্রেয়োবৃণীতে ॥

শ্রেয় (যাহা কল্যাণকর) এবং প্রেয় (যাহা রুচিকর) ইহারা বিভিন্ন বস্তু। ইহারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য (মোক্ষ এবং ভোগ) লইয়া পুরুষের মন আকর্ষণ করে। যিনি শ্রেয় গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়। আর যিনি প্রেয় গ্রহণ করেন তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌসম্পরীত্যবিবিনক্তিধীরঃ।
শ্রেয়োহিধীরোঽভি প্রেয়সোবৃণীতে
প্রেয়ো মন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥

শ্রেয় এবং প্রেয় মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরীক্ষা পূর্ব্বক উভয়ের প্রভেদ নির্ধারণ করেন। এবং প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয় গ্রহণ করেন। যিনি অল্প-বুদ্ধি তিনি অপ্রাপ্ত দ্রব্য পাইবার জন্য এবং প্রাপ্ত দ্রব্য রক্ষণের জন্য প্রেয় গ্রহণ করেন।

সাধুজীবনের সমস্ত ইতিহাস এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে নিহিত আছে। জীবনের প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তে দুইটি পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে—যে পথে যাইতে ভাল লাগে এবং যে পথে যাওয়া কর্ত্তব্য। যিনি যে পরিমাণে ভাল লাগার পথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের পথ গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহার জীবন সেই পরিমাণে সফল হয়। শিশু জীবন হইতে এই দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়—তাহার লেখা পড়া করিতে ভাল লাগে না, দিনরাত্রি খেলা করিতে ভাল লাগে, ঔষধ খাইতে ভাল লাগে না, পিতামাতার কথামত কার্য্য করিতে ভাল লাগে না। এই সময় হইতে তাহাকে শিখাইতে হইবে, ভাল লাগার পথ এক, কর্ত্তব্যের পথ আর। ইংরাজী, ইতিহাস বা ভূগোল শিক্ষা অপেক্ষা এই শিক্ষা সহস্রগুণে অধিক মূল্যবান। বয়স যেমন বাড়িতে থাকে, এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্ব নূতন নূতন আকারে দেখা দেয়—ভাল বেশ-ভূষা করিতে ভাল লাগে, উত্তেজক উপন্যাস পড়িতে ভাল লাগে, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিতে ভাল লাগে, ভোজনের বিলাস ভাল লাগে, ত্যাগের পথ ভাল লাগে না, ধর্মকথা ভাল লাগে না, সাধুসঙ্গ ভাল লাগে না। শ্রেয় এবং প্রেয়ের যে প্রশ্ন শিশুকালে ছেলেখেলার আকারে দেখা দেয়, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে প্রশ্নের আকৃতি ক্রমশঃ গুরুতর হইতে থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যে আত্মসংযমের কথা বলিয়াছি, তাহা এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের প্রশ্ন ব্যতীত আর কিছু নহে। প্রেয় গ্রহণ করিতে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আমাদিগকে শ্রেয় গ্রহণ করিতে হইবে। এক কথায় আত্মসংযমের প্রয়োজন।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র...অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। 'অথ' মানে অনন্তর। কিসের অনন্তর? শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফল ভোগ বিরাগ, সমদমাদিসাধনসম্পদ্, মুমুক্ষুত্বং—ইহাদের অনন্তর। ব্রহ্ম নিত্য বস্তু, আর সবই অনিত্য এই জ্ঞান হওয়া চাই। ইহকালে বা পরকালে ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা চাই। সমদম প্রভৃতি সাধনসমূহের প্রয়োজন। এবং মোক্ষের ইচ্ছা হওয়ার প্রয়োজন। এইগুলি হইলে তবে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকার হয়। যাঁহার অধিকার হয় নাই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা বিপদ্‌জনক; কারণ, ঐ চেষ্টা বৃথা পাণ্ডিত্যে পরিণত হয়। কিছু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি মনে করেন আমি খুব পণ্ডিত হইয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞান ত লাভ হয় না, অধিকন্তু তিনি ভাবেন যে, সাধু জীবন যাপনের জন্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মাবলি আছে সেগুলি তাঁহার মত পণ্ডিতের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে।

অধিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট এইসব গুণাবলির মধ্যে আত্ম-সংযমের কথা যথেষ্ট আছে। আত্মসংযম সমদমাদি সাধনের অন্তর্গত। সমদমাদি সাধনের অর্থ এই—বিষয় ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়ের যে লালসা, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়া রাখিতে হইবে; সুখদুঃখ শীত উষ্ণ প্রভৃতি বিপরীতধর্ম নির্বিকার ভাবে সহ্য করিতে হইবে, ভগবচ্চিন্তা অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকাল স্থিরভাবে অবস্থান করিতে হইবে; এবং গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। অতএব আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা উক্ত সাধনপ্রণালীতে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

মনুসংহিতাতে আত্মসংযমের কথা কি আছে অতঃপর তাহার আলোচনা করা যাইবে। এই আলোচনা একটু বিস্তৃত ভাবে করা হইবে। তাহার কারণ দুইটি। প্রথম কারণ এই যে, মনুসংহিতাতে এই আত্মসংযম প্রসঙ্গ অতি প্রাঞ্জল ও বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজকাল পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রের উপর একটা অনাস্থা হইয়াছে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, স্মৃতিশাস্ত্র মানিয়াই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দুই একজন মনীষী এই অন্যায় কথা প্রথম প্রচার করেন; তাঁহাদের ভক্তগণ ইহা যৎপরোনাস্তি পল্লবিত করেন। তাহার ফলে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি নির্ব্বিচারে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সমাজে সংযমের অভাব, স্বেচ্ছাচার, বিলাস, ভোগাসক্তি এ সকলের মধ্যে তাঁহারা বিশেষ অনিষ্টকর কিছু দেখিতে পান না। তাঁহারা আক্ষেপ করেন, হিন্দুসমাজ বড় বেশী শাস্ত্র মানিয়া চলে বলিয়া। যে শাস্ত্র আত্মসংযম, ভোগ বাসনা ত্যাগ, সরল জীবনযাপন, ঈশ্বরপরায়ণতা, প্রভৃতির কথায় পরিপূর্ণ, সে শাস্ত্র সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

তস্মাৎশাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ

"কোন কার্য্য করা উচিত এবং কোন কার্য্য করা উচিত নয়, শাস্ত্র দ্বারাই তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।"

মানুষ কি ভাবে আত্মসংযম হারাইয়া থাকে, এ বিষয়ে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অধিকাংশ স্থলে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হয় বলিয়াই মানব আত্মসংযম হারায়। মানব ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়। অনেক সময় ইন্দ্রিয়গণ শত্রুর ন্যায় অনিষ্ট করে। এই কারণে হিন্দু শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়কে রিপু বলা হইয়াছে। আত্মসংযম করিতে হইলে সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজবশে রাখিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। তাই মহাত্মা মনু তাঁহার প্রণীত ধর্ম-শাস্ত্রের প্রায় প্রারম্ভেই ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা বলিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং ॥
মনু ২।৮৮

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—ইহারা বিষয়। এই পাঁচটি বিষয় লইয়া বাহ্য জগৎ গঠিত হইয়াছে। বিষয়ের স্বভাব হইতেছে এই যে, তাহারা ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে—স্পর্শ ত্বক্ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। সেইরূপ রূপ, রস এবং গন্ধ আমাদের চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যথাক্রমে আকর্ষণ করে। যিনি বিদ্বান, তিনি ইন্দ্রিয়ের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত করিতে চেষ্টা করিবেন। সংযত করিবার অর্থ—বিবেচনা পূর্বক গুণ-দোষ বিচার করা; এবং যেখানে কোন দোষ নাই, কিংবা গুণ আছে, সেখানে ইন্দ্রিয়কে বিষয়াভিমুখে যাইতে দেওয়া; যেখানে দোষ আছে, সেখানে ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে বিরত করিয়া রাখা। কারণ, ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা ইন্দ্রিয়ের নাই। ইন্দ্রিয় বুঝিতে পারে কোন বিষয়টি 'প্রেয়'—কোনটি তাহার ভাল লাগে। কোনটি 'শ্রেয়' তাহা সে বিচার করিতে পারে না। কোনটি শ্রেয় তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা আছে "বুদ্ধির"। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বুদ্ধিপূর্বক স্থির করেন, কোন্ বিষয়টি শ্রেয় এবং কোন্‌টি শ্রেয় নহে; এবং সারথি তাহার অশ্বকে সংযত রাখিতে যে ভাবে যত্ন করে, বিদ্বান ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতে সেইরূপ যত্ন করেন। অশ্বের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইন্দ্রিয়গণ অশ্বের ন্যায় বলশালী। প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, অশ্বের বুদ্ধি খুব কম; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণেরও বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই। সারথি যদি একটু অসাবধান হয়, অশ্ব যদি একবার তাহার বশের বাহিরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে পথ-বিপথ-জ্ঞানশূন্য হইয়া অশ্ব প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলিও সেইরূপ একবার বশাতীত হইলে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়। এজন্য সারথি যেরূপ সর্বদা অবহিত হইয়া অশ্বকে সংযত করিয়া রাখে, জ্ঞানী ব্যক্তিরও সর্বদা সাবধান

হইয়া সেইরূপ ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া রাখা উচিত। ইন্দ্রিয় যে কেবলমাত্র দুষ্ট বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বিপদ ঘটায় তাহা নহে, ন্যায্য বিষয়েও ইন্দ্রিয় যদি অত্যধিক আকৃষ্ট হয় তাহা হইলেও সর্বনাশ হইতে পারে,—যেমন ঠিক পথেও অশ্ব যদি অত্যধিক এবং অসংযত বেগে ধাবিত হয়, তাহাতেও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই সব কারণে অশ্বের সহিত ইন্দ্রিয়ের উপমা দেওয়া অতি সুন্দর হইয়াছে। বস্তুতঃ এ উপমা মনু মহারাজের কল্পিত উপমা নহে। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার উপনিষদ হইতে উপমাটি আহৃত হইয়াছে। সেখানে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ উপমার মধ্যে এই উপমাটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এজন্য সেই স্থান হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহুঃ বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

শরীরের সহিত রথের তুলনা হইয়াছে। আত্মা রথীর ন্যায়, সে সাক্ষীস্বরূপ বসিয়া থাকে, নিজে কিছু করে না। বুদ্ধি হইতেছে সারথি। কোন্ পথে যাইতে হইবে, বুদ্ধি তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করে। বুদ্ধি যাহা স্থির করে, মন তাহা চায়, এবং ইন্দ্রিয়গুলি সেইদিকে চালিত হয়। এজন্য মনকে বল্গার সহিত এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শব্দ স্পর্শাদি বিষয়গুলি রথের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূমির ন্যায়।

স্থির হইল যে ইন্দ্রিয়-সংযম করার প্রয়োজন। এক্ষণে ইন্দ্রিয়গুলি কি বস্তু, তাহার পরিচয় লওয়া যাউক।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা॥

শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুঃ জিহ্বা নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বুদ্ধীন্দ্রিয়। মলদ্বার, জননেন্দ্রিয়, হস্ত, পদ ও বাক্য এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়।

একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিজ্জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গুণৌ॥
মনু ২।৯২

মনটি একাদশ ইন্দ্রিয়। ইহা কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই। মনকে জয় করিতে পারিলে অন্য দশটী ইন্দ্রিয়ই জয় করা যায়। মনে যখন আমাদের বিষয় ও বিশেষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হয়, তখন সেই বিষয় উপভোগের উপযোগী ইন্দ্রিয় সেই বিষয় অভিমুখে অগ্রসর হয়। মনে কি আকাঙ্ক্ষা হইবে না হইবে তাহা যদি আমাদের ইচ্ছাধীন হয়, যদি আমাদের মনে কোন অন্যায় বাসনার আবির্ভাব না হয়, তাহা হইলে কোন ইন্দ্রিয়ের অন্যায় প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যুগপৎ দশটী ইন্দ্রিয়কে পরিরক্ষা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার। আমি হয় ত খুব দৃঢ় হইয়া আছি যে, কোন কুখাদ্য খাইব না বা কুস্থানে যাইব না; কিন্তু মুখ দিয়া একটা রাগের কথা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আমি যদি কোন অন্যায় চিন্তা মনে আসিতে না দিই, তাহা হইলে দশটি ইন্দ্রিয়ই বাধ্য হইয়া সংযত থাকে। এজন্য বাহ্য আচরণ অপেক্ষা মনের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বেশী সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। যাঁহারা বলেন যে স্মৃতি শাস্ত্র কেবল বাহ্য আচারের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি যে যথার্থ নহে তাহা এই শ্লোক হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

ইন্দ্রিয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ইহা উপায় মাত্র। কিন্তু ইহা কেবল আধ্যাত্মিক জীবন লাভে সহায়তা করে এমন নহে, ইহা সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভের সহায়ক।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং!
সংনিযম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি॥ ২।৯৩

"ইন্দ্রিয়ে আসক্তি থাকিলে নিশ্চয়ই দোষ হইবে। সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিলে (সকল চেষ্টাতেই) সিদ্ধি লাভ করা যায়।"

সংসারে যে সকল দ্রব্যাদি লোকে পাইতে চেষ্টা করে, হিন্দু শাস্ত্রে সেগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। পরের উপকার করা, যাগযজ্ঞ করা, সাধারণতঃ পুণ্যকার্য্য মাত্র—ধর্মের অন্তর্গত। বিষয়, সম্পত্তি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি এই সব অর্থের অন্তর্গত। উত্তম আহার্য্য, পানীয়, বেশ-ভূষা, গৃহ-শয্যা প্রভৃতি কামের অন্তর্গত। এবং ঈশ্বর লাভ—যাহাতে সকল দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় এবং অনন্তকাল অসীম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়—যাহা পরম পুরুষার্থ—তাহাই মোক্ষ। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ লাভ করিবার উপায় সেই সেই বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নির্দিষ্ট পথে চলিলে তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে।

কিন্তু যাঁহার যাহাই উদ্দেশ্য হউক, সকল পথেই ইন্দ্রিয় সংযম অত্যন্ত সহায়ক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মনে কোন বাসনার উদয় হইলে সে বাসনা ভাল না হইলেও তাহা মিটাইয়া লওয়াই ভাল; নচেৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায় উপস্থিত হয়।

কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। বাসনা অন্যায় হইলে কিছুতেই তাহা চরিতার্থ করা উচিত নয়। কারণ, একবার চরিতার্থ করিলে ঐ বাসনার নিবৃত্তি হয় না—প্রত্যুত উহা অধিকতর বলবতী হয়। মনু মহারাজ ইহা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্ধতে॥ ২।৯৪

কাম বিষয় ভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না। দুষ্ট বাসনা চরিতার্থ করিয়া তাহা প্রশমিত করিবার ইচ্ছা, এবং ঘৃত ঢালিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা একইরূপ। মহাকবি শেক্সপিয়রের ভাষায় "Appetite grows by what it feeds on" অর্থাৎ "খাদ্য পাইয়া ক্ষুধা আরও বাড়িয়া উঠে।"

দুইটি উপমার মধ্যে মনুর উপমাটি অধিকতর সমুজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়।

অতিশয় ভোগও ভাল নয়, অতিশয় ত্যাগও ভাল নয়। গীতা উভয়ের নিন্দা করিয়াছেন।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্ত মনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥

অত্যধিক ভোজন এবং অত্যল্প ভোজন, অত্যধিক নিদ্রা এবং অত্যল্প নিদ্রা কিছুই ভাল নয়। কিন্তু কোনটা বেশী খারাপ তাহা এখানে বলা হয় নাই। মনু এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

যশ্চেতান্প্রাপ্নুয়াৎ সর্বং যশ্চেতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব কামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে॥ ২।৯৫

সকল বিষয় ভোগ অপেক্ষা সকল বিষয় ত্যাগ করা ভাল।

যিনি অতিশয় ত্যাগী তাঁহার ভুলটা ভালর দিকে—erring on the right side। গীতার শেষ অধ্যায়ে—কর্মসন্ন্যাসযোগ প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, একান্ত ত্যাগের পথেও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে—

শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী ধ্যানযোগপরায়ণঃ॥

এ পথেও সাধক "ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে"—ব্রহ্ম লাভ করেন। তবে গীতার উদ্দেশ্য বোধ হয় এইরূপ যে, কর্ম ত্যাগ পূর্বক সিদ্ধিলাভ করা অপেক্ষা কর্ম সম্পাদন পূর্বক সিদ্ধিলাভ করিবার পথ অপেক্ষাকৃত সহজ।

অত্যধিক ত্যাগের পথ যে সর্বোৎকৃষ্ট পথ নহে, তাহা মনুও বলিয়াছেন। মনে দুষ্ট বাসনার উদয় হইলে তাহা চরিতার্থ করা উচিত নয়। কিন্তু চরিতার্থ না করিলেই ঐ দুষ্ট বাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না—অপদেবতার ন্যায় দুষ্ট বাসনা প্রায়ই উঁকিঝুঁকি মারিয়া যায়। দুষ্ট বাসনা হইতে একান্ত নিষ্কৃতি পাইতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়—তাহা জ্ঞান। তাই মনু বলিয়াছেন,—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥ ২।৯৬

বিষয়ে আসক্ত ইন্দ্রিয়গুলির সেবা না করিলেই যে তাহাদিগকে সংযত করা যায় তাহা নহে। তাহাদিগকে সংযত করিবার উপায় জ্ঞান।

সে জ্ঞান কিরূপ—কুল্লকভট্ট তাহা টীকাতে প্রাঞ্জল করিয়া দিয়াছেন।

বিষয়াণাং ক্ষয়িত্বাদি দোষ জ্ঞানেন শরীরস্য
চ অস্থি স্থূলাদি দোষ চিন্তনেন। (অনুবাদ)

যখনই কোন বিষয় ভোগ করিতে প্রবল বাসনা হয়, তখনই চিন্তা করিতে হইবে যে, ভোগের বিষয় চিরস্থায়ী নহে, তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; দেহও অস্থি-মাংসের সমষ্টি মাত্র—এজন্য ভোগে আসক্তি থাকা উচিত নহে, এবং দেহের অতিরিক্ত আদর করিতে নাই। এইরূপ বার বার চিন্তা করিলে ঐরূপ দৃঢ় প্রত্যয় হয়। তখন ইন্দ্রিয়াসক্তি আপনা হইতে কমিয়া যায়।

এইরূপে যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন, মনু তাঁহার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা সবিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২।৯৮

যে মানব (কোন বিষয়) শ্রবণ করিয়া, স্পর্শ করিয়া, দর্শন করিয়া, ভোজন করিয়া বা ঘ্রাণ করিয়া হর্ষ বা

বিষাদ প্রাপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়। যিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয় ভোগ করিলে হর্ষ প্রাপ্ত হন, প্রতিকূল বিষয় ভোগ করিলে বিষাদ প্রাপ্ত হন। যিনি জিতেন্দ্রিয় তিনি অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয় ভোগ করিলে কোনরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য অনুভব করেন না।

জিতেন্দ্রিয় হইতে হইলে সকল ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। একাদশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দশটি ইন্দ্রিয় জয় করিয়া যদি কেহ একটিমাত্র ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যাইবে না। ঐ একটিমাত্র অবশীভূত ইন্দ্রিয় তাহার সাধনার পথে বিষম অন্তরায় হইবে,—এমন কি তাঁহার সমগ্র সাধনা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে।

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্বেষাং যদ্যেকংক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্যক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাদাদিবোদকম্ ॥২।৯৯

"সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটিমাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়-ভোগপ্রবণ হয়, তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রজ্ঞা (ধৈর্য্য বা জ্ঞান) নষ্ট হয়। চর্মপাত্রে জল রাখিলে, যদি সেই পাত্রে একটিমাত্র নিঃসারণ পথ থাকে, তাহা হইলে ঐ পথে সমস্ত জল নিঃসারিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ।"

বশেকৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥২।১০০

"ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিয়া এবং মন সংযমন পূর্বক সকল বিষয়ে সাধনা করিতে হয়। ইন্দ্রিয় বশীভূত করিবার সময় যাহাতে শরীরের অধিক ক্লেশ না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

বহু দিবসের অভ্যাসের ফলে যাঁহার আহার-বিহারাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়প্রবণতা বা বিলাসিতা কিছু পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি যদি হঠাৎ সমগ্র বিলাস পরিত্যাগ করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার শরীরে হয় ত তাহা সহ্য হইবে না। এজন্য তাঁহাকে শরীরকে ক্রমশঃ সহাইয়া ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নচেৎ শরীরে সহ্য না হইলে সাধনার পথে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইবে।

জন্মাষ্টমী

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণপক্ষ বাদল তামসী নিশা
ক্ষণে ক্ষণে ফুটে বিদ্যুল্লেখা উজলিয়া দশ দিশা।
কে জানে কোথায় কি হয় ধরায় কে খোঁজ রাখিছে তার
কোথা ফুটে ফুল কোথা জাগে গান কোথা টুটে প্রেমহার!
উচ্চ প্রাসাদে মত্ত প্রমোদে উঠিয়া অট্টহাসি
ক্রমে ক্ষীণতর ঢুলিয়া পড়িছে জড়িত রচনে আসি
রজনী বিলাস বিরাম লভিল কংসের রাজপুরে
ধ্বনিয়া উঠিল আর্ত্তের ব্যথা বিশাল রাজ্য জুড়ে—
"এস ভগবান্, কর' আসি ত্রাণ, দুর্ব্বহ প্রাণ, মরি,
জয় নারায়ণ জগত্তারণ পতিত-পাবন হরি।"

আকাশে বাতাসে বজ্র করিছে খেলা—
রাজার কক্ষে নগ্ন বক্ষে কামিনীর মোহ-মেলা!
আজি মথুরায় কাঁদিয়া বেড়ায় শুচি রুচি প্রীতি প্রাণ,
আবাল বৃদ্ধ নারীর চিত্ত ঘন বিভীষিকা-ম্লান!
রাজার রাজ্য পালিছেন রাজা প্রজা সে রহিবে চুপ,
তার ক্ষয় শুধু জোগাবে রসদ রৌপ্য এবং রূপ!
রাজার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে উদ্যত তরবারি
নগরে ও পুরে সদা চর ঘুরে অতিষ্ঠ নরনারী—
"এস ভগবান্, কর' আসি ত্রাণ, দুর্ব্বহ প্রাণ, মরি,
জয় নারায়ণ জগত্তারণ পতিত-পাবন, হরি।"

কংস মরিবে রাজ্য ধ্বংস হবে"—
শুনি কহে রাজা—"দুষ্ট প্রজার বিদ্রোহ বাণী তবে!"
রাজার আদেশে আবার সে দেশে শাসন হইল সুরু—
লাঞ্ছিত নারী, মর্দ্দিত যুবা অবিচারে লঘু গুরু।
মা'র পদতলে পাষাণে আছাড়ি শিশু সব হত হয়,
স্বামীর সমুখে সতীর ধর্ম্ম রাজদূত করে লয়।
নগরোপান্তে যোজন ব্যাপিয়া গঠিল বিপুল কারা
কাঁদিছে বন্দী নরনারীগণ শিহরে বিশ্ব সারা—
"এস ভগবান্, কর' আসি ত্রাণ, দুর্ব্বহ প্রাণ, মরি,
জয় নারায়ণ জগত্তারণ পতিত-পাবন, হরি।"

আর্ত্ত-অশ্রু শ্রাবণ ধারার রাতে
বেদন বিজুরী রোদন-বজ্র দীর্ঘশ্বাস বাতে
উরিল রে হের নিঃস্বের গতি বিশ্ব-রাজাধিরাজ,
আর ভয় নাই, আতুর আর্ত্ত ওরে পাপী, তোর আজ!
কংস কারার আঁধারে যখন কাঁদিছে বন্দীগণ
নির্য্যাতিতা মা দেবকী-গর্ভে জনমিলা নারায়ণ!
কালো রাজ্যের কালিমা হরিতে কালো রূপে আলো করি
আসিল কৃষ্ণ ভুবন মোহন—হে জগৎ লও বরি!
"এস ভগবান্, কর' আসি ত্রাণ, দুর্ব্বহ প্রাণ, মরি,
জয় নারায়ণ জগত্তারণ পতিত পাবন, হরি।"

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৭)

বগলা দেবী তখন দ্বিতলে ছাদে বসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কলিকাতা নগরী দেখিতেছিলেন; উমা নীচে পূজার ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা সারিয়া লইতেছিল। ঊষা আসিবে,—তাহার প্রাণটা ভারি ছটফট করিতেছিল।

"দিদি!"

এই আহ্বানটী তাহার কাণে ভাসিয়া আসিতেই, সে চাহিয়া দেখিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঊষা। তাহার পিছনে আরও দুটী মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল,—একটিকে সে আজই মটরে দেখিয়াছিল, অপরা তাহার অপরিচিতা।

সতী সাদাসিদা পোষাকেই আসিয়াছিল। তাহার গায়ে একটী ব্লাউস, একটী পেটিকোট, তাহার উপর একখানি সরু কালাপেড়ে ধুতি। কিন্তু রেখা খুব বেশী করিয়াই সাজিয়া আসিয়াছিল। তাহার পায়ে পাতলা ফুলতোলা ষ্টকিং, উঁচু গোড়ালীর জুতা, শাড়ীখানাও খুব পরিপাটী করিয়া পরিয়াছে। সে সতীকেও সাজাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু সতী কিছুতেই রাজী হয় নাই। রেখা আসিয়াছিল অত্যন্ত রাগ করিয়া,—মূল হইতেছে মনীশ। তাহার সখী যাহাকে ভালবাসে, তাহার প্রণয়িনীকে সে সম্পূর্ণ ছাঁটিয়া ফেলিতে চায়। সে দেখাইতে চায়—তাহারা কি আর উমা কি! কিন্তু সতী তাহা বুঝে নাই, সে অত্যন্ত অবনত ভাবেই আসিয়াছিল। সে যথার্থ জানিয়াছিল, যাহার কাছে সে যাইতেছে, তাহার মত ধনী কেহ নাই, আবার তাহার মত নিঃস্বও জগতে পাওয়া দুর্ল্লভ।

উমা তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল। সে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঊষা দূর হইতেই তাহাকে প্রণাম করিল। পুণ্যবতী তাপসী দিদিকে স্পর্শ করিতে সে ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিতেছিল। উমা তাহার সঙ্কোচ বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিল,—দুই হাতে তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ললাটে একটা স্নেহ-চুম্বন দিয়া বলিল, "কিরে, আমায় ছুঁতে তোর ভয় হচ্ছে? তোর দিদি কি এতই উঁচু হয়েছে, আর তুই কি এতই নীচু হয়ে পড়েছিস ঊষা? তুইও যেমন তেমনি আছিস, আমিও যেমন তেমনি আছি, তবে এত দূরে থাকছিস কেন?"

বহুদিন পরে দিদির স্নেহময় বুকে মুখখানা রাখিয়া ঊষার চোখে জল আসিয়া পড়িল,—কত পুরাতন কথায় তাহার বুকখানা ভরিয়া উঠিল।

উমার চোখেও জল আসিতেছিল। সে তাহা সামলাইয়া, একটু হাসিয়া, মেয়ে দুটীর পানে চাহিয়া বলিল, "এস ভাই, আমি প্রথমেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি নি,

তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। উপুরেচল—নীচেটা বড় সাঁত-সেঁতে, জল উঠছে।"

বগলা দেবীর কাছে গিয়া সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "ঊষা এসেছে ঠাকুর মা।"

বগলা দেবী বিস্ফারিত নেত্রে ঊষার পানে চাহিলেন; সদুঃখে বলিলেন, "আ পোঁড়া কপাল, এই নাকি ঊষা? হ্যাঁরে উমা, তবে যে বলেছিলি, ঊষা খিষ্টেন হয় নি, সে হিন্দুই আছে। এ যে একেবারে খিষ্টেন হয়ে গ্যাছে, সে ঊষা তো আর নেই।"

তিনি যে ভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন ও অমর-নাথের উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সাহস করিয়া ঊষা তাঁহাকে একটা প্রণামও করিতে পারিল না।

উমা একটু বিরক্ত হইয়া বলিল "কি বলছ ঠাকুর মা তার কিছু ঠিক নেই। ঊষার কি বদল হতে দেখলে তুমি? আমি তো দেখছি, যেমন ঊষা তেমনই রয়েছে, কিছুই বদলায় নি।"

ঠাকুর মা নাক ঝাড়িয়া ফেলিতে, খানিকটা তরল পদার্থ ছিটকাইয়া গিয়া সতীর কাপড়ে লাগিয়া গেল। রেখা অস্ফুটস্বরে বলিল "ন্যাষ্টি!"

ঠাকুর মা সে দিকে মনোযোগ না দিয়া সানুনাসিক স্বরে বলিলেন "তুই বলছিস উমা, কিছুই বদলায় নি,—আমি দেখছি সব বদলেছে। আমায় একটা প্রণাম পর্য্যন্ত করলে না, আবার বলছিস কিছু হয় নি। তোরা সবাই মিলে আমার এমন সর্ব্বনাশটাও করলি,—আমার বুকটাকে একেবারে ভেঙ্গে দিলি।"

সেই সময় মনীশের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উমাকে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ও ঊষার মুখ দেখিয়া তিনি বগলা দেবীকে একটা ধমক দিয়া বলিলেন, "আপনি তো আচ্ছা লোক মা। শুধু শুধু এমন ভাবে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন, যেন কি একখানা ব্যাপার ঘটেছে। উমা যাও তো মা, সতরঞ্চিখানা এনে এঁদের বসবার জন্যে পেতে দাও। হাঁ করে তুমিও দাঁড়িয়ে রয়েছ ছেলেমানুষের মত!"

উমা তাড়াতাড়ি সতরঞ্চ আনিয়া পাতিয়া দিল। মনীশের মা রেখা ও সতীর হাত ধরিয়া বসাইয়া দিলেন—"বস মা, ওঁর কথা কিছু ধরো না। অতিরিক্ত বুড়ো হলে মানুষের অমনি হয়ে থাকে।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "মানুষকে একেবারে তাজ্জব করে দিতে আমার এই ঠাকুর মাটী যেমন, তেমন আর কেউ নয়। তোমরা কিছু ভেব না ভাই, দেখ না, এখনি আবার যে মানুষ সেই মানুষ হয়ে যাবেন দেখ। আজ একাদশী কি না, তাইতেই আরও অমনি করে উঠেছেন।"

সতী শান্ত হাসি হাসিল, রেখা ঈর্ষাপূর্ণ কটাক্ষে চাহিল।

সে কিছুতেই উমাকে সরল চোখে দেখিতে পারিত-ছিল না। উমার জন্যই তাহার বাল্য-সখী আজ এত কষ্ট পাইতেছে, এ কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। উমার মধ্যে যে পবিত্র সত্যটা জাগিতেছিল, তাহা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল, রেখা তাহা দেখিয়াও দেখিতে চাহিতেছিল না।

দুই একটা কথা বলিয়া উমা মনীশের মায়ের সহিত নীচে চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঊষাও ছুটিল। বগলা দেবীও তাহার একটু পরে গা-ঢাকা দিলেন।

নির্জ্জন পাইয়া রেখা জিজ্ঞাসা করিল, "উমাকে কি রকম দেখছ?"

সতী বলিল, "খুব ভাল। যা দুই একটা কথা আমি শুনলুম, তাতে বেশ জানা যাচ্ছে, উমার হৃদয় খুব উন্নত, মার্জ্জিত। আমার বউদিটা যেমন,—না এ দিক না ওদিক, কোন দিকেই না।"

বউদির ছেলেমানুষির কথা মনে করিয়া সতীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রেখা কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় উমা ফিরিয়া আসিল। নিকটে বসিয়া হাসিমুখে বলিল, "দেখ তো অন্যায়, খাবার করতে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে ঊষাও গিয়ে হাজির। তার পরে ঠাকুর মা—তিনিও দেখি কোনও রকমে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। ওঁকে আমি কোথায় বসিয়ে রেখে গেলুম—"

সতী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ওঁর বোধ হয় ভয় হয়েছিল, পাছে আমরা দুটিতে আধাআধি বখরা করে ওঁকে খেয়ে ফেলি।"

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল। উমা বলিল, "হ্যাঁ, সেটা

ভাবতে পারেন বটে; কারণ উনি দেশ ছেড়ে কখনও বার হন নি। তোমরা ভাই ওঁর কোনও দোষ নিয়ো না। একে লেখা পড়া জানেন না, কাকে কি বলতে হয় তাও জানেন না, যে জায়গায় আছেন সেখানে সভ্যতার ধার কেউ ধারেও না, কাজেই সে সবও জানেন না।"

সতী বলিল, "না, না, দোষ ধরব কেন? আমাদেরও তো ঠাকুর মা উনি—শুধু তোমাদেরই তো নন। অমনি একটা ঠাকুর মা থাকা ভাল, মেয়ে বউ অনেকটা বশে থাকে।"

উমা তাহার মুখের দিকে বিস্ময়ের ভাবে একটু তাকাইয়া তাহার পর একটু হাসিল।

এই দুইটী মেয়ের মধ্যে সতীই তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল খুব বেশী রকমেই। সতীর চোখে মুখে যে শান্ততা দেখিতেছিল; কিন্তু রেখার মুখে জাগিয়া-ছিল গর্ব্বের চিহ্ন। সেই জন্য সে রেখাকে বেশী নাড়িতে সাহস করিতেছিল না,—যা কথাবার্ত্তা চলিতেছিল সবই সতীর সঙ্গে।

রেখা বলিল "ঘরগুলো দেখাও না ভাই, মনীশ বাবুর ঘরটায় না কি ভারি জ্ঞান ভরা আছে, সেই জন্যেই আমার আসা। সেদিন কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, আমার ঘরটা জ্ঞানের ভাণ্ডার; সে জ্ঞানের ভাণ্ডারটা একবার দেখে যাওয়া উচিত নয় সতী?"

সতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেটা তুমিই জানো।"

রেখা গম্ভীর ভাবে কেবল মাথা দুলাইল। উমা বলিল, "দেখতে চাও এস, কিন্তু জ্ঞান তো সেখানে আমি একটুও দেখতে পাই নে।"

মনীশের গৃহের দ্বার সে খুলিয়া দিল।

গৃহের এক পাশে ছোট একটা টেবিল, তাহার পাশে একখানা চেয়ার মাত্র। টেবিলের উপর খানকতক বই, খাতা সাজানো। দেওয়ালে বইয়ের আলমারী, বইগুলা পরিষ্কার ভাবে সাজানো। এক পাশে একটা স্প্রীংয়ের খাট,—মনীশের বিছানাটা গুটানো পড়িয়া আছে। দেয়ালে মনীশের বৃহৎ একখানা অয়েল পেন্টিং, তাহাতে মা বসিয়া, পায়ের কাছে মনীশ ও দানীশ। দেয়ালে আরও কয়েকখানা ছবি ছিল,—তাহাতে সতীদের বাড়ীর আধুনিক সভ্যতার ছবির মত একখানাও ছিল না।

রেখা মুখখানা বক্র করিয়া বলিল, "মনীশ বাবুর রুচি চমৎকার। এই ঘরে বসে তিনি যে কি জ্ঞান উপার্জ্জন করেন, তা আমি বলতে পারি নে। দেখা যাক, এই বই কয়খানা নেড়ে চেড়ে—এতে যদি কোনও জ্ঞান থাকে।"

উমা হাসি মুখে বলিল "বই গুলোয় যথার্থ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানটাই মনীশদা পেয়েছেন। ওগুলো আমাদের শাস্ত্র।"

রেখা মুখ ফিরাইয়া একটা খোঁচা দিয়া বলিল "তুমিও তো শাস্ত্র জান ভাই, সেই জন্যেই মুনীশ বাবুর সঙ্গে তোমার অত মেলে।"

উমা বলিল "শাস্ত্র আমি কিছুই জানিনে, তবে যেটা মনীশদা বলেন সেইটেই শুনে যাই, মেনে যাই। অনেক সময় তাঁর মতের সঙ্গে হয় তো আমার মতের মিল হয় না, তাতে তিনিই চটে উঠেন। এই একটা কথা সেদিন হয়েছিল, তিনিও ত ভুল বুঝেছিলেন, আমিও ভুল বুঝেছিলুম, সেই ভুলের কথাতেই তিনি পালিয়েছেন।"

সতী উৎসুক চোখ দুটি তাহার মুখের উপর রাখিল, বলিল "কি ভুল?"

উমা একটু হাসিয়া সে কথা চাপা দিবার চেষ্টায় বলিল, "সে একটা কথা। বলতে পারতুম—যদি সময় পাই কোনও দিন তবে বলব। আজ আমায় মাপ করতে হবে ভাই, সে কথা আজ বলতে পারব না।"

সতীর মুখটা গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে সরিয়া গিয়া একখানা ছবির কাছে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

রেখা ততক্ষণ টেবিলের বই খাতাগুলা নাড়াচাড়া করিতেছিল। একখানা খাতা তুলিয়া সে সতীর পানে চাহিয়া বলিল "মনীশবাবুর একটা লেখা পড় সতী, দেখ, আমি যা বলেছি তাই ঠিক কি না?"

প্রবন্ধটী স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহ প্রভৃতি লইয়া লিখিত। স্ত্রীলোককে যেভাবে শিক্ষিতা করা আদিমকালে হইত, আজকালকার শিক্ষার সহিত সেই শিক্ষার তুলনা করা হইয়াছে। মনীশ তাহার লেখায় ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে—পূর্ব্বকালেও মেয়েরা খুবই শিক্ষিতা হইতেন, কিন্তু সেটা সংযমের মধ্য দিয়া—ব্রহ্মচর্য্যের

মধ্য দিয়া। শুধু পুরুষদের জন্যই যে শিক্ষা, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ছিল তাহা নয়, মেয়েদের জন্যও ছিল। আজকালও মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—কিন্তু তাহাতে সুনীতি ও সংযমতার একেবারেই অভাব।

লেখা পড়িয়া সতী একটু হাসিয়া বলিল "মনীশবাবু আমাদের একেবারে অপদার্থ বলে মনে করেন।"

রেখা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "শুধু কথাতেই তাঁর সেই ঘৃণার ভাবটা ফুটে ওঠে না, লেখার মধ্যেও সে ভাব ফুটে বেরিয়েছে।"

উমা শান্ত কণ্ঠে বলিল "তোমরা তাঁর কথা বুঝতে পার নি ভাই। তাঁর কথা বলার রকমটাই এমনি—হঠাৎ কেউ বুঝতে পারে না; কাজেই তাঁর উপরে বিরক্ত হয়। আমি মনীশদাকে বেশ চিনি। তিনি এতে তোমাদের নিন্দে করেন নি। তিনি বলতে চাচ্ছেন—এই লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে যদি সংযমটাকে আনতে পারা যায়, সেই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়। শূন্যগর্ভ লেখাপড়া কোনও কাজের হতে পারে না। অবশ্য আমি বাইরের কাজ বলছিনে, অন্তরের কাজ বলছি—যা আমাদের সঙ্গে ভগবানের সংযোগ করে রাখে।"

রেখা কথাটা চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল, পারিল না, বলিয়া ফেলিল "তুমি পেরেছ?"

উমা বিস্ময়ে বলিল "আমি! আমি কি পারব? আমার শিক্ষা কতটুকু ভাই! তবু তার মধ্যে যেটুকু হতে পারে তা পেরেছি। আমি তো সব বিলিয়েই বসে আছি ভাই, আমার আর কি আছে? আমি যে বিধবা, ব্রহ্মচারিণী।"

রেখা বলিল "আজ একাদশী তুমিও করেছ?"

উমা বলিল "করেছি।"

রেখা হাতের খাতাখানা টেবিলে রাখিয়া বলিল "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, একাদশী করে কি লাভ?"

"লাভ?" উমা হাসিয়া ফেলিল; স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল "লাভ আমাদের প্রবৃত্তিকে দমনে রাখা। ভগবানকে পাওয়া যদি কথার কথা হতো, যদি হাত বাড়িয়েই পাওয়া যেত, তবে ভাবনা কি থাকত ভাই? কত উপরে আছেন তিনি, আমাদের যেতে গেলে ধাপে ধাপে উঠতে হবে। সংযম সব সময়েই দরকার। ধাপ—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি প্রভৃতি। সংযম না করতে পারলে আমি পারব কি করে উঠতে? আমরা উপবাস করি অভ্যাসের জন্যে, সকল ইন্দ্রিয়কে বশে আনবার জন্যে। তারা আমাদের চাকরের মত খাটিয়ে নেয়। আমরা তাদের খাটাতে চাই, এই জন্যেই আমাদের একাদশী করা।"

রেখা বলিল "দেহকে কষ্ট না দিলে বুঝি ভগবানকে পাওয়া যায় না?"

তাহার কথার মধ্যে শ্লেষোক্তি ফুটিতেছিল।

উমা তেমনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল "কই আর তা পাওয়া যায়? তবে যাঁরা জন্মজন্মান্তর ধরে এই একই লক্ষ্য নিয়ে আসছেন—তাঁদের কথা, এ জন্মে, আলাদা। কিন্তু তেমনি এটাও জানতে হবে, তাঁরা কত জন্ম ধরে এমনি করে উপবাস করেছেন—কোনও দিন অর্দ্ধাশনেও কাটিয়েছেন। দেহকে কষ্ট দেওয়া তো এতে হয় না, ইন্দ্রিয়কে বশে আনবার জন্যে এটা করতে হয়। ভগবানকে ভোগের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় না, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়। এই ত্যাগের মধ্যে দিয়েই ভগবানকে অনেকে পেয়েছেন। সংযম ত্যাগেরই একটা দিক। আমরা যে ত্যাগ করতে পারব—এই সংযমের দ্বারাই তা প্রতিপন্ন হবে।"

উমার কথাগুলো সতীর বুকের মধ্যে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। উমার মুখে সে মনীশের কথাই পাইল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—ইহা মনীশের কথা না উমারই কথা।

রেখা তর্কে হটিল না, বলিল, "অনেকে ত্যাগ না করেও ভগবানকে পেয়েছেন। যাঁরা ব্রহ্মবাদী—"

উমা স্থির কণ্ঠে বলিল "সে আলাদা কথা নয়, তারও মূলে এই সংযম। আমাদের শাস্ত্র বলছে, মানুষ মরলেই ফুরায় না, কর্ম্মফলে আবার তাকে টেনে আনে। আমরা হিন্দু, আমরা কর্ম্মফল মানি, জন্মান্তরবাদ মানি। আমরা জানি, একটা জন্মেই আমাদের সব ফুরিয়ে যায় না, আমাদের অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। সেই অসম্পূর্ণতাটা পূর্ণ করতেই আমরা বারবার সংসারের বুকে আসা যাওয়া করছি। যাঁকে বলছ ত্যাগ না করেও ভগবানকে পেয়েছেন, তিনি কত জন্ম জন্মান্তর ধরে ত্যাগের সাধনা করে আসছেন, কঠোর সংযম প্রতিপালন করে আসছেন। এ জন্মে তিনি ত্যাগের ভাব দেখান নি, কিন্তু অন্তর তাঁর

যথার্থ ত্যাগী। তাঁর কাছে আসা যাওয়া যাঁদের, তাঁরা কেউই তাঁকে সুখ বা দুঃখ কিছুই দিতে পারে না।"

রেখা আর কথা কহিতে পারিল না, বলিবার মত আর কিছু সে খুঁজিয়া পাইল না।

সতী প্রশংসমান নেত্রে উমার পানে চাহিয়া রহিল। শুধু রূপ নয়, জ্ঞানেও যাহার হৃদয় এত উন্নত, সে যে যথার্থই সকলের কাছে ভক্তি ভালবাসা পাইবার যোগ্য। সম্মুখে পুণ্যতোয়া সুশীতল গঙ্গাবারি থাকিতে কুপজল পান করিতে ছুটিয়া যায় কে? মনীশের সম্মুখে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী উমা,—সে ব্রহ্মচারিণী; ত্যাগই যাহার মূলমন্ত্র, সংযম যাহার সঙ্গিনী। মনীশ বিলাসের পানে চাহিবে কি করিয়া? সে যাহা চায়, এখানে সে তাহাই মিলে। উমার কিছু নাই; কিন্তু সতী দেখিতেছে, উমার যাহা আছে, তাহা তাহার নাই। তুচ্ছ ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রি, তুচ্ছ সে বাহিরের জ্ঞান! সে যদি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারিত তাহার বিনিময়ে,—নিজের জীবনকে সে যে তাহা হইলে সার্থক বলিয়া ভাবিতে পারিত।

মনীশের মা বাহিরে জায়গা করিয়া খাবার দিয়া ডাকিলেন।

সতী বাহির হইয়া খাবার দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল "এসব কেন দিচ্ছেন? আজ উমার মুখে যা শুনেছি, তাতেই পেট ভরে গ্যাছে। খাবারের দরকার নেই মা, ও সব তুলুন।"

মনীশের মা হাসিয়া বলিলেন "কি শুনেছ মা উমার মুখে?"

উমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কিছু না খুড়িমা। জিজ্ঞাসা করছিলেন একাদশী করে কি লাভ হয়; তাই বলছিলুম।"

জলখাবার খাইয়া সতী ও রেখা বিদায় চাহিল। উষা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সকলকে প্রণাম করিল।

উমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমি তো কাল-পরশুই চলে যাব উষা, তোকে ওঁরা পাঠাবেন না—বাবার সঙ্গে তোর দেখা হ'ল না। যাই হোক, মনে কিছু দুঃখ করিস্ নে উষা, ভগবানের উপরে মনটা ঠিক করে নে, যা বলবে তাই করে যাবি।"

সতীর পানে চাহিয়া বলিল "এক দিন তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দিয়ো ভাই, পরশু বিকেলে আমরা যাব। কালকের মধ্যে যাতে তোমার দাদা একবার আসেন, তাই বলে দিয়ো।"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল, "আর এ তো ভাই কুসংস্কারভরা প্রসাদপুর নয়—যেখানকার মেয়েরা অনায়াসে পুরুষের গায়ে হাত পর্য্যন্ত তোলে, কত রকম কথা বলে, যে সব কথার মধ্যে তোমার দাদা ঢুকতেই পারেন না। সেখানকার শিয়ালের ডাক শুনে না কি তোমার দাদা একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। আর আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে যখন আরতির শাঁক ঘণ্টা বেজে উঠেছিল, তোমার দাদা তখন না কি দুই কাণে আঙ্গুল দিয়ে ছুটে পালিয়েছিলেন। তাঁর ডাক্তারী শাস্ত্রে না কি লেখা আছে, বেশী শব্দে মাথার কোন শিরা ছিঁড়ে যায়। এ ভাই কলিকাতা; আর এ তাঁর বন্ধুরই বাড়ী, এখানে তিনি, অনেকবারই এসেছেন। আসতে বল তাঁকে একবার, ঠাকুরমা একবার দেখতে চেয়েছেন।"

সতী বলিল "নিশ্চয়ই বলব।"

তাহারা চলিয়া গেল।

উমা খানিক শূন্য হৃদয়ে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া উপরে গেল।

"আচ্ছা খুড়িমা, সতী মেয়েটী তো বেশ। ওর সঙ্গে মনীশদার বিয়ে দিলে ভাল হয় না?"

খুড়িমা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন "মেয়ে খুব ভাল, কিন্তু মনীশ বিয়ের উপরে একেবারেই চটা। এক দিন তোমার ভগ্নিপতিই মনীশকে বলেছিল,—মনীশ একেবারে রুখে ওঠায় বেচারা ভয়ে চুপ।"

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কিন্তু খাসা মেয়ে। এত যে লেখাপড়া শিখেছে, তা একটু জানা যায় না। উষাও বললে, সে বড় ভাল মানুষ। আর সে চুপে চুপে বললে, মনীশদাকে না কি বড্ড ভালবাসে। তাই শুনেই তো আমার ভারি ইচ্ছে হয়েছে। যখন মনীশদা আসবে তখন আমি থাকব না,—নইলে আমিই জোর করে বলতুম।"

খুড়িমা হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, সে এলে পরে আমি তাকে প্রসাদপুরে পাঠিয়ে দেব,—দেখব, কেমন করে তাকে রাজী করতে পার।"

(১৮)

উমা ফিরিয়া আসিল।

অমরনাথ হর্ষোৎফুল্লনেত্রে কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন "গঙ্গাস্নান করে এসে মা আরও রোগাই হয়ে গেছিস।"

উমা নিজের পানে চাহিয়া পিতার পানে চাহিল, "না বাবা, তুমিই রোগা হয়ে গ্যাছ। বামন ঠাকরুণের হাতের রান্না, দেখবার শুনবারও লোক ছিল না, রোগা আর হবে না? আমি গঙ্গাস্নান করতেই যে গেছলুম তা নয় বাবা, ঊষাকে একবার দেখতে গেলুম, সে কেমন আছে তাই ঠিক করে শুনতে গেলুম। দেখলুম, সে বেশ ভালই আছে।"

কন্যার কথা মনে করিয়া অমরনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

উমা বলিল "তুমি একবার গিয়ে দেখে এস না বাবা। মৃন্ময়ও এক দিন এসেছিল, বেশ কথাবার্ত্তা বলেছে। তোমায় একবার দেখবার জন্যে ঊষার যে কান্না—"

অমরনাথ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "সুখে থাক সে, আশীর্ব্বাদ করছি। তাকে গিয়ে দেখে আসতে বলছ মা, আমি মেয়েকে দেখতে যেতে পারব না।"

উমা বলিল "আমি যদি কোথাও থাকতুম বাবা, তা হলে আমায় দেখতেও তো তুমি যেতে না।"

স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া অমরনাথ বলিলেন "তুই যে আমার মা উমা,—মাকে ছেড়ে ছেলে কোথায়ও থাকতে পারে স্থির হয়ে? তোকে আমি কোথাও যেতেই দেব না। আর দুদিন যদি কলকাতায় থাক্‌তিস্, আমাকে বাধ্য হয়ে যেতেই হ'ত।"

উমা একটু হাসিল মাত্র।

সে মাত্র আট নয় দিন বাড়ী ছিল না, ইহারই মধ্যে সংসারটা অগোছালো হইয়া গিয়াছে। দাসী চাকরগুলি যতদূর ফাঁকি দিবার তা দিতেছিল। উমার চোখের সামনে সকলেই সংযত থাকিত, উমাকে সকলেই ভয়মিশ্রিত ভালবাসিত।

এখানে আসিবার দুই চারি দিন পরে উমা ঊষার একখানা ও মৃন্ময়ের একখানা পত্র পাইল। ঊষা অনেক কথায় পত্রখানা ভরাইয়া ফেলিয়াছে। পিতাকে যে সে দেখিতে পাইল না, সেই কথা যেখানে লিখিয়াছে, সেখানটা চোখের জলের চিহ্নে পূর্ণ। সে লিখিয়াছে—জোর করিয়া সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। বাস্তবিক, আর লেখাপড়ার তাহার কিই বা দরকার।

মৃন্ময় যে পত্রখানা লিখিয়াছে সেখানা বেশ উঁচু ধরণের। সে সতীর মুখে শুনিয়াছিল এবং মনীশের বাসায় যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বড় দুর্ভাগ্য যে সহরের বাহির হইতে ডাক আসায় সে আসিতে পারে নাই, দেখাও করিতে পারে নাই। সে পূজার সময় নিশ্চয়ই আসিবে এবং অমরনাথের সহিত দেখা করিয়া যাইবে।

পত্র দুখানা সে অমরনাথকে দিল।

ঊষার পত্র পড়িয়া অমরনাথ হাসিলেন, মৃন্ময়ের পত্র পড়িয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। পত্রখানা উমার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দয়া করে সে যে আসবে বলেছে, এই যথেষ্ট। তার আসা আমাদের কাছে দুরাশা মাত্র। বেশী লেখাপড়া শিখলে আমাদের দেশের ছেলেরা যথার্থ মানুষ হতে পারে না,—আমি বলি, তারা একেবারে বয়েই যায়।"

উমা বলিল "কেন বাবা—মনীশদা তো বয়ে যায় নি?"

অমরনাথ বলিলেন "ওই রকম কদাচিৎ এক আধটী দেখা যায়, এদের কথা ধরা যায় না। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক বলে কলকাতার লোকেরা আমাদের চাষা বলে ভাবে—তা দেখছ উমা?"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "ভাবনাটা করাই অন্যায় বাবা। দেড়শো বছর আগে কলকাতা একটা পাড়াগাঁ ছিল শুনেছি, তখন এই সব দেশগুলোই সভ্য উন্নত ছিল। তুমিই তো সেদিন বলছিলে বাবা, কলকাতায় কিছুই ছিল না, ক্রমে ক্রমে উন্নত হতে হতে আজ কলকাতার নাম সব দেশেই জানতে পেরেছে। তা বলে—কলকাতার লোকদের পাড়াগাঁকে এতটা নীচু বলে ভাবা উচিত নয়। এখনও পাড়াগাঁ হতে অনেক জিনিস যায়, তবে তারা খেতে পায়।"

বগলাদেবী অমরনাথের কথার সাড়া পাইয়া আসিয়া পড়িলেন। এখানে আসিয়া তিনি এক দিন কয়েক মিনিটের জন্য মাত্র অমরনাথের দেখা পাইয়াছিলেন। উষার মুখে তাহার প্রতি বগলাদেবীর তর্জ্জনগর্জ্জন শুনিয়া অমরনাথ

প্রমাদ গণিয়াছিলেন,—স্বেচ্ছায় তাঁহার সম্মুখে তিনি আসিতে চান নাই।

বগলাদেবীকে দেখিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিতেছিলেন। ইঁহার মুখের কথার সম্মুখে তিনি যে কোনও রকমে দাঁড়াইতে পারিবেন না তাহা বেশ জানিতেন। বিপদটাও অবশ্যম্ভাবী, তাই তিনি সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

বগলাদেবী একেবারে সামনে আসিয়া বসিয়া আগেই কান্না আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অমরনাথ খানিক নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "শুধু শুধু কাঁদছ কেন পিসিমা?"

চোখ মুছিতে মুছিতে বগলাদেবী বলিলেন "শুধু শুধু মেয়েটার এমনি করে সর্ব্বনাশ করলি,—বাপ হয়ে তাকে সত্যিই তুই ভাসিয়ে দিলি,—আবার বলছিস্ শুধু শুধু কাঁদছ কেন? আমি যে তার কথা ভেবেই কাঁদছি। তার মা নেই বলে কি এমনি করে তাকে ভাসিয়ে দিলি রে? এই তো উমা দেখে এসেছে, জিজ্ঞাসা করে দেখ না—সেই ঊষা—সে আজ কি হয়েছে? আনবার কথা বললুম, তার ননদ বললে এখন আসবে না। কোথায় রেখে না কি লেখাপড়া শেখাচ্ছে।"

অমরনাথ বলিলেন "লেখাপড়া শেখাচ্ছে সে তো ভাল কথাই।"

বগলাদেবী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন "ভাল কথাই বই কি? কি করে ভাল কথা হল, বল দেখি? তোর ঊষা যে একেবারে খিষ্টেন হয়ে গেল, তাকে বাড়ীতে আনলে এর পর যে তোর জাত যাবে!"

শান্তকণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন "বাড়ীতে এনেই বা কি লাভ আর? সে থাকবে সেখানে, এখানকার সঙ্গে আর তার কি সম্পর্ক আছে? যে দিন তাকে দান করেছি, সেই দিনই তো সে পরের হয়ে গ্যাছে,—এখানকার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক সেই দিনই তো ফুরিয়েছে। মেয়ে জন্মায় পরের জন্য, সে আপনাদের জন্যে তো নয় পিসিমা। উমাকে কাছে পেয়েছ, তাকে কাছে পাবার প্রার্থনা কর না,—আশীর্ব্বাদ কর, সে চিরজন্মটা সেখানেই থাক, তাকে যেন এখানে না আসতে হয়।"

এই কথাটার পর আর কথা বলিতে বগলাদেবীর সাহস হইল না। অমরনাথ সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিলেন, "এবার পুজোর আগে কাশী যাব,—যাবে পিসিমা? আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না, দিন কতক সব দেশগুলো বেড়িয়ে আসা যাক্, কি বল?"

পিসিমা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন "আমি তো কতবারই গেলুম,—যেতে বাকি আছে এইবার।"

হাসি চাপিয়া অমরনাথ বলিলেন "না, এবার সত্যিই যাব। এত দিন তোমার মনেই বৈরাগ্যটা ছিল, আমার মনে তো হয়নি। এদিককার ব্যবস্থাগুলো করে ফেলে মাস ছয় সাতের জন্যে বেরুব। আমিও যে কিসের জন্যে সংসারে এমন করে জড়িয়ে বসে আছি তা জানিনে,—আমার তো কিছুই নেই। একটা মাত্র মেয়ে—সেও ব্রহ্মচারিণী। ঊষার দায়ে তো নিশ্চিন্তই হয়েছি—সে ভাবনা আর ভাবতে হবেও না। মনীশের মাকে একখানা পত্র লিখে তাঁদের বিষয়গুলো বুঝে নিয়ে যেতে বলি। আমার ঘাড়ে কেন আর এ জোয়াল রাখা। আমার বইবার ক্ষমতা আর নেই, দিন দিন বয়েস হচ্ছে তো!"

পিতার এমনিধারা কথার আভাস কিছুদিন হইতেই উমা পাইতেছিল। অমরনাথের স্বাস্থ্যও দিন দিন খারাপ হইতেছিল। পূর্ব্বের মতই সব কাজ তিনি জোর করিয়া করিতে যাইতেন, কিন্তু পারিয়া উঠিতেন না।

দেওয়ান এক দিন আসিয়া চুপি চুপি উমাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু যে উইল করছেন, তা জানো মা?"

উমা বিস্ময়ে বলিল "কই না, বাবা তো কিছু বলেন নি!"

দেওয়ান বলিলেন, "তা হ'লে সে কথা তিনি তোমায় জানান নি। তিনি কাল সহরে গেছলেন, উইল করে এনেছেন।"

উমা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল "কি উইল করেছেন—জানেন কাকা?"

দেওয়ান বলিলেন "জানি বই কি মা! এই সব বিষয় সম্পত্তি, সমস্তই তিনি তোমায় দিয়ে যাচ্ছেন।"

উমা বলিল "ঊষা!"

দেওয়ান মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাকে কিছু দেবেন না। আমি বলেছিলুম; তাতে তিনি বললেন, ঊষাকে দিয়ে আমার কোনও লাভ হবে না। তিনি আরও বললেন,

যদি উইল না করে রেখে যান, মৃন্ময় এসে গোল বাধাতে পারে। তোমায় সামান্য একটা দাসীর মত একপাশে ফেলে রেখে সে নিজে সব নিয়ে নেবে। এতে কোনও উপকার হবে না। কারণ সে হিন্দু হলেও হিন্দুর কোনও প্রথা, কোন কাজ করতে চায় না।"

উমা স্থিরভাবে বলিল "এ কিন্তু কিছুতেই উচিত নয় কাকা। আচ্ছা, আমি বাবাকে বলব'খন,—দেখি, কি বলেন তিনি।"

প্রথম আষাঢ়ের বৈকাল—আকাশ মেঘে ভরিয়া গিয়াছিল, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল, চোখ ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। অমরনাথ খোলা জানালার পাশে বসিয়া নূতন মেঘের খেলা দেখিতেছিলেন। শরীরটা খারাপ বোধ হইতেছিল,—শীত শীত লাগিতেছিল বলিয়া গায়ে একখানা মোটা লুই জড়াইয়াছিলেন।

উমা গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিল "এই গরমে গায়ে মোটা লুইখানা জড়িয়ে বসে আছ যে বাবা? শরীর খারাপ করেছে বোধ হয়। আর ওই জানালাটা খুলে রেখেছ, ঠাণ্ডা বাতাসটা এসে সমানে গায়ে লাগছে।"

অমরনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন "বাতাস লাগতে পারবে না বলেই তো লুইখানা গায়ে দিয়েছি উমা।"

উমা জিজ্ঞাসা করিল "অসুখ করেছে?"

অমরনাথ বলিল "কি জানি, বুঝতে পারছিনে।"

উমা পিতার ললাটে হাত রাখিয়া দেখিল ললাট গরম। বলিল "এই তো, বেশ জ্বর হয়েছে তোমার। ওঠো বাবা, বিছানায় শুয়ে পড়বে চল, আমি জানলাটা বন্ধ করে দেই। কাল মাথা ধরেছিল,—আজ যদি স্নানটা না করতে, জ্বরটা হত না। তুমি কথা শুনবে না, আর রোজ এমনি করে অসুখ করবে। এর পরে যদি তোমার কিছু হয় বাবা—আমি কি করব বল তো?"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। কন্যার এই স্নেহের শাসনের কাছে পিতা আপনাকে ধরা দিলেন,—দ্বিরুক্তি না করিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। উমা লুইখানা দিয়া বেশ করিয়া তাঁহার সমস্ত দেহটা ঢাকিয়া দিয়া মাথার কাছে বসিল, বলিল "মাথা টিপে দেব বাবা, মাথা ব্যথা করছে?"

পিতা চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন, বলিলেন "না মা।"

"না, তোমার মাথা ব্যথা করছে।" উমা মাথা টিপিতে লাগিল। অমরনাথের মুদিত নেত্র কোণ বাহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল, উমা তাহা মুছাইয়া দিল।

"আচ্ছা বাবা, তুমি যত বুড়ো হচ্ছো, তোমার তত দুরন্তপনা বাড়ছে কেন বল তো? যা বলি তা কিছুতেই শোন না। এমনি করলে তুমি কয়দিন বাঁচবে বল তো? আগে তোমার কেমন চেহারা ছিল, এখন এত বুড়ো হয়ে পড়েছ যে, কেউ তোমায় দেখলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না—তোমার যথার্থ বয়স হয়েছে পঞ্চাশ বছর মাত্র।"

মাত্র পঞ্চাশ বছর—পিতা হাসিলেন "বড় কম বয়েস দেখছিস উমা? পঞ্চাশ বছরের ঝড় বৃষ্টি রোদ যার মাথার উপর দিয়ে চলে গ্যাছে, সে বুড়ো হবে না? আর আমার কর্ত্তব্য যা ছিল সব শেষ হয়ে এসেছে। এতদিন উৎসাহ ছিল, কাজেই আমায় শক্ত দেখেছিলি! ঊষার বিয়ে একটা লক্ষ্য ছিল, তা হয়ে গেল। তোর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা দরকার ছিল, কাল তাও করে এসেছি। এখন বাকি আছে মনীশেরটা। তাকে আসতে বলেছি। সে কিম্বা তার মা এলে, সবগুলো বুঝিয়ে দিলেই, আমার একেবারে ছুটি।"

উমা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল "আমার সম্বন্ধে কি করেছ বাবা? কাকা বলছিলেন—কি উইল করে এনেছ, কিসের উইল বাবা?"

পিতা বলিলেন "এই জমিদারীর।"

উমা বলিল "জমিদারীর কি উইল বাবা? শুনলুম আমাকেই সব দিচ্ছো, ঊষাকে কিছু দেবে না, সে কি রকম বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন "এ ভালই করেছি মা। দেখ, মানুষের দেহের কথা কেউ বলতে পারে না। আমি আজ আছি কাল থাকব না। তুমি বালিকা, বিধবা, তোমায় ঠকিয়ে নিতে কারও দেরী হবে না। বিশেষ তুমি সংসার সম্বন্ধে কিছুই জান না। আমার যা, তা তুমি ঊষা, দুজনে পাবার অধিকারিণী বলছ—ঊষাকে আমি কিছুই দিলাম না, কেন? ঊষাকে যে ঘরে দিয়েছি, তাতে তার কখনই অভাব হ'তে পারবে না। তা হ'লেও অর্দ্ধেক সে পেতে পারে—কিন্তু তাতে আমার সার্থকতা কি? মৃন্ময় থাকবে কলকাতায়, এখানে সে আসবে

না, আমার প্রজাদের দেখবে না, তাদের অভাব অভিযোগ কিছুই শুনবে না। নিজের যখন দরকার পড়বে, তখন সে এদের বুক বাঁশ দিয়ে ডলে যাবে। আমার এই দেশ তার মত শিক্ষিতের কাছে ভাল কিছুরই প্রত্যাশা করতে পারে না,—আবেদন জানিয়ে লাভ করবে অপমান। মা আমার, আমি এই সব ভেবেই আমার দেশকে, আমার আত্মীয়ের মত প্রজাদের মৃন্ময়ের হাতে তুলে দিলুম না, এদের তোমারই করে দিলুম। আমি যত দিন বেঁচে থাকব তত দিন আমার কাজ আমিই করব। তার পরে এ সব তোমারই কাজ, তুমিই করবে। আমি ভাল থাকতেই উইল করে রাখলুম—ভবিষ্যতে এ নিয়ে আর কোনও গোল হবে না। মৃন্ময় আশ্বিন মাসে আসবে বলেছে—কেন আসবে তা জানো? সে আসবে দেখতে, তার স্ত্রী কি পেতে পারবে। আজকাল সংসার ভারি কুটিল হয়ে পড়েছে মা,—অর্থের দিকে সবারই দৃষ্টি। কে বলবে যে ঊষাই তোমাকে শত্রুর চোখে দেখবে না?"

কথাটা তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতই উমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল,—আর্ত্তকণ্ঠে সে বলিল "না বাবা, তা হ'তে পারে না।"

পিতা হাসিলেন, "মা, তোমার চেয়ে আমি ঢের বুঝি,—সংসারকে আমি বেশ চিনি। আমি একমাত্র এই জ্ঞানলাভ করেছি—সংসারে অর্থই মূল। এই অর্থের জন্যে ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসায়, বাপ ছেলেতে পৃথক হয়। মা আমার, তোমার জগতে আর কেউ নেই। নিজের বলে জানছ তুমি তোমার বাপ, ঠাকুরমা, আর বোনটীকে; কিন্তু তার যে আলাদা একটা সংসার আছে, দুদিন বাদে সে সন্তানের মা হবে। তোমাদের উপরে মায়া তার এখনও যা আছে, এর পরে তাও থাকবে না। আমি তোমায় তাদের দয়ার দানের উপরে ফেলে রেখে যাব না। তারা তোমার সঙ্গে যা ব্যবহার করবে, তা আমি বেশ জেনেছি। আমার প্রাণের ঠাকুর গোবিন্দজী পূজা পাবেন না। আমার দেশ হাহাকারে ভরে উঠবে। তাদের সেই হাহাকার, তোমার দুঃখ, আমার গোবিন্দজীর পূজার বাধা—এ আমার মরণের পরেও আমায় আকর্ষণ করবে। না মা, আমি যা করেছি, তা আর বদলাবার চেষ্টা কর না। মৃন্ময়কে কিছু জানিয়ো না, ঊষাকে কিছু জানিয়ো না। তারা যেমন আছে তেমনি থাক, জানব শুধু আমরা—আর কেউ নয়।"

উমা নীরবে পিতার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। পিতার কথা শুনিয়া সে একটুও খুসী হইতে পারে নাই। ঊষাকে যে কিছুই দেওয়া হইবে না—ইহাতেই সে যেন দেখিতে পাইল, ঊষা যথার্থই তাহাদের কাছ হইতে অনেক দূরে সরিয়া গেল। এই ব্যবস্থায় ঊষার শ্বশুর বাড়ীর সকলে যে কিরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিবেন, তাহা ত জানা কথা।

উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। (ক্রমশঃ)

ভারতীয় সংবাদ-পত্র

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

১

১৯২২ সালের ভিতর ভারতীয় সংবাদ-পত্র এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক সাহিত্য নানা দিকে উন্নতি লাভ করিয়াছে। শাসন-সংস্কার সমালোচনায় লেখক ও সম্পাদকগণ প্রচুর স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। আলোচনার প্রণালীতে অনেকটা নির্ভীকতা এবং স্পষ্টবাদিতা দেখা গিয়াছে। স্বরাজের আবহাওয়ায় এইরূপ সুরই স্বাভাবিক। ভারত-বাসী অনেক উঁচুতে উঠিয়াছে,—এ কথা ঠিক। কিন্তু বিশ্ববাসীর তুলনায় ভারত-সন্তান এখনো অনেক নীচেই রহিয়াছে। আমাদের উন্নতির পথ সহজ করিয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বদা সজাগ ভাবে কার্য্য করা আবশ্যক।

বোম্বাইয়ের "ক্রনিকল্", করাচির "নিউ টাইম্‌স্" কলম্বোর "সিলোন ডেলিনিউজ" মান্দ্রাজের "হিন্দু", কোচিনের "মালাবার হেরাল্ড", বাঁকিপুরের "সার্চ্চলাইট্", কলিকাতার "অমৃত বাজার পত্রিকা",—ইত্যাদি কাগজগুলা ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত। কিন্তু এইগুলা সবই ভারতীয় অর্থে এবং ভারতীয় নায়কগণের কর্ত্তৃত্বে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কাজেই এই সব দৈনিক পত্রকে "মারাঠা", "গুজরাতী", "আন্ধ্র পত্রিকা", "আজ", "হিন্দুস্থান" ইত্যাদি ভারতীয় ভাষায় সংগঠিত কাগজের সহোদর বিবেচনা করাই যুক্তি-সঙ্গত। রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলির কথা আলাদা।

কিন্তু কি ইংরেজি কাগজ, কি হিন্দুস্থানী কাগজ, সকল ভারতীয় কাগজেরই একটা প্রধান দুর্ব্বলতা বহুকাল হইতেই দুনিয়ার লোকের নজরে পড়িয়া আসিতেছে। সেই দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিবার জন্য ভারত-সন্তান যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই, বলা যাইতে পারে।

২

ভারতবাসীর দুর্ব্বলতা দেখা যায় কোথায়? ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায়। দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ভারত-সন্তান নেহাৎ অজ্ঞ। জগৎ কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ মুল্লুকে কোন্ ঘটনার ফলে সমাজে কিরূপ নয়া শক্তি দেখা দিতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য এবং বুঝাইবার জন্য ভারতবর্ষে কোনো ব্যবস্থা নাই। আমরা আনাড়ির মতন, অন্ধের মতন জীবন যাপন করিয়া আসিতেছি।

ভারত-সন্তান স্বরাজ চাহিতেছেন। ভারত-সন্তান জগতের সকল স্বাধীন জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজনের দাবী করিতেছেন। ভারত-সন্তান দুনিয়ার বাজারে অন্যান্য দেশীয় নর-নারীর সঙ্গে টক্কর দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

কিন্তু একটা সামান্য দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। জার্ম্মাণরা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা ও অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে যত কথা জানে, ভারতবাসী জার্ম্মাণি সম্বন্ধে তাহার শতাংশও জানে না। ফরাসীরা ভারতীয় জীবনের খুঁটি-নাটী বেশ ভাল রকমই জানে। ভারত-সন্তান ফ্রান্স সম্বন্ধে কতটুকু খবর রাখেন? মার্কিণ জাত, রুশ জাত, ইতালীয়ান জাত, এমন কি জাপানীরাও ভারতের কথা কম বিস্তর অনেক জানে। কিন্তু ভারতের উচ্চতম শিক্ষিত গ্রাজুয়েট অধ্যাপক, সম্পাদক, লেখক, সংবাদদাতা ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরাও যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, ইতালী বা জাপানের কোনো ঘটনা বিশদরূপে বুঝিতে অথবা স্বদেশবাসীকে বুঝাইতে পারেন কি?

এই দৃষ্টান্তেই বুঝা যায় যে, বাস্তবিক পক্ষে দুনিয়ার লোকের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করিতে হইলে দুনিয়া সম্বন্ধে ভারতবাসীর জ্ঞান অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। এই দিকে প্রত্যেক ভারতীয় স্বরাজ-পন্থীর কর্ত্তব্য আছে, প্রত্যেক জননায়কের কর্ত্তব্য আছে, প্রত্যেক সংবাদপত্রেরও কর্ত্তব্য আছে।

৩

জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, আমেরিকা, রুশিয়া, ইতালী ও জাপান—এই সকল দেশের লোকেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে কি উপায়ে? ভারতের নগরে নগরে এই সকল দেশের এজেন্সি, কন্‌সালেট, দৌত্য-বিভাগ, গুপ্ত-চরের আফিস ইত্যাদি ধরণের সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাদের নিজ নিজ গবর্মেণ্ট প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতে তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিয়া থাকে।

সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া অনেক লোক জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়-সঙ্ঘ এবং শিল্পসভার প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতে ব্যাপারী ভাবে বসবাস করেন। অনেক ব্যাপারী বৎসরে কয়েক মাস ভারতের নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা বুঝিবার জন্য আসিয়া থাকেন।

অধিকন্তু সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার পূজারীরা প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে দলে দলে ভারতে পর্য্যটন ও গবেষণা উপলক্ষে উপস্থিত হন। ইহারা নিজ নিজ জ্ঞানমণ্ডলে স্বদেশে ভারত বিষয়ক জ্ঞান বাড়াইবার জন্য মোতায়েন থাকেন। স্বদেশী গবর্মেণ্টের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা বিদ্বৎপরিষদের টাকায় ইঁহাদের "রাহা-খরচ" চলিয়া থাকে। তাহা ছাড়া নিজ পয়সায় ভারত দেখিতে আসিবার জন্যই বহু মার্কিণ, ফরাসী, জাপানী ইত্যাদি বিদেশী লোকের ভারতে সমাগম হয়। পর্য্যটনের মতলবে টাকা খরচ করাকে তাঁহারা অপব্যয় বিবেচনা করেন না।

ভারতবর্ষকে বুঝিবার জন্য বিদেশে এতগুলি সুযোগ আছে। কিন্তু বিদেশকে বুঝিবার জন্য ভারতবাসীর বিশেষ কোনো সুযোগ আছে কি? ভারতীয় গবর্মেণ্ট, বণিক-সঙ্ঘ, ব্যাঙ্ক, সৌথকারবার, পণ্ডিত-পরিষৎ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলা ভারত সন্তানকে অর্থ সাহায্য করিয়া বিদেশে মোতায়েন রাখিতে সচেষ্ট আছেন কি?

৪

এইখানেই শেষ নয়। জার্ম্মাণ, ফরাসী, জাপানী ইত্যাদি দেশের দৈনিক সংবাদপত্রের আফিস হইতে বিশেষ লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। এই সকল লোক নানা শ্রেণীর অন্তর্গত। কেহ ধন-সম্পত্তি, কারখানা, চাষ-আবাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কেহ থিয়েটার, নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি বিষয়ক অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কেহ আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনগুলা লক্ষ্য করিবার জন্য নিযুক্ত। কেহ বা বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে "রিপোর্টার" বা সংবাদ-দাতা।

ভারতবর্ষের কোনো দৈনিক বা মাসিক কাগজ ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, আমেরিকায় বা জাপানে এই ধরণের বিশেষজ্ঞ বা ওস্তাদকে রিপোর্টার স্বরূপ বাহাল করিয়াছেন কি? অন্ততঃ পক্ষে, জার্ম্মাণ, ফরাসী, মার্কিণ, জাপানী, ইত্যাদি দেশীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় পত্রিকায় ছাপাইবার ব্যবস্থা আছে কি?

একদম নাই, এ কথা বলিলে অবিচার করা হইবে। কিন্তু কতটুকু আছে, তাহা আমাদের হিন্দুস্থানী এবং ইংরেজি দৈনিকগুলা দেখিলেই বুঝা যায়। "সরস্বতী" "মর্য্যাদা", "মাসিক মনোরঞ্জন", "মডার্ণ রিভিউ", "ইণ্ডিয়ান রিভিউ", "ভারতবর্ষ" ইত্যাদি পত্রে দুনিয়ার আবহাওয়া যতটুকু পাওয়া যায়, তাহার জোরে ভারত-সন্তান বিশ্বের বাজারে জগদ্বাসীর সঙ্গে টক্কর দিতে অসমর্থ।

৫

ভারতীয় সম্পাদক ও লেখকেরা প্রধানতঃ রয়টারের দেওয়া সংবাদের গোলাম। কোনো ভারতীয় দৈনিকে অথবা মাসিকে ইয়োরোপ, আমেরিকা, বা জাপান সম্বন্ধে কোনো স্বচিন্তিত প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই বলা যাইতে পারে। কিছু অত্যুক্তি করা হইল বোধ হয়।

মাঝে মাঝে বিদেশ সম্বন্ধে দু' একটা সম্পাদকীয় মন্তব্য কোনো কোনো কাগজে দেখা যায়। কিন্তু সেগুলা বোধ হয় বিলাতের দৈনিক অথবা মাসিক কাগজের প্রবন্ধের অনুবাদ। আজকাল কখনো কখনো মার্কিণ কাগজের তর্জ্জমাও দেখিতে পাই।

কিন্তু বিদেশী ঘটনাগুলাকে ভারতীয় চোখে দেখিয়া ভারতবাসীর স্বার্থের দিক ব্যাখ্যা করিবার জন্য যুবক ভারতের সময় আসে নাই কি? চিন্তারাজ্যে স্বরাজ কায়েম করিবার জন্য ভারতের জননায়কগণ সচেষ্ট হউন। একমাত্র বিলাতী এবং ভারত-শত্রু সংবাদদাতার উপর নির্ভর করা অথবা ইংরেজি এবং আমেরিকান লেখকগণের মতগুলা হিন্দিতে, মারাঠিতে, উর্দ্দুতে অথবা বাংলায় প্রচার করা ভারত-সন্তানের পক্ষে লজ্জার কথা। এই অবস্থায় জগতের লোক যুবক ভারতের স্বরাজ প্রচেষ্টার সম্মান করিতে পারে কি?

৬

ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণের সম্মুখে অনেক কর্ত্তব্য রহিয়াছে। একটা দায়িত্বের কথা এই উপলক্ষে উল্লেখ করা আবশ্যক। জার্ম্মাণ এবং ফরাসী ভাষায় ওস্তাদ বহুসংখ্যক ভারত-সন্তানকে অতি শীঘ্রই ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে হাজির করা চাই। এই দুই ভাষা না জানার ফলে ভারতবাসীর চিন্তা ইংরেজ মার্কিণ চিন্তার গোলামী হইতে মুক্তি পাইতেছে না।

জার্ম্মাণ এবং ফরাসী ভাষায় দখলওয়ালা অন্ততঃ দুইজন করিয়া লেখক ভারতবর্ষের প্রত্যেক দৈনিক সাপ্তাহিক এবং মাসিক কাগজের আফিসে নিযুক্ত থাকা চাই। ইঁহারা প্রত্যেক দিন কেহ বা ফরাসী কাগজ-পত্রে, কেহ বা জার্ম্মাণ কাগজ-পত্রে ডুবিয়া থাকিবেন। কোনো একজন সবজান্তা সম্পাদকের দায়িত্বে যুবক ভারতের কোনো কাগজ সুচারুরূপে চলিতে পারে না।

জার্ম্মাণ এবং ফরাসী ভাষা শিখিবার জন্য প্রত্যেক ভারত-সন্তানকে জার্ম্মাণিতে অথবা ফ্রান্সে আসিতেই

হইবে, এমন কোন কথা নাই। ভারতের প্রত্যেক বড় শহরেই এই দুই ভাষা শিখাইবার আয়োজন হইতে পারে। প্রত্যেক বড় শহরেই কম সে কম পঁচিশ জন ছাত্র প্রতি বৎসরই ফরাসী ও জার্ম্মাণ শিখিবার জন্য সচেষ্ট হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

বিগত দুই তিন বৎসরের ভিতর অনেক ভারত-সন্তান ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশ বেড়াইয়া ভারতে ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে দর্শন-বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, প্রায় কেহই ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভাষার পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিবার অবসর পান নাই। বিদেশী ভাষা দখল করা সহজ নয়। বিশেষতঃ জার্ম্মাণ যারপর নাই কঠিন ভাষা। দু' এক বৎসর ফ্রান্সে বা জার্ম্মাণীতে কাটাইয়া গেলেই এই দুই দেশের ভাষায় অধিকার লাভ হইবে, এইরূপ ভাবিলেই বেকুবী করা হইবে। এজন্য বিশেষ সাধনা আবশ্যক।

রাজগী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(৫)

পরের দিন সকালে প্রায় বেলা দশটার সময় আমি আমার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। মাষ্টার মহাশয় প্রায় এক ঘণ্টা হইল সন্ত্রস্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন। বইটই সব তিনিই ঠিক ঠাক করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আমি গিয়া টেবিলে বসিয়া তাঁর নির্দ্দিষ্ট পাঠ পড়িবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। এমন সময় অছিমদ্দি সরদার কম্পিত কলেবরে দশটা টাকা হাতে করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইল। আমার পায়ের কাছে টাকা দশটা রাখিয়া সে সেলাম করিল। আমি নজর পাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলাম। টাকা দশটা নির্ব্বিবাদে তুলিয়া লইলাম, কিন্তু বুঝিলাম না যে, কি বাবদে অছিমদ্দি আমাকে নজর দিল।

অছিমদ্দি নিজেই বুঝাইয়া বলিল, "মহারাজ কাল রাতের বেলায় আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন, তখন মহারাজের মর্য্যাদা ক'রতে পারি নি, তাই এই নজর দিতে এসেছি।"

আমার এতক্ষণে স্মরণ হইল যে, প্রজার বাড়ী পদার্পণ করিলেই আমি নজর পাইয়া থাকি। আমি আর কিছু বলিলাম না।

অছিমদ্দি আবার বলিয়া গেল, "হুজুরের কাছে একটা নালিশ।"

আমি বলিলাম, "কি ?"

"হুজুর কাল রাতের বেলায় গেলেন, আমাকে সঙ্গে আসতে বললেন। তাড়াতাড়ি হুকুম তামিল ক'রতে তখন নজর দিতে পারি নি। তাই নায়েব মশায় আমাকে তলব দিয়াছেন। হুজুরে নজর দাখিল করে ৫০৲ টাকা জরিমানার হুকুম করেছেন। আমি মহারাজ গরীব। দয়া করে' কসুর মাপ করে' জরিমানাটা মাপ দিতে হুকুম হয়।"

মাষ্টার বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আঃ, ও সব কথা মহারাজের কাছে কেন ব'লছো। কিছু বলবার থাকে তো দেওয়ানজীকে বল গে, না হয় রাণীমার কাছে বল গে। এখানে কাজের সময় গোলমাল করো না।"

ইহাই ঠিক দস্তুর মত কথা। কিন্তু এ কথায় আজ আমার হঠাৎ একটু অস্বস্তি বোধ হইল। কাল সন্ধ্যা বেলা হইতে আমার মনের একটা নূতন দুয়ার খুলিয়া গিয়াছিল। এত দিন কেবল নিজের দিকই দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এখন হঠাৎ মনের দৃষ্টি এমন ভাবে ফিরিয়া গেল যে, আমি পরের দিকটা চট করিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমার মনে হইল যে, আমাদের রাজবাড়ীর কায়দা ও দস্তুর অনুসারে অছিমদ্দির অপরাধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অছিমদ্দির দিক হইতে অপরাধটা এমন কি গুরুতর। সে বেচারা আমার হুকুম তামিল করিবার

তাড়াতাড়িতেই তো নজরটার কথা ভাবে নাই। অবশ্য তখনও আমার এ জ্ঞান হয় নাই যে, আইন অনুসারে এই নজর আদায় করিবার আমার এক ফোঁটাও অধিকার ছিল না। তবু আমার মনে হইল যে, ইহাকে জরিমানা করাটা অন্যায় হইয়াছে।

আমি মাষ্টার মহাশয়ের কথায় সায় না দিয়া অছিমদ্দিকে বিস্তারিত বিবরণ বলিতে বলিলাম। সে বলিল, নায়েব মহাশয় তাহাকে কাণে ধরিয়া নাকে খত দেওয়াইয়াছেন, এবং তার পর এই পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

আমার ভারি রাগ হইল। আমি নায়েব গোবিন্দের বরাবর একখানা কাগজ লিখিয়া দিলাম যে, অছিমদ্দির জরিমানাটা যেন মাপ করা হয়।

পড়া শুনার পর উপরে আসিয়া দেখিলাম, রাণী-মায়ের কাছে গোবিন্দ দাঁড়াইয়া,—তার হাতে আমার লেখা সেই চিরকুট। রাণীমা তাহার সামনেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে খোকা, তুই অছিমদ্দির জরিমানা মাপ ক'রতে বলেছিস কেন ?"

রাণীমার কাছে গোবিন্দকে দেখিলেই আমার রক্ত টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিত। আর সে যে আমার নামে আসিয়া রাণীমার কাছে নালিশ করিতে সাহস করিয়াছে, তাহাতে আমার অসহ্য ক্রোধ হইল।

আমি বলিলাম, "বেশ ক'রেছি বলেছি, তাতে ও ছুঁচোটা নালিশ ক'রতে আসে কোন সাহসে ?"

এতবড় স্পর্দ্ধার কথা মায়ের মুখের উপর কোনও দিন বলি নাই। মার যা মেজাজ, তাহাতে তিনিও বোধ হয় এত বড় স্পর্দ্ধার কথা কোনও দিন কারও কাছে শুনিয়া তার মুণ্ডপাত না করিয়া ছাড়েন নাই। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল ; না জানি কি অনর্থ আজ ঘটিয়া বসিবে।

হঠাৎ আমার বিধুর কথা মনে পড়িল। সে তার মা ও ভাইয়ের চক্রান্তের কথা বলিয়া কাতর নয়নে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল, যেন আমি রাণীমার সঙ্গে ঝগড়া না করি। এই কথাটা বলিয়া মনে হইল যে, মাকে আমি যে মর্ম্মান্তিক অপমান গোবিন্দের সামনে করিলাম, না জানি কোন্ বজ্র আমার মাথার উপর এখন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। হায়, বিধুর কাতর অনুরোধ বৃথা গেল।

মার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। একবার এক ঝলক আগুন চোখের উপর খেলিয়া গেল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। গোবিন্দ একটু চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ রকম একটা গোলমালের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সে আমতা আমতা করিয়া বলিল, "এ পঞ্চাশটা টাকা তো বেশী কিছু নয়, কিন্তু এখানে যদি চট্ করে' এ টাকাটা মাপ করে' দেওয়া যায়, তবে প্রজাদের আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাবে, রাজবাড়ীর মর্য্যাদা রাখা কঠিন হ'বে। তা' ছাড়া, কথায় কথায় এরা এখন রাজা বাবুর কাছে নালিস করে বিরক্ত করে' তুলবে। বিবেচনা করুন—"

রাণীমা এক ধমকে বক্তৃতাটা থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "নেও, আর বকো না। যাও তুমি, জরিমানা মাপ হবে না।"

গোবিন্দ বিজয়-গর্ব্বে হাসিয়া চলিয়া গেল। আমার যেন মাথাটা কাটা গেল। আমি অপমানে মনে মনে জ্বলিতে লাগিলাম। কোনও কথা না বলিয়া, দম দম করিয়া পা ফেলিয়া, আমি আমার শুইবার ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরে তেলের বাটী হাতে করিয়া বিপিন আমাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল, আমি উঠিলাম না। সে দাইমাকে ডাকিয়া আনিল, আমি তাকে দুই ধমকে বিদায় করিয়া দিলাম। শেষে রাণীমা আসিলেন। দরজা দিয়া তাঁকে ঢুকিতে দেখিয়াই, আমি তড়াক করিয়া উঠিয়া বিপিনকে স্নানের ঘরে ঠেলিয়া দিলাম, এবং নিজে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলাম। বিপিন আমাকে তেল মাখাইতে লাগিল।

আমি মনে মনে একটা মতলব ঠিক করিলাম ; কিন্তু তার জন্য আমার কিছু টাকার দরকার। আমার বিলাস-বাহুল্য যতই থাকুক, টাকা পাওয়ার বিষয়ে আমার বড় অসুবিধা ছিল। কোনও টাকাই আমি বেগর হিসাবে পাইতাম না। বিধুকে ও বিপিনকে আমি যে মাঝে মাঝে কিছু দিতাম, সে এই হিসাবের ভিতর কারচুপি করিয়া। এখন কোনও বাবদে কোনও টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া আমি বিপিনের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। বিপিন নাপিতের ছেলে,

বুদ্ধি ভারি সাফ। তা' ছাড়া রাজবাড়ীর খানসামা মহলে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া তার নানা বিষয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুব বেশী জন্মিয়াছিল। সে বলিল, টাকার জন্য কোনও চিন্তা নাই,—আমি একখানা চিঠি দিলেই মনোহর সাহা গোপনে দুই চার হাজার টাকা জোগাইতে পারে।

আমি কম্পিত হস্তে মনোহর সা'র নামে একখানা চিঠি লিখিয়া, বিপিনের জিম্মা করিয়া দিয়া, খাইতে গেলাম। ঘণ্টা দুই পরে বিপিন আমাকে সত্য সত্যই এক শত টাকা আনিয়া দিল। আমি যেন বাঁচিলাম।

(৬)

সন্ধ্যার সময় আমি টাকা লইয়া অছিমদ্দির বাড়ী গেলাম। আজও অছিমদ্দি উঠানে বসিয়া ছিল। তার পাশে লালপেড়ে কালো শাড়ী পরিয়া সেই মেয়েটি বসিয়া কঙ্কিতে আগুন ধরাইতেছিল। অস্পষ্ট আলোয় বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু সুন্দরী আগুনে ফুঁ দিতে, তার আলোয় তার সমস্ত মুখটা লাল আলোয় রঙ্গিন হইয়া ভারী উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

আমার সাড়া পাইয়াই কিশোরী মাথায় কাপড় টানিয়া ছুটিয়া পলাইল। অছিমদ্দি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া সেলাম করিল, সেই জলচৌকীখানা আনিয়া কাপড়ের খুঁট দিয়া মুছিয়া আমাকে বসিতে দিল।

আমি বসিলাম। আমার অজ্ঞাতসারে আমি বারে বারে ফিরিয়া চাহিলাম সেই বেড়ার দিকে, যার আড়াল দিয়া সুন্দরী পলাইয়া গেল। আমার বেশ স্পষ্ট অনুভূতি হইল যে, সেই বেড়ার পাট খড়ি (পাঁকাটি) ফাঁক করিয়া এক জোড়া চঞ্চল চক্ষু আমাকে চাহিয়া দেখিতেছে।

কাজেই আমার কথাবার্ত্তাটা ভয়ানক অসংলগ্ন হইয়া গেল। অছিমদ্দি যাহা বলিল, তাহার আমি সামান্যই শুনিলাম। আর নিজে যাহা বলিলাম, তার বিশেষ কিছু মাথা-মুণ্ড ছিল না। যাহা হউক, আমি একবার নিজেকে নাড়া দিয়া তুলিয়া, অছিমদ্দিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার জরিমানা আদায় ক'রেছে?"

বিষণ্ণ ভাবে অছিমদ্দি জানাইল যে, জরিমানা আদায় হইয়াছে। টাকা সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হওয়ায় তাহাকে প্রায় ভরদিন আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সারাদিন অনাহারে থাকিয়া সে এইমাত্র আহার করিয়াছে। অপমানে দুঃখে অছিমদ্দি কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম, "কি ক'রবো ভাই, রাণীমার হুকুম! আমি কিছুই ক'রতে পারলাম না।"

অছিমদ্দি আবার বলিল, "আবার আজ হুজুর এয়েছেন, এখন মর্য্যাদা না ক'রলে যে কি সাজা হ'বে, কে জানে। কিন্তু মহারাজ, আমার বাড়ীতে আজ কাণা কড়িও নেই। জরিমানার টাকা আমি মনোহর সা'র কাছে কর্জ্জ করে' দিয়েছি।"

আমি বলিলাম, "আমার মর্য্যাদা তোমার ক'রতে হ'বে না। আর আজ যে আমি এসেছি, এ কথা কেউ যেন না জানে। আমার জন্য তোমার এই দুর্গতি হ'য়েছে, তাতে আমার ভারি দুঃখ হ'য়েছে। তা' কিছু মনে করো না ভাই।"

তার পর আমি যেন তেন প্রকারেণ তার হাতে একশ' টাকা গুঁজিয়া দিয়া উঠিলাম। সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল,—প্রথমে সে কিছু বুঝিতেই পারিল না। সে বলিল, "এ টাকা! এ দিয়ে কি হ'বে?"

আমি বলিলাম, "তোমার ষাট টাকা আজ লোকসান গেছে, তা ছাড়া ভরদিন কয়েদ ছিলে। সব মিলে একশো টাকা দিয়েছি বেশী কিছু দি নি।" বলিয়া আমি ছুটিয়া বাহির হইলাম।

পশ্চাতে শুনিতে পাইলাম, বামাকণ্ঠের বিস্ময়-ভরা কৃতজ্ঞতার ভাষা। আমি একেবারে চরিতার্থ হইয়া গেলাম। কার সে কণ্ঠ, তা আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে বলিতেছিল, "আহা, রাজাবাবু বেঁচে থাকুক, উনি বড় হ'লে রায়ত জনের দুঃখ থাকবে না।"

আনন্দে, গর্ব্বে, উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া, আমি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, বিপিনের বাড়ীর দিকে চলিলাম। আমার কাণের ভিতর কেবল বাজিতে লাগিল সেই সুমধুর কণ্ঠ, তার কল্পিত কৃতজ্ঞ দৃষ্টি, আর তার সেই সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানি।

বিপিনের বাড়ী ঢুকিতেই সামনে পড়িল বিধু। তাকে আজ অত্যন্ত সাদাসিধে লাগিল। বিধু গরীব, তার বিধবা,—সাদাসিধা সে বরাবরই। কিন্তু এত দিন তার

চেহারায় উপর একটা কিসের জৌলুষ ছিল, যা' আজ আমার মোটেই চোখে পড়িল না।

বিধুর মুখ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি কিন্তু সে হাসির জবাবে হাসিলাম না। আমি কেবল বলিলাম, "বিপিন কোথায় বিধু?"

স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, তার ভারি অভিমান হইল। সে প্রথমে কিছু বলিল না, তার পর ঘর দেখাইয়া দিয়া, মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

আমি বুঝিলাম, আমার অন্যায় হইয়াছে। ঠিক এ রকম সম্ভাষণে বিধু অভ্যস্ত নয়, তাহা আমার স্মরণ হইল। বিশেষতঃ আমি লক্ষ্য করিলাম যে, যদিও আমার চোখে বিধুর কোনও বিশেষত্ব আজ ধরা পড়ে নাই, তবু সে একটু যত্ন করিয়া সাজিয়াছে, আর চুলের খোঁপায় উপর একসার সন্ধ্যা মালতী ফুল পরিয়াছে।

আমি ডাকিলাম, "আরে যাস্ কোথায় বিধু? আমার কাছে আয় না।"

বিধু ছুটিয়া পলাইল। যখন সে এমনি করিয়া পলাইত, তখন তাকে ধরা একেবারে অসম্ভব। আমি আগে অনেকবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি। আজ চেষ্টা করিতে ইচ্ছা ছিল না, কেন না, বিপিনকে আমার বড় দরকার।

বিপিন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিতেই, আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, বিধুর আর সন্ধান করিলাম না।

বিপিনকে অছিমদ্দির বাড়ীর সুন্দরীর সন্ধান করিতে বলিলাম।

পরের দিন সন্ধ্যা বেলায় বিপিন খবর আনিল যে, সুন্দরী অছিমদ্দির নব-বিবাহিতা পত্নী। অছিমদ্দির বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ; কিন্তু এই নব-বিবাহিতা পত্নী সদ্য উদ্ভিন্ন-যৌবনা।

তার পর বিপিন একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "আমি তার সঙ্গে কথাও কয়ে এসেছি একটু।"

আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা হ'ল।"

"সে রাজা বাবুর ব্যাখ্যানায় একেবারে শতমুখ।"

আমি দমিয়া গেলাম। এ তো নিছক কৃতজ্ঞতা। কিন্তু বিপিন আমাকে ভরসা দিল। মনোহর সার নামে আর একখানা চিঠি গেল। সপ্তাহ মধ্যে আমার পাপ অভিলাষ পূর্ণ হইল।

এ কথা লইয়া বিধু এতটা গোলযোগ করিবে, তা' আমি ভাবি নাই। পরের দিন সে আমাকে এক রকম মাঠের মাঝখানে পাকড়াও করিয়া ভয়ানক শাসন করিতে লাগিল। সে বলিল, "হাঁ রাজা বাবু, এ তুমি কি আরম্ভ ক'রেছ? একেবারে জাহান্নমে যাবার পথে ব'সেছ! এখনো সতেরো বৎসর বয়স পেরুল না তোমার—এরই মধ্যে যে নাম ডোবাতে ব'সেছ। কি আক্কেল বল দেখি! আজ বাদে কাল বউ আসবে; সে এসে মনে ক'রবে কি, বল দেখি? তুমি রাজা, লেখাপড়া শিখবে, বড় মানুষ হ'বে, দেশ বিদেশে লোকে তোমার নাম করবে! তোমার এ সব কি?" ইত্যাদি নানা ছন্দে সে আমাকে গালি দিল, উপদেশ দিল, সৎপথে উৎসাহিত করিল, পাপে পরাঙ্মুখ হইতে শিক্ষা দিল। তখন তার মুখ দিয়া খই ফুটিতেছিল। আর তার চোখে ক্ষণে ক্রোধ, ক্ষণে অনুরাগ, ক্ষণে অনুনয় অঙ্কিত হইতেছিল। আর তার সমস্ত মুখময় একটা বেদনাময় গৌরবের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে যেন আমার মূর্ত্তিমতী বিবেক! আমাকে অসৎ পথে যাইতে দেখিয়া, সে বেদনায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

সে আমাকে বুঝাইল যে, এ পথ আমার সর্ব্বনাশের পথ। এমনি করিয়া কত বড়লোকের টাকা কড়ি, যশ মান যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে। আমার অভাব কি? রাজা আমি, কন্দর্পের মত চেহারা আমার,—আমার এমন বউ আসিবে যে, দুনিয়ায় তার চেয়ে কেউ সুন্দর নেই। আর আমি না কি একটা আঁস্তাকুড়ের ময়লা ঘাঁটিয়া সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছি।

যদিও আমার সম্বন্ধে বিধুর নিজের ব্যবহারের সঙ্গে তার উপদেশের এক ফোঁটাও সামঞ্জস্য ছিল না, তবু বিধুর কাছে এই উপলক্ষে আমি যে সদুপদেশ পাইলাম, জীবনে কোনও দিন আমি এত সদুপদেশ পাই নাই। এ উপদেশের মধ্যে জ্বালা ছিল না, গ্লানি ছিল না; স্বার্থের গন্ধ ছিল না, আধিপত্য বা গরিমার লেশমাত্র ছিল না। বিধুর বুদ্ধিসুদ্ধি বিশেষ নাই; তাকে বোকা বুঝান বড় সোজা। কিন্তু তার সরল অন্তর আমার প্রতি

ভালবাসার বোঝাই ছিল ; আজ আমার কিসে ভাল হয়, সে বিষয়ে তার দৃষ্টি অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল।

বিধুর এই তিরস্কারে আমার মনে সত্যই বড় গ্লানি বোধ হইল। আজ আমি হঠাৎ বিধুর চক্ষে আপনাকে দেখিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, আমার ভিতর সত্যই অশেষ সদ্‌গুণ আছে, এবং সেই সব সদ্‌গুণের চর্চ্চার দ্বারা আমি বাস্তবিকই সমস্ত জগতের সম্মানভাজন হইতে পারি। আমি সৎপথে আত্মনিয়োগ করিতে সত্য সত্যই উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। আমি বিধুর কাছে অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম, আর কুপথে যাইব না এখন হইতে ভাল হইব। বিপিনের পরামর্শ শুনিব না, পড়া শুনা করিব, ইত্যাদি।

বিধু বলিল, "আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।" আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। আনন্দে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ইহার পর কিছুদিন বিধু আমার রীতিমত শাসনের ভার লইল। তার শাসনে আমি সত্যসত্যই ভাল ছেলে হইয়া উঠিলাম—কেবল এক বিষয় বাদে। (ক্রমশঃ)

চণ্ডীদাসের নূতন গান

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

(১)

চণ্ডীদাসকে লইয়া তেমন আশানুরূপ আলোচনা আজিও হয় নাই, অথচ ইহার প্রয়োজন ছিল এবং আছে। কবির জীবন-কথা, কবির কবিতাবলী, বাসভূমি প্রভৃতি সম্বন্ধে কেহ কেহ কিছু কিছু বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই যৎসামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নব্য বঙ্গের পরলোকগত সাহিত্যিকবৃন্দের নামে অধুনা নিয়ম রক্ষা হিসাবে যে সব আচার অনুষ্ঠান সুরু হইয়াছে, কিছু না করা অপেক্ষা তাহা তবু মন্দের ভাল বলিয়াই মনে হয়। চণ্ডীদাস কিন্তু সে সম্মানেও বঞ্চিত হইতেছেন। আশার কথা,—কবির জন্মভূমি বীরভূমির নান্নূর গ্রামে সম্প্রতি চণ্ডীদাস-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে একটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় এবং একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের এই উন্নতির দিনে কবির অশরীরি আত্মাকে যদি এইরূপ তিল কাঞ্চনেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; তবে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে তাহা কি বিশেষ গৌরবের কথা হইবে? আমরা এদিকে বাঙ্গালার ধনকুবের এবং শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চণ্ডীদাসের রহস্যময় কবি-জীবন নানা প্রবাদ-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া সেই সমস্ত প্রবাদ-কাহিনীর মধ্য হইতে সত্য তথ্যের উদ্ধার সাধন চেষ্টা খুব কমই হইয়াছে। বরং সেই সমস্ত প্রবাদের উপর ভিত্তি বাঁধিয়া অনেকে অনেক গাল-গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গালার দুইটী স্থান চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে গৌরবের দাবী করে; দাবী করে—বঙ্গ-বাণী-কুঞ্জের এই প্রেম-করুণ-কণ্ঠ পাপিয়া তাহাদের বক্ষোনীড়ে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, দাবী করে—বাঙ্গালার অমিয়-মধুর প্রেম-সঙ্গীত তাহাদেরই নিত্যনীল গগনাঙ্গনে প্রথম প্রতিধ্বনিত হইয়া বাঙ্গালীর কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছিল। অবশ্য এই দুইটী স্থানের জনশ্রুতি যে একই প্রবাদের ধ্বনি-মুখর,—জন-স্মৃতি যে একই কিম্বদন্তীর শাসন-শ্লিষ্ট তাহা নহে। স্থানের নিদর্শনগুলিও পৃথক পৃথক, আবার তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যও আছে। এই দুইটী স্থানের একটী বীরভূম জেলায়—নাম নান্নূর, আর একটী বাঁকুড়া জেলায়, নাম "ছাতনা।" চণ্ডীদাসের ভিটা, বাসুলীর মন্দির ও মূর্ত্তি, রামীর ভিটা ও ধোপা-পুকুর উভয় স্থানেই আছে। রামীর সঙ্গে সম্বন্ধের প্রবাদ উভয় স্থানেই একরূপ। কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে পার্থক্য যাহা রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। নান্নূরের বাসুলী-মূর্ত্তি চতুর্ভুজা,—দুইটী হস্তে বীণাখানি ধরিয়া আছেন, এক হস্তে বাজাইতেছেন, আর

এক হস্তে জপমালা লইয়া যেন জপে নিযুক্তা। ছাতনার বাসুলী-মূর্ত্তি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ,—দ্বিভুজা, খড়্গ-খেটক-ধারিণী-অসুরমর্দ্দিনী। তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীর যে ধ্যান আছে, তাহার সঙ্গে এই দুইটী মূর্ত্তির কোনো মিল নাই। বৌদ্ধ-তন্ত্রে বাসুলী বলিয়া কোনো দেবতার নাম পাওয়া যায় কি না জানি না। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ অনুমান করেন, বজ্রেশ্বরী হইতে বাজসরী ক্রমে বাসলী বা বাসুলীতে পরিণত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহাশয় বলেন, বিশালাক্ষী ও বাসুলী পৃথক দেবতা, এবং ইহাঁরা উভয়েই ধর্ম্ম ঠাকুরের আবরণ দেবতা। বাসুলীকে তিনি মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাসুলীর ধ্যান—

ওঁ আয়াতাস্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে
কুণ্ডলে কর্ণপূরে।
সিন্দূরাভাব সন্ধ্যা প্রবিকট দশনা
মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে॥
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে
নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং
বাসুলী পাতু সা নঃ॥

এই ধ্যানের সঙ্গে ছাতনার মূর্ত্তিরও কোনো মিল হয় না; কারণ, এই ধ্যানে অসুরের কোনো বর্ণনা নাই। অথচ নান্নূর ও ছাতনার উভয় মূর্ত্তিই বাসুলী বলিয়া পরিচিতা। সাধুভাষায় কেহ কেহ বিশালাক্ষী বলিলেও নান্নূরের লোকে দেবীকে বাসুলী বলিয়াই জানে। আর ছাতনার দেবী সাধুভাষায়ও ঐ এক নামে—বাসুলী রূপেই প্রসিদ্ধা।

নান্নূরের প্রবাদ যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন, পদাবলীতেই তো উল্লিখিত আছে—

নান্নূরের মাঠে পাতের কুটীর
নিরঞ্জন স্থান অতি
বাসুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথি
ভজন করয়ে নিতি।

অন্যত্র—

নান্নূরের মাঠে হাটের নিকটে
বাসুলী থাকয়ে যথা
বাসুলী আদেশে চণ্ডীদাস নিতি
ভজন করয়ে তথা।

ছাতনার পক্ষপাতীগণ বলেন—পদাবলীতে একটী পদে শালতোড়া গ্রামেরও উল্লেখ আছে। এই শালতোড়া গ্রাম বাঁকুড়া জেলায়, এবং এই গ্রামে নিত্যাদেবী আজিও পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। এই পদটীতে কিন্তু আছে—

শালতোড়া গ্রাম পীঠস্থান অতি
নিত্যার আলয় যথা
ডাকিনী বাসুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা।
নিত্যার আদেশে বাসুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে
ভাবিতে ভাবিতে নান্নূর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাসুলী
প্রেম প্রচারের গুরু
তাহারই চাপড়ে নিন্দ ভাঙ্গিল
পীরিতি হইল সুরু।

ছাতনা গ্রামেই যে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান, বাঁকুড়ার লোক তাহা বলে না। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যা-নিধি বাহাদুর, এম-এ, মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ছাতনার লোকে বলে, চণ্ডীদাস বীরভূম হইতে আসিয়া ছাতনায় বাস করিয়াছিলেন। নান্নূরের লোকে বলে চণ্ডীদাসের ভাইয়ের নাম ছিল নকুল। নান্নূরের বাসুলী-পূজকগণ তাঁহারই বংশধর। ছাতনার লোকে বলে চণ্ডীদাসের ভাইয়ের নাম ছিল দেবীদাস, ছাতনায় তাঁহার বংশধরগণ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে আমাদের অনুমান হয়, চণ্ডীদাসের জন্মভূমি ছিল নান্নূর, উত্তরকালে রামীর সংস্রবে সামাজিক গোলযোগে, অথবা প্রবাদ-কথিত মুসলমান্ বেগমের অনুরাগ হেতু নবাবের ক্রোধবহ্নি হইতে রক্ষা পাইবার আশায় তিনি ছাতনায় গিয়া বাস করেন। ছাতনার তদানীন্তন জমিদার তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ছাতনায় বাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

বৌদ্ধযুগে রিদ্ধী রমণী ডাকিনী নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। আজিও তন্ত্রমন্ত্র-জানা স্ত্রীলোককে রাঢ়ের লোক ডাকিনী বলিয়া ডাকে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,

সেকালের রোদ্ধাচার্য্য নাড় পণ্ডিতের স্ত্রীর নাম ছিল নিণ্ড, বা জ্ঞান ডাকিনী। সুতরাং ডাকিনী বাসুলী সেকালের ঐরূপ তন্ত্রমন্ত্র-জানা স্ত্রীলোক ছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়। এই বাসুলীর আদেশে অথবা নিত্যাদেবীকে দর্শনের আশায়ও কবির বাঁকুড়া গমন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বাবু ছাতনীর প্রবাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় তাহা সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি ছাতনার পুরাতন বাসুলী-মন্দিরের বেষ্টনী প্রাচীর হইতে দুইখানি লিপিযুক্ত ইষ্টক আনিয়া পরিষদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। অবিলম্বে এই ইষ্টক-লিপি সহ বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংগৃহীত অপরাপর তথ্যাবলি পরিষদ-মন্দিরে আলোচিত হইবে। আমরা তাহারই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

পরিষদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রকাশিত হওয়ার পর পুঁথিখানি সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে সংশয়" এর আজ পর্য্যন্ত কোনো সদুত্তর প্রকাশিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষ পত্রে আমরাও কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম; সে প্রশ্নগুলিরও কোনো সুমীমাংসিত উত্তর পাওয়া যায় নাই। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের গীতিরস আস্বাদন করিতেন, সেই চণ্ডীদাসই খাঁটী চণ্ডীদাস, এবং পরবর্ত্তী পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে সেই চণ্ডীদাসেরই গীতাবলী স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস গানের পুঁথি লিখিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সে গানগুলি প্রচারিত হয় নাই, ইহা কখনো সম্ভব হইতে পারে না। উল্লেখ-যোগ্য দুইজন চণ্ডীদাস থাকিলে, কোনো না কোনো সংগ্রহ গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যাইত। ইহা নিঃসন্দেহ যে তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন নামধেয় পুঁথিখানি অনন্ত-নামা কোনো গায়েনের পুথি, এবং সেই অনন্ত ঝুমুরদলের ওস্তাদ বা মূল গায়েন ছিলেন। সেই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অথবা পুরাণ-বিরুদ্ধ মামী-ভাগিনেয় সম্বন্ধ লইয়া অশ্লীল উত্তর-প্রত্যুত্তর, সেই গ্রাম্য ভাষায় গ্রাম্য উচ্চারণে নিতান্ত গ্রাম্য রসিকতায় কৃষ্ণ-রাধিকায় একটা পাল্লাপাল্লি ভাব,—একেবারে ঝুমুর। তবে যে দুই চারিটী ভাল গান তাহার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহার কারণ, ঝুমুর গায়কেরা নিজেদের বাঁধা গান গাহিবেও অপর পাঁচজনের গান জোগাড় করিয়াও গাহিয়া থাকে। তাই এই সংগ্রহের মধ্যে "কেনা বাঁশী করে বড়াই কালিনী নই কুলে" "প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি" প্রভৃতি গান অথবা "যদি কিছু বোল বোলসি তবে দশন রুচি তোহ্মারে" ও "লাবণ্য জল তোর শিহাল কুন্তল" ইত্যাদি অনুবাদিত পদগুলি স্থান পাইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, খাঁটী চণ্ডীদাসেরও দুই চারিটী গান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসের একটী বিশিষ্ট সুর আছে, এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সেই সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পদাবলীর ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলেও সেই সঙ্গে যে ভাবেরও আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোনো অসীম ধৈর্য্যশালী জয়গোপাল বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে এই ভাষা ও ভাবের পরিবর্ত্ত সাধন করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার কীর্ত্তন গায়কগণ তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন, তাহা হইলেও এ প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হয় না যে, অতি পুরাতন জীর্ণ কীট-দষ্ট পুঁথি হইতে নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির সঙ্গে এই কালে প্রচারিত সর্ব্বজন পরিচিত পদগুলির লিপি সমঞ্জস্য ও সুরের ঐক্য রহিল কিরূপে? কথা উঠিতে পারে, রস পর্য্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া পদগুলি একটী নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করিয়াছে; সুতরাং পরিবর্ত্তন যদি কিছু হইয়া থাকে, সেও অই রস পর্য্যায় মতই হইয়াছে; তাই গুরুতর অনৈক্য পাওয়া যায় না। কিন্তু চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য তো শুধু কোনো একটী রসের পদেই সীমাবদ্ধ নহে। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগ, চণ্ডীদাসের মিলন, চণ্ডীদাসের মান, চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ, আত্মনিবেদন—সে-যে দেখিলেই চিনিতে পারা যায়, শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়। চণ্ডীদাসের সুরে, তাহার গীতি-প্রবাহিনীর বঙ্কোধারার তালে, তাহার ছন্দে, তাহার লীলায় সর্ব্বত্রই সেই একই ভাবের খেলা। সেই নামে পাগল, দর্শনে আত্মহারা, মিলনে মুদিতা, সরম কলিকা সেই রোদনে বিহ্বল, বেদনায় করুণ, বিনামূল্যে চিরবিক্রীতা কিশোরী প্রেমিকা,—সেই বিষামৃতের জ্বালাময়ী, আনন্দে যৌবনে যোগিনী

রাজনন্দিনী শুধু চণ্ডীদাসের কাছেই ধরা দিয়াছিলেন। পদাবলীর প্রতি পদে সেই চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য পদাবলীর মধ্যেও অনেক অন্য লোকের লেখা বাজে পদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তো সবই বাজে, তাহার কয়টা পদে চণ্ডীদাসকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়? আর বৈষ্ণব পদাবলীর রসের শ্রেণী বিভাগও কিছু আজই হয় নাই, সে হিসাবেও তো জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, চণ্ডীদাসের এই যে বিশেষত্ব প্রায় গত চারিশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার চিত্ত বিনোদন করিয়া আসিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে তাহার অভাব সত্ত্বেও কি তাহাকেই খাঁটী চণ্ডীদাসের বলিয়া প্রচার করিতে হইবে?

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা অধিকাংশই গ্রাম্য ভাষা; রাঢ়ের বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের বহু পল্লীতে আজিও সে ভাষা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার লিপিকরও এমন অনেক আছেন, যাঁহারা সেই গ্রাম্য ভাষাকে অক্ষরের ফাঁদে ফেলিয়া, কোথাও বিকল করিয়া, কোথাও অবিকল রাখিয়া, ভবিষ্যৎ পণ্ডিতগণের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত কার্য্যে আজিও অকাতরে অহরহঃ পরিশ্রম করিতেছেন। এই সমস্ত তথ্য না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের গ্রাম্য শব্দ এবং তাহার মূর্খ লিপিকরের অনাবশ্যক অনুস্বার ও যথেচ্ছ বানান বিপর্য্যয়কে ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালার বহুভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এমন কি "মজুর" প্রভৃতি শব্দ থাকা সত্ত্বেও ইহাঁরা কৃষ্ণকীর্ত্তনখানিকে খৃঃ চৌদ্দ শতাব্দীতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য দারুণ টানাটানিরও কসুর করিতেছেন না। সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ করিয়াছেন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়। তিনি কেম্ব্রিজের 'ক'য়ের ফ্যাঁচা এবং চোড়-গাঙ্গর তাম্রশাসনের 'চ'য়ের ধাঁচা মিলাইয়া এক গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। অমুক সময়ের শ' কারের সঙ্গে এবং অমুক সময়ের ব' কারের সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথির অক্ষরের মিল পাওয়া যাইতেছে; অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তন অমুক সময়ের, ইহাই হইল তাঁহার সিদ্ধান্ত। অথচ তিনিই বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তিন প্রকারের হস্তাক্ষর পাওয়া যায়,—প্রাচীন, প্রাচীনের অনুসরণ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীনটা বুঝিলাম। কিন্তু অনুসরণ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক আসিল কোথা হইতে, কে তাহাদের আনিল, এ সবের উত্তর দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই। আমরা মৌখিক আলোচনায়ও তাঁহার নিকট হইতে কোনো সদুত্তর পাই নাই। পুঁথির একই গাতার এক পৃষ্ঠায় তাঁহার কথিত প্রাচীন ও অপর পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত আধুনিকের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি মীমাংসা করিয়াছেন যে, পাতাটীর এক পৃষ্ঠায় লেখা খারাপ হইয়া যাওয়ায়, কোন পরবর্ত্তী লিপিকর তাহার উপর একখানি অতি সূক্ষ্ম কাগজ আঁটিয়া দিয়া অন্য আদর্শ পুঁথি হইতে পাতাটী নকল করিয়া দিয়াছে। তিনি না কি পুণায় ঐরূপ বহু পুঁথি দেখিয়া আসিয়াছেন! কিন্তু আমরা এখানে দেখিতেছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কাগজ এক, কালি এক, কেবল হাতের লেখাই বিভিন্ন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, একই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতের লেখা চিরকালই যেমন ভিন্ন ভিন্ন রকম চলিয়া আসিতেছে, সেকালে সেই রকমই ছিল। যে লোকটী পুঁথি নকল করিতেছিল, তাহার ক্লান্তির সময়েই হউক বা অন্য সময়ে অন্য কারণেই হউক, আর একজন লোক মাঝে মাঝে লিখিয়া দিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল। লেখক দুইজন একই সময়ের, এবং পুঁথির বয়স হয় তো বড় জোর তিনশত বৎসরের বেশী না-ও হইতে পারে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের সেবক তাহা মানিবেন কেন? তিনি ঐ সাহায্যকারী বেচারাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছেন।

৩

সকলেই জানেন, চণ্ডীদাসের গান শ্রীচৈতন্যদেবের অতি প্রিয় ছিল। তাঁহার ভক্তগণ অনেক সময় তাঁহাকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গান শুনাইয়া ভুলাইয়া রাখিতেন, তৃপ্তি দান করিতেন, এবং আপনারাও প্রেমানন্দে মত্ত হইতেন। সম্প্রতি আমরা এইরূপ একটী গানের সন্ধান পাইয়াছি। গানটীর চারিটী চরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের অপর কয়েকটী নূতন গানের সঙ্গে এক টুকরা জীর্ণ কাগজে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এই গানটী সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়াছে। মহাপ্রভু যেদিন এই গানটী শুনিয়াছিলেন, তাহার একটু ইতিহাস দিতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

নদীয়ার নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। শচী-মায়ের অঞ্চলের নিধি, ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গোরা, নবদ্বীপের নয়নের আলোক আজ বৃন্দাবনের পথে যাত্রী। অপূর্ব্ব প্রেমোন্মাদে তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়া পথের ধারে গোচারণরত রাখাল বালকদের তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকগণ, বৃন্দাবনের পথ কোন্ দিকে বলিতে পার? নিত্যানন্দের পূর্ব্ব শিক্ষামত তাহারা তখন গঙ্গা-তীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। চৈতন্যদেব চলিতে লাগিলেন। পাছে পাছে নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ তিনজনে অলক্ষিতে চলিতেছিলেন। এক্ষণে নিত্যানন্দ প্রভু আচার্য্যরত্নকে শান্তিপুর ও নবদ্বীপে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া, আপনি আসিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে আত্মপরিচয় দিলেন। নিত্যানন্দ মিথ্যা কথা বলিলেন,—তিনি বৃন্দাবন যাইতেছেন। শুনিয়া গোরাচাঁদও তাঁহার সঙ্গ ধরিলেন এবং যথাসময়ে সুরধুনী তীরে উপনীত হইলেন। নিতাই গঙ্গা দেখাইয়া বলিলেন, এই যমুনা। নৌকা প্রস্তুত ছিল, অবিলম্বে তাঁহাদিগকে শান্তিপুরে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিল। আচার্য্য অদ্বৈত সকলকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইলেন। আচার্য্যকে দেখিয়া মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি বুঝিলেন, নিতাই তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্যের বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিলেন। আচার্য্য সকলকে লইয়া গৃহে আসিলেন।

আচার্য্যের মন্দিরে সেদিন সে কি সমারোহ,—শান্তিপুরে আনন্দের হাট বসিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। আপনি অদ্বৈত আচার্য্য সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। হৃদয়ে "ভরা-ভাদরের" আনন্দপ্লাবন, দেহে নবযৌবনের পুলকোচ্ছ্বাস,—বৃদ্ধ নাচিয়া নাচিয়া গায়িতে লাগিলেন—

"কি কহবরে সখি আজক আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর"

প্রহরেক পর্য্যন্ত নৃত্যগীত চলিল।

প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণ সঙ্গ
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ।
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা
গোসাঞী দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা।
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে।
আচার্য্য উঠাইলা প্রভুকে করিতে নর্ত্তন
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ।
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্‌গদ বচন
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেক রোদন।"

(চৈঃ চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ)

মুকুন্দ গাহিতে লাগিলেন—

"হা হা প্রাণ প্রিয় সখি কি না হৈল মোর
কাণু প্রেম বিষে মোর তনু মন জারে।
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ।"

ইহাই হইল গান শুনিবার ইতিহাস। চরিতামৃতে কেবল এই চারি চরণের উল্লেখ আছে।

আমরা যে পদটী পাইয়াছি—

"ইহা প্রাণ প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।
কাণু প্রেম বিষে মোর তনু মন জারে॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
যথা গেলে কানু পাই তথা উড়ি যাই॥
হেদেরে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা॥
অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস কহে ধনী এমতি না বল"।

ইহা আক্ষেপানুরাগের পদ। এই পর্য্যায়ের পদ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অনেক পাওয়া যায়। ভনিতা না থাকিলেও বুঝিতে বিলম্ব হইত না যে, এ পদ চণ্ডীদাস ভিন্ন আর কাহারো হইতে পারে না। এই পদটী দেখিয়া মনে হইতেছে, খাঁটী চণ্ডীদাসের পদই মহাপ্রভুর আস্বাদন সৌভাগ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিল, এবং খাঁটী চণ্ডীদাসের পদই পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অবশ্য দু একটী পদে গোলযোগ থাকিতে পারে। আমাদের অনুমান, তাহা আছে,—ইতিপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' আমরা তাহার উল্লেখও করিয়াছি।

স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর সংগ্রহ-গ্রন্থেও চণ্ডীদাসের নামে অনেক বাজে পদ স্থান পাইয়াছে। ছত্রিশ অক্ষরের

পদগুলিতে, দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদে এবং সহজিয়া সাধনের নামে প্রচলিত পদগুলির মধ্যে এইরূপ গলদ আছে। অনেক পদে রূপের নাম আছে,—

"রূপকরুণাতে পারিবে জানিতে"
"শ্রীরূপ করুণা যাহারে হয়েছে"

ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদগুলি কখনই চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই রূপকে ব্যাখ্যা করিয়া যে শ্রীরূপ মাজরী সখিতে রূপান্তরিত করা যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। আর সে ব্যাখ্যা করিতে গেলেও চণ্ডী-দাসের সময়ে তাহার সামঞ্জস্য মিলিবে না,—ঐরূপ ব্যাখ্যা মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালেই প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ "রূপ" যে সহজিয়াগণের তথাকথিত গুরু—প্রভুপাদ "রূপ গোস্বামী" তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। ভারতবর্ষে প্রকাশিত সহজিয়া প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। চণ্ডী-দাসের সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক রহিল, বারান্তরে বলিব। আজ চণ্ডীদাসের আর দু একটী নূতন গান উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

১

একদিন আমি গিছিলাঙ যমুনা
সকল সখির সনে।
আচম্বিতে হেদে রামারে দেখিঞা
হানিল নয়ান বাণে॥
সেজন কে বটে না দেখি তাহাকে
আমারে না দেখে সে।
তাহার লাগিঞা সদা প্রাণ কান্দে
এ কথা বুঝিবে কে॥
সে দিন অবধি হেদে নিরবধি
আন নাহি মোর মনে।
কে কহ সেজনা ঘুচুক বেদনা
বল দেখি কোন জনে॥
কহে এক নারী শুন বিনোদিনী
জতনে সুনহ রাধে।
নন্দের নন্দন ব্রজের জীবন
জগতে এ নাম সাধে॥
এ নাম শুনি রাই বিনোদিনি
অমিয়া ভরল দেহা!
কহ কহ পুন মধুর বচন
কিবা সে তাহার লেহা॥
চণ্ডিদাসে কহে সেইযে বটয়ে
নন্দের নন্দন কাণু।
তরুয়া কদম্বে সে জন বসিঞা
পুরে এ মোহন বেনু॥

(২)

সখি কি কহব নিশির রঙ্গ।
সো নব নাগর রসিক শেখর
হইব তাহার সঙ্গ॥
বিনোদ জলদ বরণ সেজন
চূড়াটি বান্ধিঞা টানে।
নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপাম
মুকুতা প্রবাল সনে॥
মধু মৃদু হাসি ঝরে কত রাসি
কটাক্ষ কি তার ভাতি।
হেন মনে করি গাগরি গাগরি
ভরিঞা ভরিঞা রাখি॥
মোহন মুরলি বদন সেজন
নিশিতে আসিঞা সেই।
ধর ধর পর অতি মনোহর
হার পরাইঞা দেই॥
হেন বেলায় জাগে পাপ নোনদিনী
উঠিল যাগিনা মাঝে।
আস্তে ব্যস্তে হেদে তাহারে উঠাত্যে
পাইল বড়ই লাজে॥
তরাসে তখনি কপাট ঘুচাঞা
কাণু উঠাইঞা দিল।
চণ্ডীদাসে কয় হেন মোনে লয়
ননদি জানিঞা ছিল॥

(৩)

সেই কে জানে এমনি হব।
পরিণাম সারা ভাবিতে সংসয়
তাহারে পরাণ দিব॥

হাসিতে হাসিতে সোনার সহিতে
করিলাঙ প্রেমের লেহা।
জাতি কুল সিল সকলি মজিল
কবে হারাইব দেহা॥
কালিয়া বরন ধরয়ে জেজন
কেবল বিসের রাসি।
কুটিল হৃদয় জানিল সদয়
মুখেত অমৃত হাঁসি॥
সকল ছাড়িঞা সরল জন এ
তাহারে করয়ে হেন।
কেবলে দয়ার ঠাকুর সেজন
বিসের সমান জেন॥
জাবত জিবন জে নারি ধরয়ে
পাছে করে পর প্রেমা।
সেজনা পরিঞা যাউক তখনি
বুঝিঞা দেখিলাঙ য়ামা॥
বিসেষে কালিয়া মারিল ভালিঞা
কালিয়া প্রেমের ফান্দে
তাহার লাগিঞা এ দুটি নয়ান
নিরবধি কেনে কান্দে॥
ছারেখারে জাউক কুলের গরিমা
মরিঞা জাউক সে।
পরবস হঞা জে নারি থাকএ
পিরিতি করয়ে জে॥
চণ্ডিদাস কহে কানুর পিরিতি
অইছন কিরিতি তার।
প্রেমের পাথার রাপার সাঁতার
নাহিক উপায় পার॥

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সূর্য্যোদয়ের ঠিক্ পূর্ব্বেই একপশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল,—উঠিয়া পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি—সদ্যস্নাত প্রকৃতি যেন পত্র-পুষ্প-দূর্ব্বাদির ডালা সাজাইয়া অরুণ-পূজার জন্য প্রস্তুত। মৃদুমন্দ সমীরণ-সংঘাতে শাখা-পল্লব ব্যজনারম্ভ করিয়াছে,—পাখীদের কণ্ঠে আবাহন-গীতি। কি সুন্দর প্রভাত!

সহসা একটি দোয়েলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চাহিয়া দেখি, অব্যবহার্য্য খেতাবের মত মিথ্যা অনেকটা জায়গা যোড়া বাড়ীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণটির দূর প্রান্তে, একটি কুলগাছে বসিয়া সে তাহার শ্রেষ্ঠ সম্বল ভগবানকে নিবেদন করিতেছে।

বিষয়ী লোক মাত্রেই "আয়" রাখিয়া কাজ করেন। কাবুলীরা কতটা বিষয়ী তাহা জানি না; তাহারাও দেখি, পাঁচগজের পরিবর্ত্তে—পঞ্চাশ গজের পাজামা বানায়। এ বাড়ীটির নির্ম্মাতাও সে সম্বন্ধে ভুল করেন নাই—খুব সজাগ ছিলেন। উঠানটি চারপাঁচ কাঠার কম হইবে না,—প্রাচীর দিয়া আঁটা। তিনটি কুলগাছ তাহার প্রায় অর্দ্ধেকটা অধিকার করিয়াছে। এত বড় কুলগাছ ও তাহাতে কুলের এত প্রাচুর্য্য, বাস্তবিকই দর্শনীয় দৃশ্য। মাঘ মাসের পরিণত-বয়স্ক সুপুষ্ট অসংখ্য সদ্য-ধৌত কুলের উপর প্রাতঃকালের স্নিগ্ধোজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে, এক বিচিত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। আসে পাশে সবুজ লাল হল্‌দে ফলে দলে দলে লঙ্কাগাছ হাজির। এই সামান্য সম্বলেই তাহারা অনেক পাখী জড় করিয়া ফেলিয়াছে, ও তাহাদের গান শুনিতেছে। আমিও তাহা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ নজরে পড়িল—বাড়ীটির আগম-নির্গমের পাঁচটি পথ! মানে কি? কোন অজানা তান্ত্রিয়া ভীল

থাকিতেন না ত'? বাড়ীটি পুরাতনও বটে! আমার সৌন্দর্য্য উপভোগের আরামটা সহসা সরিয়া গেল। কাল-ধর্ম্ম বশে মনে হইল—নজরের জিনিস নয় ত,—সঙ্গে আবার ছ'ফুট ছাউনির জয়হরি!

অন্যমনস্ক হইয়া ইতিকর্ত্তব্য ভাবিতেছি, এমন সময় গৃহস্বামীর আওয়াজ পাইলাম, তিনি বলিতেছেন, "এত ভোরে উঠে পড়েছেন যে,—ঘুম হয় নি বুঝি?" বলিলাম, "না; ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিয়েছি, ওইতেই আমার যথেষ্ট হয়। এখানকার প্রভাত বড় মনোরম,—না উঠলে সেটা জানতেই পারতুম না। বাল্যকালে কুলগাছের সঙ্গে কম পরিচয় ছিল না; কিন্তু তার যে এত সৌন্দর্য্য, তখন সেটা লক্ষ্যই করি নি। শুনেছি, কাশীধামে সকল তীর্থই বর্ত্তমান, বৈদ্যনাথ ধামেও এইটি বোধ হয় "বদরিকাশ্রম"। ধন্য আপনি!"

তিনি বলিলেন,—"ধন্য বই কি! তবে বৈকালে দেখলে, আপনাকে ঐ 'বোধ হয়' টুকু বাদ দিতে হবে,—তখন আর সন্দেহ থাকবে না। সেই জন্যেই ত' এ বাড়ীর ওপর সকলের এত টান্।"

বলিলাম,—"অলৌকিক কিছু আছে না কি?"

তিনি বলিলেন,—"আমি ত' অলৌকিকই ভাবি। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল;—আপনি কি ভাববেন জানি না। আপনি ত জানেন—ফিট্, অজীর্ণ, আর অম্বল,—এই তিন সম্বলে বাঙ্গালীর সংসার;—সোণার গয়না আর সোণালী-গোড়া জরদা সংযোগে—"সোণার-সংসার"ও বল্‌তে পারেন। পূর্ব্বেই বলেছি—অম্বলে বড়ই কাতর থাকেন। আহারান্তেই ও-রোগটার বৃদ্ধি। তখন কুলতলায় মাদুর পেতে "হত্যা" দেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফললাভ! ফল—আকাশ পথে টুপ্‌টাপ্ চলে আসে। ভুগে-ভুগে লোক রোজা হ'য়ে দাঁড়ায়; অনুপান ওঁদের জানাই আছে—লবণ সঙ্গেই থাকে, আর হাত বাড়ালেই লঙ্কা! শাস্ত্রীয় সংখ্যা—অর্থাৎ ১০৮ পুরো হলেই বেশ চাঙ্গা হ'য়ে ওঠেন। আশ্চর্য্য মহিমা,—অলৌকিক নয় কি?"

বলিলাম,—"নিশ্চয়ই, হিঁদুর সাধ্য কি যে সন্দেহ করে। পণ্ডিতেরা একেই বলে গেছেন revelation। আচ্ছা,—আর একটা জিনিস চোখে পোড়ল, সেটাও ঠিক্ বুঝতে পারি নি। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষই দেখেছি, আর পঞ্চ পাণ্ডব ছিলেন শুনেছি, এমন পঞ্চমুখী বাড়ী তো কখন দেখি নি! এতেও অলৌকিক কিছু আছে না কি!"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন,—"একটু আছে বই কি! সংক্ষেপেই বলি,—আগে সদর আর খিড়কী মাত্রই ছিল। এক ভদ্রলোক ভাড়াটে এই বাড়ীতে কিছু দিন থাকেন। তাঁর ছিল দুই বিবাহ,—দুই স্ত্রীই সঙ্গে ছিলেন। তাই সুখ-শান্তির আতিশয্যে, তিনি আত্মরক্ষার্থেই আর তিনটি দোর নিজের ব্যয়েই বানান। শান্তির চরম অবস্থার তাড়সে, যে ফাঁকটা সামনে পেতেন, সেইটে দিয়েই ছুটে পালাতেন। শুনতে পাই, কারো কারো কাছে তিনি দুঃখ ক'রে বলেছিলেন,—কোন' জিনিসই নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয় মশাই; এত ভাবি এ বাড়ীতে আর ঢুকব না,—ঘণ্টা তিনেক পথে পথে ঘুরে, শেষ দেখি, একটা না একটা দোর দিয়ে এই শান্তি-কুটীরেই ঢুকে পড়েছি! পৃথিবীটে গোল্ হ'য়েই যত গোল্ বাধিয়েছে!"

বলিলাম,—"আহা, কি সঙ্গীন্ অবস্থা। ভাগ্যে বুদ্ধদেব এটা দেখ্‌তে পাননি, তা হলে বোধ হয় দেহত্যাগই ক'রে বস্‌তেন। যা হ'ক্—বাঙ্গালার ইতিহাসের এইরূপ কত খাঁটি উপকরণই এখনো অনাবিষ্কৃত অবস্থায়, কত স্থানেই আত্ম-গোপন ক'রে রয়েছে। শক্তিমান সরকার মশাই মোগল-পাঠান নিয়েই রইলেন,—ঘর সাম্‌লায় কে?"

জয়হরির চীৎকারে প্রসঙ্গটা থামিয়া গেল। সে বৃষ্টির সংবাদ রাখে নাই, উঠিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে,—"একবার দেখুন মশাই—কি রকম হিমটা পড়ছে,—রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। এ সব দেশ স্বাস্থ্যকর হবে না! দেখুন না, এর মধ্যেই বেশ চন্‌চনে—" (বলিতে বলিতে দুইবার পেট্ চাপড়াইয়াই কর্ত্তাকে দেখিতে পাইয়া সলজ্জ হাস্যে থামিয়া পড়িল।)

কর্ত্তা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আমি ত' তা-ই চাই; আপনারা মুখ হাত ধুতে ধুতে চা আর হালুয়া হ'য়ে যাচ্চে।"

আমি বিরক্তিটা সামলাইয়া বলিলাম,—"ক'দিন এসেছি—এখনো বৈদ্যনাথ দর্শন করি নি; আজ শুক্রবার—বাবাকে দর্শন করবার প্রশস্ত দিন, শীগ্‌গির শীগ্‌গির কাজ সেরে চ'লো, দর্শন ক'রে আসি—"

জয়হরি রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, সেই ভাল,—ঐ ধোঁওা দেখা দিয়েছে,—কতক্ষণই বা লাগবে,—চা আর হালুয়া বই ত' নয়—"

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"একটু দেরি করলে খান কতক গরম গরম ডালপুরী হয়ে যেতে পারে, ডাল ভিজানই আছে, বেঁটে নিতে বা দেরি,—কি বল' ?"

"ভিজোনো থাকলে আর কতক্ষণ—" বলিয়া জয়হরি উৎফুল্ল নেত্রে আমার দিকে তাকাইল। সে অবস্থায় মানুষকে হতাশ বা ক্ষুণ্ণ করার সাজা নিজেকেই ভোগ করিতে হয়, এবং সে মন লইয়া দেব-দর্শন করা অপেক্ষা না করাই ভাল,—এই ভাবিয়া সহজ ভাবেই তাহাকে বলিলাম,—"আমার কোন আপত্তিই ছিল না; কিন্তু এত বড় পীঠস্থানে এসে কেন আর অনিয়মটা করা! সব প্রস্তুতই থাকবে, দর্শন ক'রে এসে খেলে দেখবে, কত বেশী তৃপ্তি হয়। এক পো পথও নয়,—রাস্তায় পা দিলেই মন্দির দেখা যায়;—ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আসা যাবে।"

বাধাটা সে আশাই করে নাই, তাই একটু অবাক হইয়া শেষ বলিল,—"তা—আচ্ছা—তবে—, কিন্তু ঐ যে বললেন—এক-পো পথও নয়, আর তার কারণ দেখালেন,—"পথে পা দিলেই মন্দির দেখা যায়",—ওটা আপনার চোখ দিয়ে মাপা "পো"; কিন্তু চোখ দিয়ে ত' হাঁটা চলবে না। পাহাড়ী জায়গায় অমন দেখায়; তার মাপ কিন্তু আলাদা। আপনাকে কখনও কুকুরে কামড়ায়নি বুঝি? আমাকে মশাই সরকারদের বেঁড়ে তেড়ে এসে কামড়ে দুটি সুবিধে করে দিছল;—বাড়ী শুদ্ধ সবাই সেধে সেধে ঘি খেতে দিত,—লুচি হালুয়া তিন চারবার পেতুম। এখন একবারও কেউ পোছে না;—বেঁড়েটাও মরে গেছে! তার পর সরকারের পয়সায় ক্রসোলী গিয়ে পাহাড়ী মাপ শেখাও হ'ল। দেখতুম, সিমলের পাহাড়ে ইলেক্‌টিক্ আলো জলছে; বোধ হ'ত যেন ও-পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ী—বড় জোর দশ মিনিটের পথ। পরে জানলুম—হেঁটে পৌঁছুতে পাহাড়ীদেরও পুরো দু'দিন লাগে। যাক্—বেঁড়ে বেঁচে থাকলে নিজেই দেখে আসতে পারতেন।—তা চলুন, একটা লাঠীন্ কিন্তু নেওয়া চাই।"

ভাবিলাম, জয়হরি বুঝি রহস্য করিতেছে; কিন্তু গৃহস্বামীর দিকে চাহিয়া সে যখন বলিল,—"ফেউয়ের ডাক যদি শুনতে পান ত' ডালপুরীগুলো আর মিছে রাখবেন না,—খেয়ে ফেলবেন", তখন তাহার মুখের কাতর ভাব দেখিয়া আর সে সন্দেহের অবকাশ রহিল না। বোধ হইল সত্যই তাহাকে যেন 'দুর্গা' বলিয়া ঝুলিয়া পড়িবার পথে টানা হইতেছে। মনে মনে দেব-দর্শনের আশা ত্যাগ করিলাম। ভাবিলাম—দেবতা অন্তর্যামী; তিনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা জানিতে পারিতেছেন।

কর্ত্তা কিন্তু জয়হরির ডালপুরী সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা শুনিয়া হাসি চাপিতে পারিলেন না। তিনি খুব মিসিবী লোক,—উকীলের আবহাওয়ায় তাঁর বাস,—জয়হরিকে যথেষ্ট আশ্বাস ও অভয় দিয়া, এবং আমার অবস্থাটাও অনুমান করিয়া লইয়া, দুদিক রক্ষা হয় এমন একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবার আশ্বাস ইতিপূর্ব্বে জয়হরিকে দিয়াছিলাম। তিনি সেই সূত্র টানিয়া একটু লম্বা করিয়া বলিলেন—"জয়হরিবাবু এক ঘণ্টার স্থলে দেড় ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেব-দর্শনার্থ দিতে পারেন। দেড় ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে তিনি যেখানেই থাকুন, অসঙ্কোচে সরাসর বাসায় ফিরিয়া আসিবেন, তাহাতে কাহারো কোন কথা চলিবে না।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঢালা সম্মতি দিলাম, এবং মিনিট পনরো মধ্যে প্রস্তুত হইয়া নগ্ন-পদে 'শ্রীদুর্গা' বলিলাম। শ্রীমান স্ব-ইচ্ছায় সঙ্গী হইল—যেহেতু আমাদের কিছুই জানা-শুনা নাই, পাণ্ডারা নানা প্রকার বাজে (item) 'বাব্' উল্লেখ করিয়া পয়সা ঠকাইয়া লইবে। শ্রীমান বাজের যেমন বিরোধী, ঠকিতেও তেমনি নারাজ।

তখন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এ রাস্তাটি দেওঘরের বায়ু-সেবনার্থীদের জন্য নয়; ইহার দুইধার দোকান আর মোকাম দিয়া আঁটা, সুতরাং বাতাস বাধা পায়। দৃশ্যটাও romantic নয়,—কাপড়, জামা, বাসন, আসন, কম্বল, ছড়ি, ঘড়ি, ছাতা, চুড়ি, চশমা, ল্যাম্প, ছুরি, কাঁচি, ট্রঙ্ক, ব্রস্, চিরুণী, আয়না, ক্রচ, উল্, ক্রুজ্, সোডা, লিমন্, জিঞ্জার, পান, বিড়ি, সিগার, এসেন্স, সোপ, সুগন্ধী তৈল, মনিহারের বিবিধ বিলাস-সম্ভার, রাবড়ী, লাড্ডু, দধি, পেড়া—ইত্যাদি নিত্যাদি। উপরন্তু—চায়ের দোকান; 'অলমতি বিস্তরেন'। কাশীর দশাশ্বমেধ হইতে বিশ্বনাথের গলির খস্‌ড়া বা rough sketch বলা চলে। সেখানে গলির দুধারের দোকানের সুসজ্জিত শোভন সামগ্রী সকল দেখিয়া একটি মাদ্রাজী স্ত্রীলোককে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"মায়ার কি সমাবেশ!" কথাটার এমন সুপ্রয়োগ পূর্ব্বে কখনো শুনি নাই। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সহজ ভাবেই বলিয়াছিলেন,—উহার মধ্যে আধ্যাত্মিক আঁচ মাত্রও ছিল না। বোধ করি মাদ্রাজবাসীরা নয়ন-মন আকর্ষণকারী সামগ্রীকে "মায়া" বলিয়া থাকেন। এখানেও "মায়ার" অপ্রাচুর্য্য পাইলাম না।

যাক্,—খুঁটিনাটি চলিবে না, বেশী কথার সময় নাই;—ডালপুরী প্যারদার মত পাছু লইয়াছে ও তাড়া দিতেছে! ঘড়ি জয়হরির দখলে, কেবল কোন একটি অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায়, তাহার অজ্ঞাতে, ঘড়ির চাবিটি বাসায় রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীমান আমাদের গাইড্‌রূপে এটা ওটা দেখাইতে দেখাইতে চলিয়াছিল। খুব উৎসাহের সহিত কয়েকটি মনিহারীর দোকান দেখাইয়া বলিল "এ সব বাঙ্গালীর।" ভদ্র বাঙ্গালী যুবকদের মনিহারী দোকান করাটা ধাতে সয় ভাল; কারণ, তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের বালাই নাই বলিলেই হয়; দোকান সাজানো আর নিজে সাজা দুই-ই চলে;—নাড়াচাড়া কেবল—ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে সুগন্ধী আর সৌখীন জিনিস। খরচের মধ্যে—মিষ্ট কথা আর হাসি মুখ, বড় জোর সিগারেট্ সেবন;—খাতায় আঁক পাড়িতে হয় না। এ ছাড়া এখানে বাঙ্গালীর আরো ব্যবসা আছে,—গোলাপ-বাগ (Rosary), মেডিকেল-হল্, ডিস্‌পেন্‌সরি, News Paper Agency। ইহার কোনটিতেই কাহাকেও কৌলীন্য খোয়াইতে হয় না, অতএব কম্ লাভ নয়। আমদানী রপ্তানীর কাজ যথা নিয়ম মাড়োয়ারীরাই করিতেছেন।

শ্রীমান বলিলেন—"এক পয়সার বাতাসা, এক পয়সার ফুল আর দু'জনে দু'পয়সা দক্ষিণা দিলেই হবে,—"রেট্" খারাপ করবেন না।" বুঝিলাম—সঙ্গে খুব কড়া হাকিম; অপরাধের জন্য রাস্তা রাখা চাই। বলিলাম—"ও সম্বন্ধে আর কথা আছে,—দেবতার স্থানে রেট্ খারাপ! তবে,

দেশের অশিক্ষিত, মেয়েদের মুখ ঘুমী এড়ানো কঠিন হ'য়ে পড়ে,—তাঁদের মানসিকগুলোই মুস্কিল বাধায়; আবার দেবতারাও না কি অন্তর্যামী।"

শ্রীমান অসময়ে সাবধান করেন নাই, সম্মুখেই দেখি—মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের সুউচ্চ সিংহদ্বার,—চারিদিকে প্রস্তর-প্রাকার। দেখিলেই একটা বড় কিছুর আভাস দেয়!. প্রবেশ করিতেই—সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ দর্শনে প্রাণে একটা স্বস্তি অনুভব করিলাম। অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, দেবতাকে তাঁহার বিশ্ব হইতে বে-দখল করিয়া, এক নিভৃত প্রান্তে কোণ-ঠাসা করিয়া রাখা হইয়াছে! সেটা যেন,—ছেলেদের সর্ব্বস্ব উইল করিয়া দিবার পর, বিরক্তি-কর দীর্ঘায়ু-প্রাপ্ত বৃদ্ধ বাপের অন্যায় বাঁচিয়া থাকার ও অসহায় অবস্থার, সাজা ভোগের ব্যবস্থা! যাহা হউক, এখানে তেমন কোন স্থান-কুণ্ঠার বাধা বা আঘাত না থাকায়, বিমুক্ত প্রাঙ্গণে যেন একটা আনন্দের মুক্ত বাতাস গায় লাগিল।

মধ্যস্থলে—উন্নতচূড় বাবা বৈদ্যনাথের মন্দির। প্রাকার-গাত্রে অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিষ্ঠান। সোম-শুক্রে যাত্রী সমাগম ও ভক্তের ভিড় বেশী হয়,—আজ শুক্রবার। কিন্তু বহিঃপ্রাঙ্গণ এত বড় যে, কাহারো কোন অসুবিধার কারণ নাই,—সকলেই বেশ স্বচ্ছন্দ।

নন্দকিশোর পাণ্ডাকে বহু অনুসন্ধানেও না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল। অপেক্ষা করাও অসম্ভব,—জয়হরি দেবদর্শন বর্জ্জন করিয়া অনায়াসে ডালপুরী চর্ব্বণ শ্রেয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারে! কাজেই শ্রীমানের পরিচিত এক পাণ্ডার শরণ লওয়া গেল। তিনি সন্নিকটস্থ বারাণ্ডায় একজনের নিকট আমাদের উপস্থিত করিয়া দিয়া বলিলেন—"কি কি জলখাবার চাই লিয়ে লিন্।"

জলাধিপটি বেশ স্থূলকায়,—অতিকায় বলিলেও অসঙ্গত হয় না। তিনি যেন শরীরের সুস্পষ্ট বিপুলতা প্রমাণ করিবার জন্য নিজের চতুর্দ্দিকে—বড়, ছোট, খুদে,—শিশি শিশিকা, এমন কি শিশির কণিকা অণুকা রেণুকা পর্য্যন্ত সাজাইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। ভাবিলাম—বাবাকে রোয় হয় গোলাপ জল ও সুগন্ধী আতর প্রভৃতি উৎসর্গ করিবার রীতি আছে। পরে শ্রীমানের নিকট শুনিলাম,—

ইনি গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী, ত্রিবেণী, সেতুবন্ধ, সাগর-সঙ্গম প্রভৃতি এবং কুম্ভাদি যোগের জল রাখেন। যাঁহার যে জল দিয়া বাবাকে স্নান করাইবার অভিলাষ, তিনি ইঁহার নিকট হইতে তাহা ক্রয় করিয়া লন,—ইত্যাদি।

আমি লোকটির দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—জলহস্তীরই ভাল নাম কি বরুণ!

দেখিলাম—গঙ্গা যমুনাদির জল ড্রাম পরিমাণ দিবার পর, শিশিকা হইতে রেণুকা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রাধারগুলির জল, ফোঁটা হিসাবে লোটায় পড়িয়া, প্রায় ছ'-আউন্স্ একটি অ্যালোপ্যাথিক্ মিক্শ্চারে দাঁড়াইল। আধার যত ছোট, তাহার মাল ততই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য বুঝিতে হইবে। এই জল-দেবতা এমন সব দুর্ল্লভ জিনিসও রাখেন, যাহাদের ড্রামের মূল্য কিং কোম্পানীর এক ড্রামের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহা কিন্তু অন্যায়ও নহে অন্যায্যও নহে; কারণ, ওই সব জল জাহাজেও আসে না, ল্যাবরেটরিতেও বনে না; গরীবেরা অধিকাংশ পথই পদব্রজে অতিক্রম করিয়া, সেতুবন্ধ, দ্বারকা, মানস সরোবর প্রভৃতি সুদূর দুর্গম তীর্থ হইতে অসীম শ্রমে বিপদ-সঙ্কুল পথে তাহা বহন করিয়া আনে। এই শ্রদ্ধার সামগ্রীর যথার্থ মূল্য আমরা দিতে পারি কি! পারি কেবল উপহাসের এক ফুৎকারে তাহাদের সৎকার করিতে।

দেখি—দূরাগত শত শত নিরক্ষর গরীব শ্রমিক—সেই জল কতটা শ্রদ্ধার সহিত কি আগ্রহেই লইতেছে! পয়সা কম পড়ায়, একজনকে কি কাতর বিনয়েই সেই লোকটির হাতে পায়ে ধরিয়া একবিন্দু নর্ম্মদার জল ভিক্ষা করিতে দেখিয়া, আমার উদ্গত কৌতূহলটা সহসা দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। সেই পবিত্র বারি লইয়া যেন কৃতার্থ হইয়া চরিতার্থতা-মাখা মুখে "জয় ঝাড়খণ্ডী বাবা" বলিতে বলিতে কি সরল বিশ্বাসেই তাহারা মন্দির মধ্যে ছুটিতেছে! আমার প্রাণ স্তব্ধ বিস্ময়ে, বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া, ব্যাকুল ভাবে দীন ভিক্ষুকের মত,—সেই বিশ্বাস ও সেই ভক্তির কণামাত্র চাহিতে চাহিতে, তাহাদের অনুসরণ করিল।

পথহারা অসহায়ের মত উদাস ভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—দয়াময়, তোমার কৃপা করিবার পথও অদ্ভুত! আমরা হিঁদুর নিয়ম পালন করিতে আসি মাত্র;—এ-বিসির বিষ-ই আমাদের হৃদয় হইতে, উহাদের ঐ আন্তরিক ব্যাকুলতা ও সহজ বিশ্বাসের স্বাদ, হরণ করিয়া, তথাকথিত জ্ঞানের অহঙ্কার দিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছে। "চরিত্র-হীনে" শরৎ বাবুর "কিরণময়ী" সুরবালার মুখে এই সংবাদই পাইয়াছিলেন, বোধ করি পরাজয়ও স্বীকার করিয়াছিলেন। আবার দেখিতেছি,—য়ুরোপের গর্ব্বিত ও মার্জ্জিত সভ্যতার সংস্রবে গত মহাযুদ্ধের নররক্তপিপাসী হিংস্র-লোলুপতার বীভৎস কথার উল্লেখ করিয়া ম্যাক্সিম্ গোর্কি (Maxim Gorki) বলিতেছেন— * * *
"Culture is in danger, the cultured nations are exhausted and are becoming primitive, and the victory remains on the side of Universal stupidity" * * *

মন্দির উদ্দেশে কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শ্রীমান এক নিশ্বাসে বলিলেন—"দেখবেন, যেন মাড়িয়ে ফেলবেন না,—এরা সব "হত্যা" দিয়ে পড়ে আছে।" চমকিয়া চাহিয়া দেখি,—সত্যই ত'—দশ-বারোজন স্ত্রী-পুরুষ মন্দিরের বাহিরে শীর্ণ নিস্পন্দ দেহে করযোড়ে পড়িয়া রহিয়াছে! ইহাতে হীনতার লজ্জা নাই, সভ্যতার সঙ্কোচ নাই, দাম্ভিকের দয়ার পীড়ন নাই, আছে কেবল অধিকারের আনন্দ। মাথাটা আপনা আপনি তাহাদের পায়ে নত হইল। গীতার ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য নিষ্কাম কর্ম্মের কথা—নিরাকার নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কেই বোধ হয় সম্ভব। মাটির পৃথিবীর সংসারী মানুষের কিন্তু দুঃখ-কষ্ট-বেদনা নিবেদন করিবার একটি 'আপন' স্থান চাই-ই চাই, তা না ত' সে বাঁচে না, তাহার শান্তি থাকে না, তাহার চলেই না। বাপ, মা, সমাজ, ডাক্তার, বৈদ্যে যখন কুলায় না, তখন সে দেবতার শরণ লয়,—তিনিই তাহাকে শান্তি দেন। সাধারণ মানুষের এইটিই "হাই-কোর্ট"। এখানে হার হইলে, তাহার দুঃখের তীব্রতা তাহার অজ্ঞাতেই হ্রাস হইয়া যায়। তখন সে শান্ত ভাবে বলে—"আমরা কতটুকুই বা বুঝি—দেবতা যা ভাল বুঝেছেন তাই করেচেন।" এ কি কম কথা! শ্রদ্ধেয় রবিবাবু—"ভারত কই" বলিয়া খুঁজিয়াছেন। বোধ হয়—এই সুদৃঢ় পাষাণভিত্তি আঁকড়িয়া, নিরন্ন দুর্ব্বল ভারত—রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া, পরম নির্ভরে পড়িয়া আছে।

বাবাকে দর্শনান্তে, এতদূর আসিবার সার্থকতা অনুভব করিতে করিতে মন্দির-বাহিরে পা দিয়াই, একটা ছোট-খাটো জনতা ও হৈচৈয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল,—একটা কোট্ ঝাড়াস্ করিয়া ভূমি স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তন্মধ্য হইতে ফড়াৎ করিয়া এক দৈত্য রঙ্গভূমে উদয় হইয়া, রক্ত-নেত্রে ফটাফট্ তাল ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল—"আও জিস্কা সাদ্দি হায়! পয়সা লুটকে বোট্‌কে-বোট্‌কে ভুঁড়ি বাগাবে আর গেঁড়া-মারকে পেঁড়া খাবে! সে-বান্দা হাম্‌কো পাওনি। ঠাকুর-দেবতা কারুকা বাবার জিনিস্ নেই হায় যে, পয়সা না দিলে দেখতে নেই দেগা;—এ কি একজিবিসনের তিন-পেয়ে বকরি হায়?" ইত্যাদি

সহসা দেখিয়া আমি তো "ভানুমতির খেল্" ভাবিয়াছিলাম! কোট্‌টাকে সজোরে আছাড় মারিয়া দূরে নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই এই দৈত্যোদ্ভব হওয়ায়—"অহিরাবণের জন্ম," বা রোষ-নিক্ষিপ্ত হর-জটা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তির অভিনয় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। এখন সে ভ্রম দূর হইল; বুঝিলাম—heroটি আন্দাজ বিশ বাইশ বৎসরের আর যোগেন্দ্রেকের, একটি বাঙ্গালী যুবক। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখি—রঙ্গভূমিটি পাণ্ডার বেড়া-জালে ঘেরা; তাহাদের সংখ্যা শতেকের কম হইবে না,—এক একটি জীবন্ত মুরদ;—কোনটির ওজন দু'মোণের নীচে নয়,—আড়াই মোণী মূর্ত্তিও আছেন! তাহাদের যে-কোন একজন আমাদের "হিরোকে" ছুঁড়িয়া প্রাচীরের ওপারে শিব-গঙ্গায় সমর্পণ করিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাহাদের অনেকেই এই যুবকের উন্মত্ত-উচ্ছ্বাস হাসিমুখে উপভোগ করিতেছিল। অল্পবয়স্কদের রক্ত এক একবার মুখচোখ পর্য্যন্ত দ্রুত ছুটিয়া গিয়া তখনি সরিয়া যাইতেছিল।

একজন ৬ ফুট×১॥০ ফুট বর্গ-বপুর গৌরবর্ণ প্রবীণ পাণ্ডাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রমাদ গণিলাম। তিনি কিন্তু ধীর অবিকৃত কণ্ঠে—"সাবাস্ বাবুজি—সাবাস্! আমরা কি আপনার সাথে পারে? আপনি ঠাণ্ডা হোন্ বাবুজি। আসেন হামার সঙ্গে—বাবাকে দর্শন করবেন," এই বলিতে বলিতে স্নেহস্পর্শে যুবাকে শান্ত করিয়া, তাহার ভূলুণ্ঠিত হোটের ধূলা ঝাড়িয়া, তাহাকে পরাইয়া বলিলেন—"চলেন, বাবাকে দর্শন ক'রে আসবেন। দেবস্থানে গোসা ক'রতে নেই বাবুজি—ভাব নষ্ট হ'য়ে যায়। পয়সা কোন্ চিজ্ আছে,—মানুষ তার বহুৎ বড়। আমরা লিখাপড়া জানি না, মূর্খ লোক—হামাদের ভাষা গোঁয়ারী, সে আপনাকে কড়া লাগে;—চলেন্ বাবুজি," বলিতে বলিতে তিনি যুবাকে শান্ত করিয়া লইয়া গেলেন। পাণ্ডার দল হাসি-মাখা চোখে যে-যার স্থানে চলিয়া গেল,—ভিড় ভাঙ্গিল।

শ্রীমান কাজের লোক, তিনি ইতিপূর্ব্বেই—বাজার হইয়া যাইতে হইবে বলিয়া রওনা হইয়া পড়িয়াছিলেন;—বাজার মানে বোধ হয় পোষ্ট আপিস্। জয়হরি প্রসাদের হাঁড়ি হাতে করিয়া একাই পাড়ি দিতেন,—কারণ তাহার নাড়ী বরাবরই কম্পাসের কাঁটার মত বাড়ীমুখোই ছিল; কিন্তু লাঠালাঠি সম্বন্ধে তাহার একটু স্বাভাবিক উৎসাহ থাকায় আটকা পড়ে! প্রারম্ভে একবার মাত্র বলিয়াছিল—"সাক্ষী দিতে হলে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে মশাই!" তাহার পর তাহার আর সাড়া পাই নাই। আসর ঠাণ্ডা হইয়া গেল দেখিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল—"ও আগেই বুঝেছিলুম,—মিছি মিছি লোকের কাজ নষ্ট করা বই তা নয়! সত্যিকার রক্ত দেখতে পাওয়া কি কম কথা মশাই, স্বপ্নেতে দেখতে পেলেও শুভ ফল, তা-ই জোটে না। আজকাল এক ডিসেণ্ট্রিই ভরসা;—চলুন।"

জয়হরির এই অভিনব "হতাশের আক্ষেপ" শুনিয়া হাসিও আসিল, বিচলিতও হইতে হইল। এখন এই রক্ত-প্রিয় জীবটিকে ভালয় ভালয় যথাস্থানে জমা দিতে পারিলে উভয়েরই মঙ্গল; সময়টাও সুবিধার নয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—কারণ চতুর্দ্দিকেই বারো-বারং।

মন্দিরের পশ্চাৎভাগে কম্পাউণ্ডের আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বার আছে। আমরা সেই দ্বার দিয়া বাহির হইবার সঙ্কল্প করায় পাণ্ডাঠাকুর পয়সা ভাঙ্গাইয়া এক-আধ আনার "পাই" সংগ্রহ করিয়া লইবার সদুপদেশ দিলেন;—কারণ বাহিরে ভিক্ষুকেরা বিরক্ত করিবে, তাহাদের একটা "পাই" দিলেই চলিবে।

কথাটা মন দিয়া শুনি নাই, পরে কথাটা রক্ষা করিতে গিয়া দেখি,—ইনি সরকারী চাকুরে মাত্রেরই চিরপরিচিত "তাঁবার তেরস্পর্শ" বা তাম্র-স্রাব! আধ পয়সাও নয়, সিকি পয়সাও নয়,—"তিকি পয়সা" অর্থাৎ তিনটিতে

এক পয়সা। হিসেব মেলানার আর ছেলে ভোলাবার কাজে লাগেন,—দাতার আর খাতার ধর্ম্ম রক্ষার্থেই এঁর জন্ম। এই তিন কর্ম্ম ছাড়া ইহার ব্যবহার খুঁজিয়া পাই নাই। প্রেমিকদের কাছে ইহার যত্ন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চয়ই আছে; সেটা কিন্তু আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার মাথায় বা কাজে কোন দিন আসে নাই; বোধ হয় আমার মত লক্ষ্মী-ছাড়ার সংখ্যাই বেশী! তাই মনে হয়, প্রতি মাসে এই প্রাপ্ত "পাই" (pie) গুলির অধিকাংশই নষ্ট হয়; টাকা হিসাবে তাহা নিতান্ত উপেক্ষনীয়ও নয়। অর্থনীতি জানা থাকিলে একটা দুর্ভাবনা জুটিত,—নারায়ণ রক্ষা করিয়াছেন।

স্মরণাতীত হইলেও, দিন কতক ইংরাজি ইস্কুলে গিয়াছিলাম। আদিত্য মাষ্টার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—"I by itself I" আমি শুনিয়াছিলাম বা বুঝিয়াছিলাম—"I by itself pie (পাই)," এবং সেই ধারণাই দু'তিন বৎসর কায়েম রাখি। কি সূত্রে তাহা ঠিক স্মরণ নাই, একদিন ভ্রমটা সুধরাইয়া যায়। এখন আবার সারাজীবনের অভিজ্ঞতা বা ভোগাভোগ লইয়া বুঝিয়াছি,—ও-ভুল না সুধরাইলে কোন ক্ষতি ছিল না,—ও 'আই' ও যা "পাই"ও তাই; থাকিলেও যা, না থাকিলেও তাই, বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

যাহা হউক, এতকাল পরে—এখানে তাহা কাজে লাগে শুনিয়া—দম্‌কা দু'আনার ভাঙ্গাইয়া লইলাম। পরে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া—অসদ্ব্যবহারের মতই ঠেকিল। সেগুলা তিন চার জনকে দিয়াই শেষ করিয়া যেন স্বস্তি বোধ করিলাম। বুঝিলাম, বিক্রেতা পয়সায় তিনটি করিয়া যাত্রীদের দেন, এবং পয়সায় চার পাঁচটি করিয়া ভিক্ষুকদের কাছে খরিদ করেন। মন্দের ভাল বলিতে হয় বলুন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

রাজর্ষি রামমোহনের রচনা-রীতি

শ্রীশিবরতন মিত্র

সাহিত্যের আলোচনায় দুইটি জিনিসের আলোচনা করিতে হইবে। ইংরাজীতে বলে—manner ও matter। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ—'শব্দালঙ্কার' ও 'অর্থালঙ্কার'—এই দুই বিভাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, তাঁহারা রচনা-রীতি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। যেমন—গৌড়ীয় রীতি, মাগধী রীতি, বৈদর্ভী রীতি।

রচনা-রীতির আলোচনা খুব দরকার। কারণ শব্দ ও অর্থ—এই উভয়ের একটি মিলন-ভূমি আছে। রীতি—সেই মিলন-ভূমি। রচনার রীতি বা style, লেখকের মানসিক প্রকৃতির প্রতিবিম্ব—Expression of the individual mental Nature. ইহাই রীতি-সম্বন্ধে শেষ কথা। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ ঠিক এই-ভাবে রচনা-রীতির আলোচনা করিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রচলিত গ্রন্থসমূহে রচনা-রীতি সম্বন্ধে এ প্রকারের আলোচনা নাই। তবে, অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে সুপ্রাচীন অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সেই সমুদায় গ্রন্থ, বিশেষতঃ বৌদ্ধ-যুগের কোন গ্রন্থ পাওয়া গেলে, এই প্রকারের আলোচনার চেষ্টা দেখা যাইতে পারে।

প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনেক ভাল গ্রন্থ যে পাওয়া যায় না, এবং পরবর্ত্তী কালের আলঙ্কারিকগণ অনেক বিষয়ে প্রাচীনতর আলঙ্কারিকগণের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। অনেকেই জানেন, সুধী শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে D. Litt., P. R. S. মহাশয় 'বক্রোক্তি জীবিত' নামক প্রাচীন অলঙ্কার-গ্রন্থ, বার্লিন লাইব্রেরী হইতে নকল করাইয়া আনাইয়া, সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থখানি হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সাহিত্য-দর্পণকার ঐ প্রাচীন গ্রন্থের প্রতি সুবিচার করেন নাই—বরং অবিচারই করিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রাচীন অলঙ্কার-গ্রন্থে রচনা-রীতিকে লেখকের মানসিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রতিবিম্বরূপে আলোচনা করার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, এই চেষ্টা বিশেষ ভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রকারে রচনা-রীতির আলোচনা করিতে হইলে, আলোচনাকারীকে সাধনা করিতে হইবে—অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া, মনস্তত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম, গূঢ় ও জটিল ব্যাপার আয়ত্ত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী মনোবিজ্ঞানের (Practical Psychology) আলোচনা-আবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে যে সমুদায় রচনা-রীতি চলিতেছে, তাহার কোনটিই এক দিনেই গড়িয়া উঠে নাই। অনেক সময়ে রচনা-রীতি লইয়া বাদানুবাদ হয়। বাদানুবাদ হওয়া ভাল; কিন্তু, এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে, নানা প্রকারের রীতি বা মূর্ত্তি থাকাই স্বাভাবিক। প্রত্যেক লেখকই একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের রচনা-রীতি অভ্যাস করিবেন—ইহা হইতেই পারে না। সাহিত্য-রচনার এই যে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, ইহার কোনটিই এক দিনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রত্যেকটিরই ইতিহাস আছে। প্রত্যেকটিই ক্রমে ক্রমে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং এখনও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিকশিত হইতেছে। আবার, দুই বা ততোধিক প্রকারের মূর্ত্তি মিশিয়া, একটি নূতন মূর্ত্তিতে বা রীতিতে পরিণতি লাভ করিতেছে। রচনা-রীতির ক্রম-বিকাশের এই ইতিহাস ধীর ভাবে আলোচনা করিতে হইবে এবং এই আলোচনায় খ্যাতনামা লেখকগণের মানসিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্য-সাধনার এই একটি বৃহৎ কার্য্য। বিশেষতঃ, বাঙ্গালা সাহিত্য যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উন্নততম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, তখন এই প্রকারের আলোচনা বিশেষ ভাবে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক।

'রচনা-ভঙ্গী' বা রচনা-রীতি (style), শব্দ বা পদবিন্যাসের একটি কৃত্রিম বিধান মাত্র নহে। কোন বিশিষ্ট লেখকের রচনা-রীতির আলোচনায়, শব্দের ব্যাকরণ-শুদ্ধির বা অলঙ্কারাদির বিশুদ্ধতার হিসাব করিলে চলিবে না। এই হিসাবের প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্তু উহা গৌণ। সাহিত্যের রচনা-রীতি, তাহার সমগ্রতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, লেখকের মানসিক প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং, রচনা-রীতির উন্নততর ও গভীরতর আলোচনা আবশ্যক।

'একজন প্রতীচ্য পণ্ডিত এই রচনা-রীতিকে Organology of Writing বলিয়াছেন। ভিতরের প্রয়োজনের তাড়নায় বা বাহ্য প্রকৃতির সহিত নিত্য-সমুত্থিত সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক প্রেরণায়, জীব-জীবনে নব নব কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য, প্রাকৃতিক নিষ্ঠাবলে গড়িয়া উঠে। ইহাই অভিব্যক্তিবাদের মত। কোন কোন জীব-জীবনের কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে, সেই জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। কোন সাহিত্যের রচনা-রীতির পরম্পর্য্য বা ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলে, আমরা বাহিরের দিকে যেমন শব্দ বিজ্ঞানের ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের কতকগুলি সঙ্কেত বা সন্ধান পাই, তেমনি ভিতরের দিকে সেই সাহিত্য যে জাতির, সেই জাতির মানস-জীবনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের পরিচয় পাই। অতএব রচনা-রীতি সম্যক্-রূপে বুঝিতে হইলে, লেখকের ভাব ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, তাঁহার মানসিক প্রকৃতির স্থায়ী সুর এবং সেই স্থায়ী ভাবের উপর নানারূপ সঞ্চারী ভাবের বিলাস-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। মানস-ক্ষেত্রে নব নব চিন্তার তরঙ্গ জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, শব্দের সাহায্যে তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, মানসিক জীবনের উপর আবার ক্রিয়া করিতেছে—বাহিরের সহিত ভিতরের এই প্রকারের আদান-প্রদান ও ঘাত-প্রতিঘাত, রচনা-রীতির মধ্যে পরিব্যক্ত হয়। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অনুভব-শক্তির অনুশীলন ব্যতিরেকে রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা অসম্ভব।'

লেখকের মানসিক প্রকৃতি ও তাঁহার রচনা-রীতি, এতদুভয়ের মধ্যে অতিশয় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। তাহা বুঝিতে হইলে, রাজা রামমোহন রায়ের মানসিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায়ের মানসিক জীবনের অনেক কথাই অতিশয় রহস্যময়। সমুদায় কথা এখনও বুঝিতে পারা যায় না। তিনি হিন্দুর সহিত বিচার করিবার সময় হিন্দুর শাস্ত্র-সমূহ স্বীকার করিয়া তাহা হইতে বচন উদ্ধার করিতেন এবং বিরোধী বচন-সমূহের মীমাংসা কোথায়, তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, তিনি হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন। মুসলমান-শাস্ত্রেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল এবং মুসলমান শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া বিরোধী বচন-সমূহের মীমাংসা করিতেন। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ও মীমাংসা-সামর্থ্য ছিল।

এখন এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে—তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিলেন? তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। আবার গায়ত্রীর দ্বারাও ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। পৃথিবীতে প্রাচীন কাল হইতে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাদের সকলের একটি সাধারণ উদ্ভব-ভূমি বা মিলন-ভূমি আছে। তাহা কি,—বুঝাইয়া বলা কঠিন। যাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা তাহা অনুভব করেন এবং সেই ভূমি হইতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিতে পারেন। যে প্রকারেই হউক, রাজা রামমোহন রায় সেই ভূমি অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

স্বর্গীয় কিশোরী চাঁদ মিত্র প্রমুখ কোন কোন মনীষী রাজা রামমোহন রায়কে Religious Benthamite বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বেন্থামের মতে, ধর্ম্ম-সমূহের মূলে কোন সত্যোপেত আধ্যাত্মিক প্রেরণা নাই। রাজা রামমোহন রায় যদি সেই মতের লোক হইতেন, তাহা হইলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া 'একেশ্বরবাদিগণের সভা' স্থাপন করিতেন না। যদি কেহ বলেন, এই উপাসনা প্রবর্ত্তন ও সভা স্থাপন utility বা হিতবাদের অনুবর্ত্তনে করা হইয়াছিল, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে, রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা গানগুলির আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। এই গানগুলি, ভারতবর্ষের সাধক-সঙ্গীতসমূহের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনীয়। ইহাতে বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, পরকাল, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ, প্রভৃতির কথা আছে। সুতরাং, হিতবাদ বা utility, রাজার জীবনে মূল প্রেরণা ছিল না।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজা রামমোহন রায়

একটি রহস্য। রাজা রামমোহন সম্বন্ধে আমাদের দেশে এখনও উপযুক্ত আলোচনা হয় নাই। প্রায় এক শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, দেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অসংখ্য জ্ঞান-প্রচার-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যা-প্রচারের জন্য অর্থব্যয়ও হইতেছে। তথাপি, উপযুক্ত মনীষিগণের দ্বারা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিবার সুব্যবস্থা যে এখনও হয় নাই, ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়।

এইবার রাজার রচনা রীতি সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিতেছি। রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী ও বাঙ্গলা গদ্য-রচনার রীতির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী রচনাতেও যশস্বী হইয়াছেন—কিন্তু, তাঁহার বাঙ্গালা ও ইংরাজী রচনা একই রূপ। রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাহাই। রাজা রামমোহন রায়ের এই উভয় ভাষায় রচনা-রীতির মধ্যে এত প্রভেদ কেন? যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, ভাল বা উচ্চাঙ্গের ইংরাজী সাহিত্য যাহারা পড়েন নাই, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা রচনা সম্যকরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন কি না সন্দেহ। অবশ্য, যাবতীয় রচনা এক শ্রেণীর নহে।

রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনার গতি, সাধারণতঃ সরল ও স্বচ্ছন্দ নহে। যে সমুদায় রচনায় তিনি বিচার ও বিতর্ক করিয়াছেন, সেগুলি ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করা এখনকার দিনে অনেকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, রাজা যে সরল ও স্বচ্ছন্দ রচনা করিতে পারিতেন না, তাহাও নহে। 'সংবাদ কৌমুদী' কাগজে বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বেশ সরল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় লিখিত।

রাজা রামমোহন রায়, মানুষকে উত্তেজিত করিয়া কোন সিদ্ধান্ত বিশেষে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি অতিশয় ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বতোমুখী। তিনি, সকলের প্রতি সুবিচার করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। প্রতিপক্ষকে অকৃত্রিম ও গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মানুষের উপর, তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মানবজাতির অতীতের সাধনা যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী—ইহা তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়াছেন। তর্ক-বিতর্কের সময় তিনি প্রতিপক্ষকে যে উপহাস করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু সেই উপহাসের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক উষ্ণতা খুব বেশী ছিল এবং তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি অশোভন ভাষা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় অনেক উপরের লোক।

যে সব লেখকের মানসিক উষ্ণতা ও উগ্রতা বেশী, তাঁহারা বিহ্বল ভাবে একটি বিশেষ মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সবেগে ধাবমান হইয়া থাকেন। সেই মতের বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে, তাহা ভাল করিয়া ধীরভাবে তাঁহারা বুঝিয়া দেখিতে পারেন না। এই শ্রেণীর লেখকগণের ভাষার গতি স্বভাবতঃ স্বচ্ছন্দ ও সরল হইয়া থাকে। রাজা রামমোহন রায়ের রচনায় এই প্রকার স্বচ্ছন্দ ও প্রবাহময় ভাষা নাই। চিন্তার প্রত্যেক পদক্ষেপে, তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অপর পক্ষে কি বলা যাইতে বা ভাবা যাইতে পারে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিতেন, এবং তাহাদের মর্ম্ম অবধারণ করিয়া, তাহাদের প্রতি সুবিচার করিয়া, ধীর ও মন্থরগতিতে বহু প্রকারের চিন্তা ও মতবাদ পরিপূর্ণ পথহীন অরণ্যের মধ্য দিয়া, নিজের চিন্তার রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেন। এই কারণে চিন্তার গতি হঠাৎ থামিয়া যাইত, সদাই বক্র ও বন্ধুর পথে আলোড়িত হইত। তিনি একটি প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘকাল সেই নূতন প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিতেন। এই নূতন প্রসঙ্গের অবতারণাই বা কেন হইল, আর ইহার আলোচনা দ্বারা মূল প্রসঙ্গের পুষ্টি বা কিরূপে হইল, সাধারণ পাঠক অনেক সময়ে তাহা ধরিতে পারেন না। রাজা রামমোহন রায়কে যাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের সংস্কার ও মানসিক প্রকৃতি, বর্ত্তমান সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত পাঠকগণের হিত একরূপ নহে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিপক্ষগণের চিন্তা করিবার ও বিচার করিবার প্রণালী যদি আমাদের জানা থাকিত, তাহা হইলে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থগুলির যথার্থ মূল্য আমরা অবধারণ করিতে পারিতাম। নবদ্বীপ বা ভাটপাড়ার টোলে বালককাল হইতে লেখাপড়া শিখিয়া যিনি কাব্য ও দর্শনে পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাল দর্শন-শাস্ত্রের এম্-এ উপাধিধারীকে, যদি বন্ধুভাবে তর্ক করিতে নামাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, এই দুইজনের ভিতর মানসিক প্রকৃতির, অর্থাৎ চিন্তা করিবার, অনুভব করিবার ও বিচার করিবার রীতির প্রভেদ যে কত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারের মানস-প্রকৃতির তুলন'-মূলক আলোচনা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। সেকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মানস-প্রকৃতি বা mentality যাঁহারা বোঝেন, তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-নীতির রহস্য বুঝিতে পারিবেন।

রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার চিন্তার রথ, কুটিল ও বন্ধুর-পথে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। পাঠক যদি ধৈর্য্যের সহিত, তাঁহার চিন্তার গতি অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে, কিছুক্ষণ ক্লান্তভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে, হঠাৎ অপেক্ষাকৃত ঋজু পথে আসিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিবেন। ভাষার এই জটিল ও বঙ্কিম গতি রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে যে স্বাভাবিক, তাহা তাঁহার মানসিক চরিত্র হৃদয়ঙ্গম না করিলে, অনুভূত হইবে না।

অবশ্য ইহাও বলা আবশ্যক যে, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলা সাহিত্যের একপ্রকার প্রথম গদ্য লেখক। কেমন করিয়া গদ্য পড়িতে হয়, তাহা পাঠককে শিখাইয়া লইয়া,তাঁহাকে গদ্য লিখিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বদেশের ও পশ্চিমদেশের চিন্তা-প্রণালীর প্রথম সংঘর্ষ, রাজা

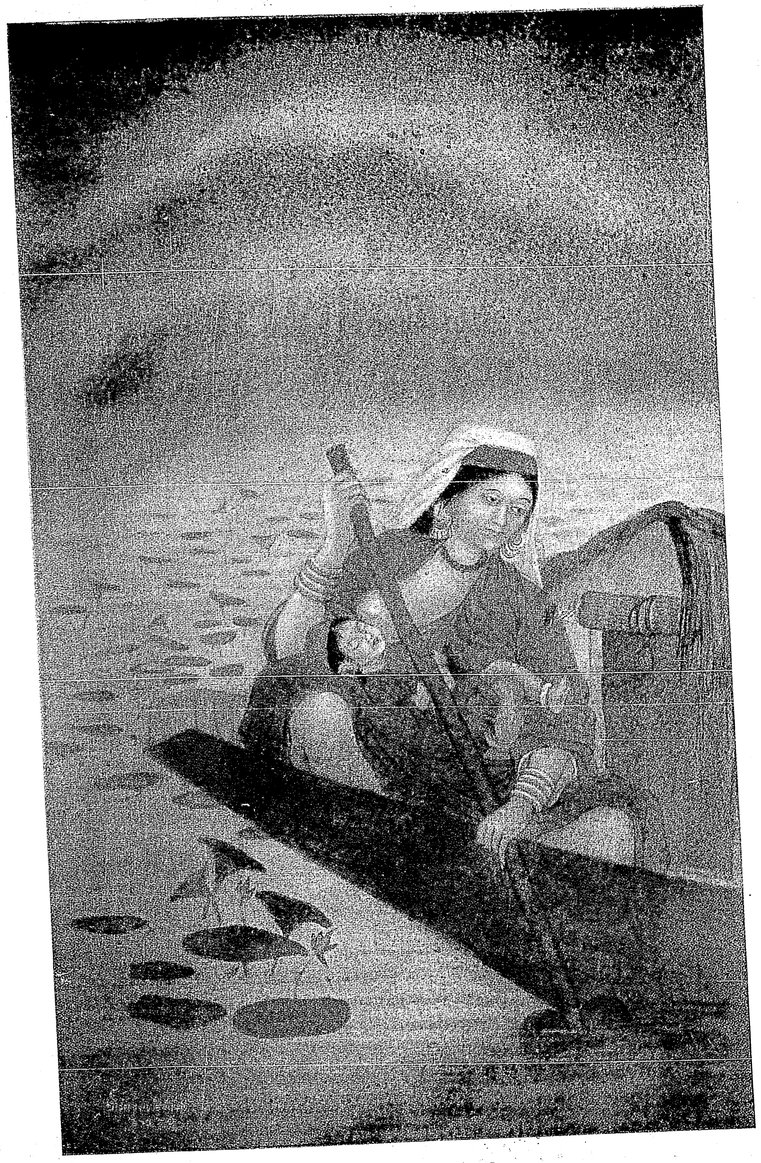

কাশ্মীর-ডালহ্রদে মাঝিয়াল

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

রামমোহন রায়ের মানসিক জীবনে ক্রিয়া করিয়াছিল এবং তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার বলে, ইহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া তাহার চিত্তির উপর এতদুভয়ের অপেক্ষা এক বৃহত্তর ও মহত্তর সাধনার সুবর্ণ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-বিরোধের জন্যই বোধ হয়, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন ভাবে তেমন আলোচনা হয় নাই। আজ আর বিরোধ নাই—কাহারও চিত্তে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই—আজ মহ-মিলনের মহা-মহোৎসব। এই শুভ সময়ে, রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে সাহিত্য-সম্মেলন অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই শুভ দিন হইতে আমাদের বাঙ্গালী জাতি, ও ভারতবর্ষ, রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্মৃতির প্রতি, তাঁহাদের যাহা সঙ্গত ঋণ, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য উদ্যোগী হইবেন! *

ছানি (Cataract)

শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোষ এম-বি

ছানি কি?—চক্ষের মধ্যে একটী দুইদিক চেপ্টা অথচ গোলাকার স্বচ্ছ পদার্থ আছে, ইহাকে লেন্স (Crystalline Lens) বা পরকলা বলে। আলোক কোন পদার্থ হইতে প্রতিফলিত হইয়া উক্ত পরকলার মধ্য দিয়া চক্ষের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুর (Retina) উপর পতিত হইলে, তবে ত আমরা সেই পদার্থকে দেখিতে পাই। যদি কোনও কারণে উক্ত গোলাকার পরকলার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়, তবে চক্ষের ভিতর আলোক প্রবেশের বাধা জন্মে; এবং যে পরিমাণে আলোক প্রবেশের বাধা জন্মে, দৃষ্টি শক্তিরও সেই পরিমাণে হ্রাস হয়। এইরূপে উক্ত পরকলা বা লেন্সের স্বচ্ছতা নষ্ট হইলে, তাহাকে ছানি পড়া বলে; ছানির সংস্কৃত নাম 'তিমির' বা লিঙ্গনাশ; এবং ইউনানী নাম 'নাখোনা'।

আমাদের আজ উক্ত লেন্সের কথা লইয়াই কায; কাযেই উহাকে ভাল করিয়া বুঝা উচিত। আমের যেরূপ মাঝখানে আঁটী, তাহার বাহিরে শাঁস ও সকলের বাহিরে খোসা থাকে, লেন্সেরও সেইরূপ মাঝখানে যেটী থাকে তাহাকে Neucleus (নিউক্লিয়াস্) বা কোরক কহে; তাহার চতুর্দ্দিকে শাঁসের মত cortex (কর্টেক্স) আছে; এবং সকলের বাহিরে capsule (ক্যাপস্থল) বা আবরক থাকে। কচি আমের যেরূপ আঁটী থাকে না, অল্প বয়সে লেন্সেরও সেইরূপ 'কোরক' থাকে না; যেহেতু, এই 'কোরক' মানুষের পঁচিশ বৎসর বয়সে আরম্ভ হয়।

ছানির কারণ কি? নানা কারণে চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে। ছানি পড়িবার কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই; অর্থাৎ সকল বয়সেরই লোকের চক্ষে ছানি পড়িতে পারে। কোন কোন শিশু দুই চক্ষে ছানি লইয়া জন্মিয়া থাকে (congenital cataract)। কাহারও কাহারও আবার দুই বা তিন বৎসর বয়স হইতেই চক্ষে ছানি পড়িতে আরম্ভ হয়। তবে অধিকাংশ স্থলে একটু বেশী বয়সেই (৫০।৬০) ছানি আরম্ভ হয় (Senile Cataract)। আবার চক্ষে কোন প্রকার আঘাত লাগিলেও ছানি পড়িতে পারে (Traumatic cataract)। সুতরাং ছানি সকল বয়সেই হওয়া সম্ভব।

কোন কোন বালক বালিকার চক্ষে ছানি অল্প বিস্তর হইয়া বন্ধ থাকে—আর বাড়েও না, কমেও না (Incomplete cataract)। যে সকল ছানিতে Neucleus বা 'কোরক' থাকে না, অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যে ছানি পড়ে, তাহাকে 'নরম ছানি' (Soft Cat.) এবং পঁচিশের অধিক বয়সের ছানিকে 'কঠিন ছানি' (Hard Cat.) বলে। 'নরম ছানিকে' চলিত কথায় 'জল ছানি'ও বলা হইয়া থাকে।

পূয়াতন ব্যাধি ও শ্রমসাধ্য ব্যবসার ফল—কখন কখন চক্ষের অন্য প্রকার অসুখের ফলেও পরোক্ষে চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে (Secondary Cat.) যাঁহাদের প্রস্রাবের অসুখ প্রভৃতি শরীর ক্ষয়কারী অসুখ থাকে তাঁহাদের চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে। যাহারা কাচ প্রভৃতি গলাইয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে, তাহাদেরও চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে।

ছানি পাকিবার সময়—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ছানি পাকিতে অর্থাৎ দৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময় লাগিয়া থাকে। কাহারও ছানি পাকিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় (৫।৭ বৎসর), আবার কাহারও কাহারও শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া যায় (৬ মাস হইতে ১ বৎসর)। আঘাতজনিত ছানি ১০।১৫ দিনের মধ্যেই পাকিয়া যায়।

ছানি ধরা যায় কেমন করিয়া?—অধিক বয়সে কাহারও কাহারও লেন্সের রং বদলাইয়া যায় (Sclerosis of Lens) এবং সেই সঙ্গে সেই ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তিও কমিয়া যায়। ঐ ব্যক্তির চক্ষু বাহ্যতঃ ছানির ন্যায় দেখাইলেও, উহা যে প্রকৃত ছানি নহে, তাহা উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে প্রমাণিত হয়। এমন কি, প্রকৃত ছানির অপরিপক্ক অবস্থায় রোগীকে অন্ধকার ঘরে লইয়া যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা না করিলে, প্রকৃত ছানি হইয়াছে কি না বলা যায় না এবং বলা নিরাপদও নহে।

কালো রংয়ের একপ্রকার ছানি পড়ে (Black Cataract)—তাহাকেও যন্ত্র সাহায্য ব্যতীত নির্ণয় করা যায় না। এই কৃষ্ণ ছানি পাকিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া থাকে। অস্ত্র প্রয়োগে ইহাতে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায় না।

সাধারণের ভ্রমাত্মক ধারণা—সাধারণ লোকের মনে একটী বিশ্বাস আছে যে, চক্ষে দেখিতে না পাইলেই বুঝিতে হইবে, চক্ষে ছানি পড়িয়াছে; কিন্তু এ ধারণা যেরূপ ভ্রমাত্মক সেইরূপ বিপজ্জনক; কারণ, চক্ষের এরূপ অনেক প্রকার অসুখ আছে, যাহাতে দৃষ্টিশক্তি ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে এবং পরে চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া যায়। এরূপ অসুখ হইলে, যত শীঘ্র বিচক্ষণ চক্ষু চিকিৎসককে তাহা দেখান

* রাধানগরের সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

যায়, রোগীর পক্ষে ততই মঙ্গল ; কেন না, পরে আর কোন উপায় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। এই সকল অহিতের মধ্যে কতকগুলিতে চক্ষু লাল হয়, জল পড়ে এবং চক্ষে ও মস্তকে যন্ত্রণা হয়। আবার কতকগুলিতে বাহ্যলক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হয় না, অথচ ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিশক্তি কমিতে থাকে। রোগী নিজে মনে করে, এবং অপরে অজ্ঞতা-প্রযুক্ত তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকে যে, "চক্ষে ছানি পড়িয়াছে, কিছুদিন পরে পাকিবে, তখন অস্ত্র করিলেই সারিয়া যাইবে এবং চক্ষে পুনরায় দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে।" কিন্তু হায়, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি আর এজন্মে ফিরিয়া আসে না। কত হতভাগ্য যে এইরূপে চিরদিনের নিমিত্ত অন্ধ হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব চক্ষের দৃষ্টি কমিতে আরম্ভ হইলেই, অথবা কোন প্রকার অসুখ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলেই, তৎক্ষণাৎ কোন বহুদর্শী চক্ষু-চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ছানির প্রতিকার—কখন কখন ছানি আপনা-আপনি পাকিতে দেখা যায় ; কিন্তু তাহা এত অল্প যে, 'ছানি স্বতঃ সারে না' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চক্ষে প্রকৃত ছানি পড়িলে, তাহা সারাইবার নিমিত্ত চক্ষে পদ্মমধু প্রভৃতি কোন প্রকার ঔষধের প্রয়োগ করা একেবারেই ভস্মে ঘি ঢালার মত অনর্থক ; কারণ, কোন প্রকার সেবনীয় বা লেপনীয় ঔষধেই ছানি সারে না। অস্ত্র চিকিৎসাই ইহার একমাত্র ব্যবস্থা এবং অস্ত্র না করিলে ইহা কখনই আরাম হয় না। আঘাত জনিত ছানি অল্প বয়সে হইলে আপনা আপনি সারিতে পারে।

আমাদের দেশে এক জাতীয় চক্ষু-চিকিৎসক আছে, তাহাদিগকে 'মাল বৈদ্য' বলে। ইহারা অন্য সময়ে জমি চাষ আবাদ করিয়া থাকে, কিন্তু শীত পড়িলে ছানি কাটিতে বাহির হয়। সাবধানে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের হস্তে শতকরা প্রায় ৯০টী চক্ষু চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যায়। ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ছানি "কাটে না"। একটী ময়লা সরু লম্বা শলাকা চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাকেই ঘুরাইতে থাকে। এই স্থূল প্রক্রিয়ার ফলে সেই শলাকার সূক্ষ্ম অগ্রভাগে লাগিয়া লেন্সের আবরক ঝিঁড়িয়া যায় এবং লেন্সটী স্থানচ্যুত হইয়া চক্ষের ভিতরেই পতিত হয়। ছানির কারণ-ভূত স্বচ্ছ লেন্সটী দৃষ্টি-পথ হইতে অপসারিত হওয়ার ফলে তখনকার মত রোগীর চক্ষে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে ; কিন্তু সে দৃষ্টিশক্তি প্রায়ই অধিক দিন স্থায়ী হয় না। কারণ লেন্সটী চক্ষের ভিতরে পড়িয়া যাওয়ার ফলে চক্ষে প্রদাহ উপস্থিত হয়। মাল বৈদ্যেরা অতি নোংরা। তাহারা চক্ষু, শলাকা অথবা তাহাদের হস্তাদি কিছুই শোধন (sterilise) করিয়া লয় না, শোধন করিতে জানে না, কিংবা শোধন করিবার আবশ্যকতাও তাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এই সকল কারণে উক্ত প্রদাহ প্রায়ই কয়েক দিনের মধ্যে অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া রোগীকে মৃত্যু তুল্য যন্ত্রণা প্রদান করে ; এবং কিছুদিন পরে চক্ষের জ্যোতিঃ একেবারেই নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। 'মালেরা' প্রকৃতই কোনও জ্ঞানের বা অভিজ্ঞতার দাবী রাখে না—কাযেই তাহারা রোগ নির্ণয় করিতেও পারে না। কোন কারণে চক্ষের দৃষ্টি নষ্ট হইলেই তাহারা ধরিয়া লয় যে, শয়গত ব্যক্তির চক্ষে ছানি পড়িয়াছে ; এবং এই অজুহাতে তাহারা সেই রোগীর চক্ষে শলাকা প্রবেশ করাইয়া দেয়।

মাছির বাচ্ছা দেখাইয়া যেমন বেদিয়ারা "দাঁতের পোকা" বাহির করা দেখায়, সেইরূপ মালবৈদ্যেরাও রোগী ও তাহার আত্মীয়-স্বজনকে প্রতারিত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত পশমীর অস্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার কর্ত্তিত অংশের একটী লইয়া, অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে কৌশল করিয়া সকলের নিকট ছানি বলিয়া জাহির করে। উক্ত মালেরা কখনও অধিক দিনএক গ্রামে থাকে না ; কারণ, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত, এমন কি সময়ে সময়ে প্রহৃত হইতেও দেখা যায়।

পূর্ব্বে ইয়োরোপেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে সমাজের নিম্নস্তরের অশিক্ষিত ও অপরিচ্ছন্ন লোকেরাই এই কার্য্য করিয়া থাকে ; কিন্তু ইয়োরোপে শিক্ষিত ও সভ্য সম্প্রদায়ের লোকের হস্তে ইহার ফল অপেক্ষাকৃত ভাল হইত।

আজকাল বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে। এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুসারে অস্ত্র প্রয়োগের উপর ক্রমশঃ লোকের বিশ্বাস জন্মিতেছে। ইহাতে শতকরা ২।৩টীর অধিক চক্ষু নষ্ট হয় না, এবং রোগীকেও কোন প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

দেরী করার অপকারিতা—ছানি পাকিলে তাহা শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্র করানই উচিত ; কারণ, পাকা ছানি বেশী দিন চক্ষে থাকিলে অন্য অনেক প্রকার চক্ষু-রোগের সৃষ্টি করে। তখন চক্ষে অস্ত্র করাও বিপজ্জনক এবং করিলেও দৃষ্টি শক্তি ভাল হয় না। বহুকাল ছানি পাকিয়া থাকিলে দৃষ্টিশক্তির ততকাল অব্যবহার-জনিত চক্ষের আভ্যন্তরিক দৃষ্টি-মূলক স্নায়ু নষ্ট হইতে পারে। তখন অস্ত্র করিলেও আর দৃষ্টিলাভ হয় না। সেই নিমিত্ত যে সকল বালক বালিকার জন্মাবধি ছানি থাকে, তাহাদের জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অস্ত্র করান উচিত ; নতুবা তাহাদের চক্ষের স্নায়ু পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না, এবং ভবিষ্যতে দৃষ্টিও শক্তি ভাল হয় না।

অনেকে মনে করেন যে, শীতকালে চক্ষে অস্ত্র করান বা চক্ষু চিকিৎসা করান উচিত ; অন্য সময় করিলে চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জ্বর চিকিৎসা যদি বার মাস হইতে পারে, তবে চক্ষু চিকিৎসাই বা হইবে না কেন ? তবে অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে, চক্ষে অস্ত্র করিলে দুই, তিন দিন, কখন কখন বা চারিদিন স্থির ভাবে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। সে সময়ে নড়া চড়া, এমন কি জোরে কথা কহাও নিষিদ্ধ। গ্রীষ্মকালে ২।৩ দিন এইরূপ স্থির ভাবে পড়িয়া থাকা বড়ই কষ্টকর বলিয়াই বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন বড় চক্ষু-হাসপাতালে যাইলেই এই কথার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

কখন কখনও ছানি কাটাইয়াও দৃষ্টিশক্তি ফিরে না কেন ?—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছানি পড়িলে চক্ষের অভ্যন্তরে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। এই কারণেই ছানি পড়া অবস্থায় চক্ষের অভ্যন্তর ভাগ ভালরূপে পরীক্ষা করা যায় না। সুতরাং ছানি পড়া ব্যতীত অপর কোনও আভ্যন্তরীণ রোগ নির্ণয় করাও যায় না, এবং অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে রোগীকে জানানও যায় না। কাজে কাজেই যে সমস্ত চক্ষুরোগে দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায় বা নষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে কোনও একটী বদি ছানি পড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে হইয়া থাকে, তাহা হইলে অস্ত্র করিয়া ছানি বাহির করিয়া ফেলিলেও বিশেষ দৃষ্টিশক্তি লাভ হয় না। উপদংশ বা গর্ম্মি রোগই অধিকাংশ স্থলে এই সমস্ত চক্ষু রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত রোগীর সকল রোগেরই পূর্ব্বাপর ইতিহাস গ্রহণ করিয়া অস্ত্র প্রয়োগের পর কিরূপ দৃষ্টি লাভ হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ; নচেৎ রোগীকে বৃথা অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয় এবং চিকিৎসকেরও দুর্নাম হওয়া সম্ভব। রোগী পূর্ব্বে কোন প্রকার চশমা ব্যবহার করিত কি না, তাহাও জানা আবশ্যক।

ছানি কাটিবার পর চশমা না লইলে চক্ষে ভাল দৃষ্টিলাভ হইতে পারে না। দূরে ও নিকটে দেখিবার জন্য স্বতন্ত্র দুই খানি চশমা ব্যবহার করিতে হয়। এই চশমা সাধারণতঃ অস্ত্র প্রয়োগের দুই মাস কাল পরে দেওয়া হইয়া থাকে।

সোণার তরী

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কবি যখন সোণার তরীর দৃশ্যটি দেখিয়াছিলেন, তখন তিনি কবিতাটি লেখেন নাই। তিনি তখন পদ্মার ওপর নৌকায় ছিলেন। সে সময় সকালবেলা নয়, তখন বিকাল হইয়া আসিয়াছে—মেঘের ছায়ায় চারিদিক ম্লান হইয়া গিয়াছে। পদ্মার নির্জ্জন তীর জনশূন্য। সেই শূন্য নদীর তীরে কবি একাকী তাঁহার দিনগুলিকে কাগজের নৌকার মত একটি একটি করিয়া ভাসাইয়া দিতেছিলেন। দূরে বনের সবুজ রেখা দেখা যাইতেছে, বনের কোলে গাছের ঘন ছায়া পড়িয়াছে, আর তাহারি মাথায় মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। ভাদ্রমাস। চাষারা ছোট ছোট ডিঙিতে কাঁচা ধান কাটিয়া বোঝাই করিয়া লইয়া পদ্মার ওপর দিয়া চলিয়াছে। চারিদিকের সমস্ত দৃশ্যগুলি সেদিনটিকে ভারি বিষাদের করিয়া তুলিয়াছিল। পদ্মার বান আর বর্ষার ধানকে থাকিবার অবসর দিল না। চাষারা সেই কাঁচা ধানই কাটিয়া লইয়া চলিয়াছে। ইহার মধ্যে কবি মানুষের গভীর বেদনাটিকে অনুভব করিলেন। তিনি একান্ত মনে ইচ্ছা করিলেন, "আহা, বৃষ্টি থামিয়া যাক, পদ্মার জল ধানের ক্ষেতগুলিকে আর যেন গ্রাস না করে ; মানুষের সারা বছরের কত দুঃখের ধান পরিপক্ক হোক্। সফল হোক্ তাহাদের এত দিনের পরিশ্রম। পদ্মার জল যতই বাড়িয়া চলিয়াছে, ততই ধানের ক্ষেতগুলি ডুবিতে ডুবিতে চরের রেখা মিলাইয়া আসিতেছে। চাষারা এই সময়ের ধানকে "জলিজষ্টর" ধান বলে। কবি সেদিন বিকালে এই যে দৃশ্যটি দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুঃখ ও সৌন্দর্য্য দুই যেন মিশাইয়া ছিল। পদ্মার জলধারা নিবিড় মেঘের ছায়ার তলা দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—ওপারের সবুজ বনের রেখা, ধানের ক্ষেত এই সমস্ত ছবি কবির মনকে সেদিন বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছিল। বাহিরের দৃশ্য এমনি করিয়া কবির মনকে যখনি নাড়া দিয়াছে, তখনই তাঁহার সেই ছবিটিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ইচ্ছা হইয়াছে। তাঁহার এই ভয় হইয়াছে, এখনি বুঝি ইহার রং বদলাইয়া যাইবে। যখনই তিনি কোন অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়াছেন, তখন তিনি স্তব্ধ হইয়া সেটি দেখিয়াছেন, পরে তিনি তাহাকে গানে সুরে ছন্দে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। এই রকম সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে কবি যে তন্ময় হইয়া যান, ইহার অনেক প্রমাণ আমরা তাঁহার লেখা হইতে পাই। তিনি যখন লোহিত সাগরে জাহাজে ছিলেন, তখন এক দিন তিনি ভারি চমৎকার একটি সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছিলেন। অকূল সাগরের মাঝখানে ইহা যেন তাঁহার কাছে একটি অতুল সম্পদ। এই দৃশ্যটি দেখিতে-দেখিতে তাঁহার মনে গভীর বেদনা জাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এ দৃশ্যটি বেশিক্ষণ আর থাকিবে না। তাঁহার মন বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, এত সুন্দর জিনিস এত সহজেই যাইবে কেন ? কেন ভগবান ক্ষণকালের জন্য এমন সুন্দর ছবিটির সৃষ্টি করিলেন ? কেন ? না তাঁহার ভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নেই। এক মুহূর্ত্তের জন্য এমন অলৌকিক সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে কত সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। কিন্তু আমরা পৃথিবীর লোক ; এমন নির্জ্জনতার মধ্যে এমন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিকে আমরা নিরর্থক বলিয়া মনে করি। এইজন্য আমাদের মন এই লোকসানকে ঘটিতে দিতে চায় না। তাই "সোণার তরীর" দৃশ্যটি কবি যেদিন দেখেন, সেইদিন এই ছবিটিকে সাধারণের উপভোগের জন্য তাঁহার কাব্যে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল।

এইটুকু অবধি 'সোণার তরী' কবিতাটির বাহিরের প্রাকৃতিক বর্ণনা বলা যাইতে পারে ; অর্থাৎ এই রকম দৃশ্যের মধ্যে থাকিয়া কবি কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কবিতাটির বিষয়ে আর যে কিছু বুঝিবার আছে, তাহা নহে। অনেক কবিতা আছে, যাহা অন্তর দিয়া বুঝিতে হয়। তাহার মানে খুঁজিতে বসিলে তাহার আসল রসটি পাওয়া যায় না। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, কবিতার মধ্যে ওই যে একটি নেয়ে, তাহাকে ত কবি দেখেন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, তরী বাহিয়া কে আসিল ? কবিতাটির শেষ কথা কি ? ইহার উত্তরে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সেইদিনকার দৃশ্যটি দেখিয়া একটি Suggestion কবির মনে নিশ্চয়ই আসিয়াছিল। সেটির

বিষয়ে আলোচনা করার আগে, কবিতাটির মধ্যে আর একটি জিনিস বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার আছে।

কবিতা লিখিবার সময়ে কবিকে সবচেয়ে যে-জিনিসটি আনন্দ দেয়, সেটি ছন্দ। একবার যদি কবির মনের বিশেষ ভাবটির সঙ্গে ছন্দটি মিলিয়া যায়, তাহা হইলে কবিতাটি আপনি নিজের গতিতে নিজে পূর্ণ হইয়া ওঠে। তখনকার পক্ষে কবির ও তাঁহার পাঠক-বর্গের কাছে এই ছন্দটি সম্পূর্ণ নূতন লাগিয়াছিল। এই কবিতাটি পয়ার ছন্দে লেখা। পয়ারকে কবি ইচ্ছা করিয়াই একটু খোঁড়া করিয়াছেন। কেন না পয়ার স্থিতিশীল, সে মোটেই চলিতে চায় না। সেইজন্য তাহাকে একটু খোঁড়া করিতে না পারিলে, তাহার গতিবেগ বাড়ে না। কবি সেদিন বর্ষার যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহাতে আকাশের মেঘ ও জলের স্রোত সবই চলিতেছে। সুতরাং কবিতাটির ছন্দটিকেও সচল করিয়া তুলিতে হইবে।

কবিতাটির প্রথম দুই লাইন ধরা যাক্—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

এখানে কবিতার প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটি অক্ষরের বদলে তেরটি অক্ষর আছে। এই একটি অক্ষর কম করাতেই সমস্ত ছন্দটি সচল হইয়া উঠিয়াছে। এই লাইন দুটি পয়ারের মত চৌদ্দটি অক্ষর দিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

গগনে গরজে মেঘ সঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহিক ভরসা।

বলা বাহুল্য, পরের লাইন দুটিতে আগের মত গতিবেগ আর দেখা যাইবে না।

কবিতাটির মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব আছে যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষর যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করা হইয়াছে। বাংলায় দীর্ঘস্বরের কোন বালাই নাই বলিয়া, কবি যেখানে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে তাহাকে দুই মাত্রায় ধরিয়াছেন। মানসীর কবিতাগুলির ভিতরে তিনিই প্রথমে এই নূতন বিধিটির প্রচলন করেন। ইহার পূর্ব্বে অন্যান্য কবিরা যুক্ত অক্ষরকে এক মাত্রাই ধরিতেন এবং তাহাতে অনেক সময় তাঁহাদের কবিতার ছন্দঃ-পতন হইত।

এখন কবিতাটির ভিতরের কথাটির বিষয়ে আলোচনা করা যাক্। খুব ছেলেবেলায় কবি তাঁহার গুরু বিহারী বাবুর কাছে প্রায়ই যাইতেন। বিহারী বাবু গান রচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠে সুর ছিল না; সেইজন্য তিনি সেগুলি গাইতে পারিতেন না। কবি নিজে তখন আজকালকার মত গান লিখিয়া সুর দিতে সুরু করেন নাই। সেইজন্য বিহারী বাবুর গানগুলিতে তিনি সুর দিয়া তাঁহাকে গাহিয়া শুনাইতেন। তাঁহার একটি গান কবির খুব ভাল লাগিয়াছিল। কবি তাঁহার "সোণার তরীর" আইডিয়া সেই গানটি হইতে পাইয়াছিলেন। গানটি এই—

সোণার তরী নয়নে নাচে নাচে
পা-না দিতে দিতে
ডুবে যে আচম্বিতে—ইত্যাদি

বাকি পদগুলি আমরা জানি না। তবে গানটির যে Vague idea কবির মনে জাগিয়াছিল, সেটি এমন একটি আদর্শ (ideal), যাহা পা না দিতে দিতেই তাহা আচম্বিতে ডুবিয়া যায়। তাহার উপরে আমাদের জীবনের পার্থিব চাপ মোটেই চাপান যায় না; অথচ তাহাকে না পাইলেও আমাদের প্রাণ বাঁচে না। কবি তখনো ছেলেমানুষ। কবিতাটির পরিষ্কার অর্থ তিনি তখনো বোঝেন নাই; কিন্তু তাহার আমেজটি তখনো কবির মনে লাগিয়া ছিল। সেটি যে তাঁহার মনে একেবারে গাঁথিয়া গিয়াছিল।

কবি পদ্মার ধারে বসিয়া সেদিন সন্ধ্যায় যে বিষাদের ছবিটি দেখিয়াছিলেন, সেটিকে তিনি কবিতার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু Descriptive কবিতার কোন মূল্য নাই; সেইজন্য কবি কবিতার মধ্যে কিছু suggestion দিয়াছেন। এখন মোটামুটি কবিতাটির একটি অর্থ করা যাক্। আমাদের প্রত্যেকেরই জগৎকে কিছু না কিছু দিবার আছে। আমরা প্রত্যেকেই তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকাশ করিতেছি। আমাদের মনের একান্ত একটি আকাঙ্ক্ষা আছে যে, এই প্রকাশের মধ্যে আমরা আপনাকে দিয়া যাইব। এই জন্যই কীর্ত্তিমানেরা কীর্ত্তির দ্বারা জগতে অমর হইয়া থাকিতে বাসনা করেন। সকলেরই ইচ্ছা—আমি যেন চিরকাল থাকি। কিন্তু এই থাকিবার ইচ্ছা মানুষকে বরাবর প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে। যতই সে ঠকিয়াছে, ততই সে আত্মীয়ের মধ্যে আপনার মিলনের সম্বন্ধটিকে অটুট রাখিতে চাহিয়াছে। এই যোগটিকে সুদৃঢ় রাখিবার জন্য মানুষ তাহার যথাসাধ্য করিয়া গিয়াছে। অথচ জগৎ কখনো চিরকাল তাহাকে মনে করিয়া রাখে নাই। এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁহাদের contribution জগতের সভ্যতার মূলে থাকিয়া মানবের অশেষ উপকার করিতেছে; অথচ তাঁহাদের নাম আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কবিতাটির মধ্যে ঠিক এই ভাবটিকেই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, একটি লোক সারা বছর ধরিয়া তাহার ক্ষেতে ফসল ফলাইয়াছে,—এমন সময় পদ্মার জলস্রোত তাহার ক্ষুদ্র ক্ষেতটিকে আক্রমণ করিল। তখন কে একজন তরী বাহিয়া তাহার কাছে আসিলেন। আসিতেই লোকটি তাহার 'সোণার ধান' তাঁহার তরীতে তুলিয়া দিল। দিয়া নিজেও তাহার ফসলের একপাশে সেই নৌকায় একটু স্থান ভিক্ষা করিল। কিন্তু যিনি নৌকা লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে সে নৌকায় স্থান দিলেন না। কেন না নৌকাটি ছোট। এই রূপকের ভিতর দিয়া কবিতাটির অপর অর্থটি ব্যাখ্যা করা যাক্। ঐ লোকটির সহিত আমাদের প্রত্যেকের জীবনের তুলনা হইতে পারে। লোকটির ফসল আমাদের সারা জীবনের কাজ। ছোট্ট ক্ষেতটি আমাদের আয়ুর বেড়া-ঘেরা সীমাবদ্ধ জীবন।

যিনি নৌকায় করিয়া আসিলেন, তিনি ইতিহাস-বিধাতা, আর তাঁহার নৌকাটি ইতিহাস—যাহার মধ্যে মানুষের প্রত্যেকটি কর্ম্মের হিসাব পাওয়া যায়। সেখানে সেটি সঞ্চিত থাকে। আমরা সারা জীবন প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কর্ম্মটি সমাজের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত করিতে করিতে চলিয়াছি। এই রকমে আমরা প্রত্যেক দিনের কর্ম্মরূপ সোণার ফসল ফলাইয়া তুলিতেছি। এমন সময় কাল (পদ্মার স্রোতের মতন) আমাদের আয়ুর গণ্ডীঘেরা জীবনের দ্বীপটিকে গ্রাস করিতে আসিল। তখন আমার সারা-জীবনের ফসল সোণার ধান কে লইবে? না সেই ইতিহাস-বিধাতা। তিনি তরী লইয়া আমার নিকটে আসিলেন। আমার ফসলের দাবী করিলেন। তিনি আমার জীবনের সমস্ত Production গ্রহণ করিলেন, আমিও সমস্ত নিঃশেষে তাঁহাকে দিলাম। তার পর আমি কাতর হইয়া বলিলাম, আমাকেও আমার ফসলের এক পাশে আশ্রয় দাও! আমি আমার প্রত্যেক কর্ম্মে জগৎকে উন্নতির দিকে লইয়া চলিয়াছি। কত জ্ঞান-বিজ্ঞান আমি ভবিষ্যৎ মানবের জন্য ইতিহাসে রাখিয়া গেলাম—তাহারি সঙ্গে এইটুকু চাই, যেন, জগৎ যখন আমার দেওয়া জিনিসগুলি লইবে, তখন আমাকেও মনে করে। কিন্তু ঐখানেই গোল বাধে। জগৎ আমাকে চায় না। আমার কর্ম্মকে চায়। Person বা অহং এর জন্য জগতে কোথাও লেশমাত্র স্থান নাই।

এইভাবে Lyric কবিতার ব্যাখ্যা করিতে বসিলেই তাহার আসল রসটি মাটি হয়। পাঠকের যদি কবিতাটি ভাল লাগিল, তবেই তিনি রসের আস্বাদ পাইলেন। নহিলে কোন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া ব্যাখ্যা করিয়া Lyric কবিতার রস আমাদের উপভোগ করাইবেন, এ কখনই হয় না। অনেক সময় মানে খুঁজিতে গেলে, কবিতা নীরস হইয়া পড়ে। মানে খোঁজাটাই Lyric কবিতার আসল উদ্দেশ্য নয়। সোণার তরী পড়িয়া যদি কোন পাঠকের মনে সেদিনের বর্ষা-সন্ধ্যার ম্লান দৃশ্যের ভাবটি জাগিয়া ওঠে, যদি চারিদিকে ধানের ক্ষেতে জলের খেলা, আকাশের নিবিড় ঘনঘটা, আর পদ্মার ওপারের বনের সবুজ ছায়া অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়, তবেই আমি বলিব, তিনি যথার্থ কবিতাটির রস উপভোগ করিতে পারিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতি

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম-এ

ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতি

বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে প্রধানতঃ দুই প্রকার শাসন-পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র। যে স্থলে শাসন-পদ্ধতি রাজা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় এবং রাজারই সম্পূর্ণ অধীন তত্রত্য শাসন পদ্ধতি রাজতন্ত্র নামে আখ্যাত হইয়া থাকে; এবং যে রাজ্যের শাসন পদ্ধতি প্রজা সমূহের নিজেদেরই করায়ত্ত এবং তাহাদিগের দ্বারা সম্যক্ পরিচালিত হয়, তত্রত্য শাসন-পদ্ধতি প্রজাতন্ত্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবীর পূর্ব্বকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা অন্যান্য প্রকার শাসন-পদ্ধতিও দেখিতে পাই। যেমন সৈনিকতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি, অর্থাৎ যেস্থলে শাসন-পদ্ধতি সৈনিকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে; অভিজাত-তন্ত্র শাসন-পদ্ধতি, অর্থাৎ যে স্থলে শাসন-পদ্ধতি অভিজাত সম্প্রদায় বা বড়লোকগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতি রাজতন্ত্র হইলেও শাসনতন্ত্র পরিচালন বিষয়ে প্রজাসমূহের যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে। ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতি রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এই দুই প্রকার প্রণালীর মাঝা-মাঝি রকমের। ইংলণ্ড রাজ্যে রাজা প্রজাগণের মতামত গ্রহণ করিয়াই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত এতদ্দেশীয় শাসন-পদ্ধতির নাম constitutional monarchy বা পদ্ধতি অনুযায়ী রাজতন্ত্র বা নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র। পার্লামেণ্ট মহা সমিতিতে প্রজা সমূহের মতামত অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। দেশের সর্ব্বসাধারণের ভোট লইয়া উক্ত মহাসমিতির সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই নির্ব্বাচন-প্রথা নানা দোষে কলুষিত ছিল; তৎসমুদায় দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত বহুবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ক আইনও প্রণয়ন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে উক্ত মহাসমিতির দুইটী বিভাগ,—এক বিভাগে অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থান; এই বিভাগের নাম হাউস্ অভ্ লর্ডস্; অন্য বিভাগে সাধারণ সম্প্রদায় অধিবেশন করিয়া থাকেন; এই বিভাগের নাম হাউস্ অভ্ কমন্স্। যে কোন আইন প্রণয়নের সময় অথবা অন্য ব্যাপারে এই দুই সম্প্রদায়ের মত গ্রহণ করিয়া অতঃপর ইংলণ্ডেশ্বরের অভিমত গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, রাষ্ট্র-শাসন-ব্যাপারে ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের এই যে সুবিধা রহিয়াছে, এই সুবিধা কি ইদানীন্তন কালেই প্রদত্ত হইয়াছে. অথবা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা রহিয়াছে, বর্ত্তমান সন্দর্ভে ইহাই আলোচ্য। এই হেতু দেখিতে হইবে—অতি প্রাচীন কালে পার্লামেণ্ট বা তদনুরূপ কোন সভাসমিতি বিদ্যমান ছিল কি না; এবং কি প্রকারে ধীরে ধীরে পার্লামেণ্ট মহাসভা বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাও দেখিতে হইবে।

ইংলণ্ডীয় অধিবাসিগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ কোন্ কোন্ দেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা কোন্ কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন, ইহার আলোচনা না করিলে ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির মূল বীজ অনুসন্ধান করিতে পারা যাইবে না। স্বল্প কথায় বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে ব্রিটন, এংলো-সাক্সন্, ডেন ও নর্ম্মাণগণ বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। কিন্তু এ কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে না, কারণ, যে কোন ইয়োরোপীয় জাতির পূর্ব্বতথ্য আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একাধিক জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে সেই জাতির উদ্ভব হইয়াছে; এবং বহু জাতীয় লোকের সমাগমে ও একত্র বাসে সেই জাতির উৎপত্তি

হইলেও, বিশেষ কোনও একটী জাতির প্রভাব সেই জাতির উপরে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ সম্বন্ধেও সেই কথা,—বহু জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান ইংলিস জাতির উদ্ভব হইলেও, জার্ম্মাণ বা টিউটনিক জাতির প্রভাব ইংলিস জাতির মধ্যে সবিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। টিউটনগণ আসিয়া কেবল যে দেশ অধিকার করিলেন, তাহা নহে; বহু সংখ্যক টিউটন ব্রিটেনে প্রবেশ করায় তাহাদিগের বিমিশ্রণে জাতীয় পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে সংসাধিত হইল। ব্রিটনগণ ইংলণ্ড দ্বীপের পশ্চিমাংশে বিতাড়িত হইল; এবং জার্ম্মাণি হইতে দলে দলে লোক আসিয়া টিউটনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। দেশের চাল-চলন, রাজনীতি, শাসন-পদ্ধতি সবই জার্ম্মাণি হইতে আমদানী হইতে লাগিল। ইতিহাসজ্ঞগণ অবগত আছেন যে, রোমান অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ইংলণ্ডের ইতিহাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। রোমানগণ কয়েক শত বর্ষকাল ইংলণ্ড শাসন করেন। অতঃপর স্বদেশ রক্ষার জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে এংলো-স্যাক্সন্ প্রভৃতি টিউটনিক জাতিগণের ইংলণ্ডে সমাগম হইয়াছিল। কয়েক শত বৎসর তাঁহাদের রাজত্ব করার পর নর্ম্মাণগণ অর্থাৎ ফ্রান্সের নর্ম্মাণ্ডি প্রদেশের অধিবাসিগণ ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম উইলিয়মের সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়া ইংলণ্ড বিজয় করিলেন। এই ইংলণ্ড বিজয়ের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এবং এংলো-সাক্সনদিগের ইংলণ্ডে আগমনের প্রায় তিনশত বৎসর পরে ডেনগণ অর্থাৎ ডেনমার্কবাসিগণ পুনঃপুনঃ ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে থাকে। বহু সংখ্যক ডেন ইংলণ্ডে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ডেনগণের নৃপতি নাট্ সমুদায় ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়েরও রাজা ছিলেন। যাহা হউক, রোমানগণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের সভ্যতা, তাহাদিগের আইন কানুন সবই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। সুতরাং ইংলণ্ডীয় শাসন পদ্ধতির মূল বীজ অনুসন্ধান করিতে হইলে, রোমান শাসন-পদ্ধতি পর্য্যালোচ্য নহে। ইংলণ্ডের ভাষা, ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতি সবই সেকালের টিউটনগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য বহু শতাব্দী অতীত হওয়ায় তৎসহ অনেক নূতন উপাদান নিশ্চিতই বিমিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজগণের জাতিত্ব, ভাষা ও শাসন পদ্ধতি এই তিনটী বিষয়ের মূল বীজ অন্বেষণ করিতে গেলে, প্রাচীন টিউটনগণের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন। সেই প্রাচীন কালে জার্ম্মাণির অরণ্যময় প্রদেশে তাৎকালিক জার্ম্মাণগণ কিরূপে জীবিকার্জ্জন করিত এবং রাজ্য-শাসন করিত, তাহাদিগের রীতিনীতি আচার-পদ্ধতি কি প্রকার ছিল, এই সমুদায় বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

কিন্তু তাহাদিগের আইন কানুন, রীতি নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক সিজার ও ট্যাসিটাসের লিখিত বৃত্তান্ত পাঠে তাৎকালিক অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। সিজার ও টোলেমি প্রদত্ত বিবরণও তমসাচ্ছন্ন পুরাকালীন ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের বহু স্থলে আলোক-রেখাপাত করিয়া থাকে। ঐতিহাসিক বিড্ বলেন, জার্ম্মাণি হইতে এঙ্গল্, সাক্সল্ ও জুট এই তিন দল লোক আসিয়াছিল। ট্যাসিটাস কিন্তু সাক্সন্ ও জুট এই দুই দলের উল্লেখ করেন না। উত্তর জার্ম্মাণির কয়েক দল লোকের মধ্যে এঙ্গল জাতির নামোল্লেখ করেন, কিন্তু তাহাদিগের নিবাস স্থলের কথা কিছু বলেন না। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমি, সাক্সন্ ও এঙ্গলদিগের বাসভূমি দেশের যে অংশে ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এল্‌ব, আইডার ও ওয়াসেল নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে তাহাদিগের বাস ছিল। ঐতিহাসিক বিডের আমলের পূর্ব্বে সাক্সন্ বলিলে শুধু একটী ক্ষুদ্র দলকে বুঝাইত না; উত্তর জার্ম্মাণির কতিপয় দলের সমষ্টিকে বুঝাইত। প্রাগুক্ত টিউটনিক দলের লোক সকল ব্রিটেন আক্রমণ করিয়াছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, ইংলণ্ডেরই পুরাতন নাম ব্রিটেন, এবং ব্রিটেনবাসিগণকেই ব্রিটন বলা হয়। যাহা হউক, রোমানগণের রীতি নীতি, আইন কানুনের সংস্রবে আসিয়া ব্রিটেন আক্রমণকারী ঐ সকল দলের লোকের রীতি নীতির বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ঐ সকল দলের এবং তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী ও আত্মীয় স্থানীয় অন্যান্য দল যাহারা রোন্ ও ডানিউব নদীর উপকূলে বাস করিত, তাহাদিগের আইন কানুন রীতি নীতির সহিত যে রোমানগণের আইন কানুন, রীতি নীতির বিশেষ সাদৃশ্য ছিল, তাহাই অনুমান হয়। সিজার ও ট্যাসিটাসের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়োক্ত দল সমূহের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

ট্যাসিটাসের সময়ে জার্ম্মাণি কতিপয় স্বাধীন দলের লোকের দ্বারা অধিকৃত ছিল। তৎকালে তাহারা স্থায়িভাবেই জার্ম্মাণিতে বসবাস করিতেছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্ব সময়ে তাহারা এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তৎকালে রাজ্যের সমুদায় ভূমি প্রজাসাধারণের অধিকারে থাকিত। আবাদ যোগ্য ভূমি স্বাধীন ব্যক্তিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত এবং গোচর ভূমি সর্ব্ব সাধারণে ভোগ করিত। তাহাদিগের রাজনৈতিক জীবনে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এই তিন উপাদানই বিমিশ্রিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের আধিপত্য লোকসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত থাকিত। কোন কোন দলের লোকের মধ্যে নৃপতি থাকিত; বিশেষ বিশেষ পরিবারের মধ্য হইতেই সেই সমুদায় নৃপতিকে মনোনীত করিয়া লওয়া হইত। কোন কোন দলের নৃপতি থাকিত না। যাহা হউক, নৃপতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি দলের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা রূপে যে থাকিতেন তাহা নহে; পরন্তু দলস্থ ব্যক্তিবর্গকে একীভূত করিয়া রাখাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। তৎকালে স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাস এই দুই শ্রেণীর লোক ছিল। এতদ্ব্যতীত এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি রকমের আর এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা ক্রীতদাস ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদিগের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। স্বাধীন ব্যক্তিগণের অধীনে তাহারা ভূমি রাখিত, সেই সমুদায়

ভূমি চাষ আবাদ করিত এবং উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ তাহারা কররূপে স্বাধীন ব্যক্তিগণকে প্রদান করিত। ক্রীতদাসগণ নিম্নশ্রেণীর লোকরূপে গণ্য হইত। রাজবন্দীগণ ক্রীতদাসরূপে পরিণত হইত এবং কতকগুলি স্বাধীন ব্যক্তি অপরাধে দণ্ডিত হইয়া ক্রীতদাসরূপে গণ্য হইত। আর সকল স্বাধীন ব্যক্তিরই যে সমান গৌরব ও একই প্রকার সামাজিক অবস্থা ছিল, তাহা নহে। কতকগুলি স্বাধীন ব্যক্তি উচ্চবংশীয় ছিল; সকলে তদ্রূপ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও সকলের সমান রাজনৈতিক অধিকার ছিল। উত্তর দেশীয় জাতিগণের ন্যায় জার্ম্মাণির লোকসকলও বিশেষ সাহসী ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহাদিগের একটী বিশিষ্ট জাতীয় গুণ পরিলক্ষিত হয়—রমণীগণের প্রতি তাহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিত। রমণীগণও সতীত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল, জাতীয়তার বন্ধনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল; একই দলের অন্তর্ভুক্ত লোকগণের মধ্যেই প্রীতির বন্ধন বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হইত। এই জাতীয়তার বন্ধনের উপরই সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কি সামাজিক, কি যুদ্ধ-সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত, বা রাজ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থার মূলে এই জাতীয়তার বন্ধন পরিলক্ষিত হইত।

পুরাকালীন ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা তাৎকালিক জার্ম্মাণদিগের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিষয় যে রূপ অবগত হইয়া থাকি, তাহা বর্ণিত হইল। তবে নিজ দেশ হইতে চলিয়া আসিয়া অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করায় তাহাদিগের রীতিনীতির অনেকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তাহারা অনেক নূতন প্রথাও গ্রহণ করিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে রাজপদের অনেকটা পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজা বলিলেই রাজ্যের শাসক বুঝাইত না। King শব্দ Kin বা জ্ঞাতি শব্দের সহিত সম্বন্ধ; কোন জাতির রাজা বলিলে ইহাই বুঝাইত যে, তিনি সেই জাতীয় লোক, এবং সেই জাতির সর্ব্ব সাধারণের প্রতিনিধি ও দলপতি। এংলো-সাক্সনগণের ইংলণ্ডে আগমনের কিছুকাল পরে সমুদায় ইংরেজগণের প্রকৃতিগত ও চরিত্রগত একটা বিশিষ্ট পরিবর্ত্তনের কারণ ঘটিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে তাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এতদ্দ্বারা তাহাদিগের বিশেষ উন্নতি ও ঐক্যভাব সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা হউক, নর্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পূর্ব্বেই বিভিন্ন টিউটনিক দলসমূহের লোক সকল বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। নর্ম্মাণ বিজয়ের পূর্ব্বে ডেনমার্কের অনেক লোক ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারাও এই সকল জার্ম্মাণগণের সহিত সম্মিলিত ও একীভূত হইয়া একটি নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল। নর্ম্মাণ বিজয়ের পূর্ব্ব সময়ের ইংলণ্ডের সমুদায় ভূমিকে Folk-land অর্থাৎ পারলিক বা সাধারণ ভূমি ও Boc-land অর্থাৎ প্রাইভেট ভূমি—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। সাধারণ ভূমি জাতীয় সম্পত্তি রূপে গণ্য হইত। এই সম্পত্তি হইতেই রাজ্যের রাজস্ব সমূহ সংগৃহীত হইত। রাজ্যের কর প্রদান ও রাজ্যের হিত-সাধনোচিত প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি এই সাধারণ ভূমি স্বাধিকারে রাখিতে পারিত। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমি অর্থাৎ প্রাইভেট ভূমি সাধারণ লোকের নিজ সম্পত্তি রূপে গণ্য হইত। তাহারা সেই সমুদায় ভূমি চিরকালের জন্য ভোগ-দখল করিত। যাহা হউক, রাজ ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং Folk-land বা সাধারণ ভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া তাহা terra regis বা রাজকীয় ভূমি নামে আখ্যাত হইতে থাকে।

বর্ত্তমান কালের ন্যায় তৎকালে রাজ্য কতকগুলি shire বা বিভাগে বিভক্ত ছিল। শায়ারগুলিকে আবার কতকগুলি hundred বা জেলাতে বিভক্ত করা হইত; এবং hundredগুলির অধীনে কতকগুলি township বা মহকুমা থাকিত। প্রত্যেক মহকুমায় ইহার নিজস্ব একটী করিয়া সমিতি থাকিত। স্বাধীন ব্যক্তিগণের সম্মিলনে সেই সমিতি গঠিত হইত। সমিতির একজন Headman বা সভাপতি থাকিতেন; তাঁহার দ্বারা সমিতির কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইত। প্রত্যেক জেলাতে একটী করিয়া সমিতি থাকিত। এই সকল সমিতিতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ বিষয়েরই বিচার-মীমাংসা হইত। জেলার গণ্যমান্য লোক, মহকুমা-সমিতির সভাপতিগণ এবং প্রত্যেক মহকুমার চারিজন লোক লইয়া এই জেলার সমিতি গঠিত হইত। এই জেলার সমিতির যিনি সভাপতি থাকিতেন প্রথম প্রথম তিনি সকলের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। কিন্তু অতঃপর জেলাটী যে জমিদার বড়লোকের দখলে থাকিত, অনেক স্থলে তাঁহারই দ্বারা সভাপতি মনোনীত হইতেন। ইংলণ্ড দেশ অতি প্রাচীন কাল হইতেই শায়ারসমূহে বিভক্ত ছিল। Shire বলিলে share বা অংশ বুঝায়। কোন্ সময় হইতে যে ইংলণ্ড এই সমুদায় শায়ারে বিভক্ত হইয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। শায়ারের প্রয়োজনীয় রাজকীয় কার্য্য সমুদায় দুই জনের দ্বারা সম্পাদিত হইত। Ealdarman বা প্রধান ব্যক্তি শেরিফ বা শায়ারের রাজকীয় কর্ম্মচারীর সহিত এক যোগে এই সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শেরিফের দ্বারা শাসন কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হইতে থাকে, এবং Ealdarman শায়ারের সৈন্য সমূহের সেনাপতির কার্য্য করিতে থাকেন। Ealdarmanএর পদ ক্রমে ক্রমে বংশগত হইয়া যায়; কিন্তু শেরিফের পদ বংশগত হয় নাই।

যাহা হউক, সর্ব্বপ্রধান জাতীয় সমিতি পার্লামেণ্টের অবস্থা সেকালে কিরূপ ছিল, তাহা দেখিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে তৎকালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পার্লামেণ্ট না থাকিলেও, সর্ব্ব সাধারণের পক্ষের প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত এইরূপ ধরণের যে সমিতি সে সময়ে ছিল, তাহার নাম Witenagemot বা বিজ্ঞজনবর্গের সমিতি। তৎকালে এই মহাসমিতির গঠন-প্রণালী ও কার্য্য-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কথা বলিয়া থাকেন। স্থানীয় সমিতিতে প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিই যোগ দিতে পারিত। মহকুমার ও জেলার সমিতিতে সকল স্বাধীন ব্যক্তিরই কথা বলিবার অধিকার ছিল, এবং

বিভাগীয় সমিতিতেও যে কোন স্বাধীন ব্যক্তি তাহার মতামত পরিব্যক্ত করিতে পারিত। কিন্তু জাতীয় মহাসমিতিতে সদল স্বাধীন ব্যক্তিই যোগদান করিতে পারিত কি না, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন, জাতীয় মহাসমিতিতে যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিরই ছিল; কিন্তু সেকালে এই অধিকার কার্য্যকরী হইতে দেখা যাইত না। সেকালের জাতীয় মহাসমিতি বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্র ব্যাপার হইলেও, কার্য্যতঃ অভিজাত-তন্ত্র ছিল; গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোকগণের দ্বারাই সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হইত। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন, মহা-সমিতিতে সকল স্বাধীন ব্যক্তির যোগদান করিবার অধিকার ছিল না। সাধারণ স্বাধীন ব্যক্তিগণ খুব জোর বিভাগীয় সমিতিতে যোগদান করিতে পারিত। কিন্তু তথাপি এই মহাসমিতিই সমুদায় জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ ছিল। এই মহাসমিতির গঠন-প্রণালী তৎকালে যে প্রকারই থাকুক না কেন, কার্য্যতঃ ইহা বড়লোকগণের দ্বারাই যে গঠিত হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাজা, Ealdarmen বা শায়ারের শাসনকর্ত্তাগণ, রাজার উচ্চকর্ম্মচারীবর্গ এবং ধর্ম্মযাজকগণ প্রভৃতির দ্বারা এই মহাসমিতি গঠিত হইত। মহাসমিতি এই প্রকার অভিজাততন্ত্র হইলেও এবং বর্ত্তমান কালের ন্যায় রাজ্যের সমুদায় অংশের প্রতিনিধি বর্গ সমিতিতে স্থান না পাইলেও এই জাতীয় মহা-সমিতির দ্বারা রাজ্যের সমুদায় লোকের মতামত যে অভিব্যক্ত হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালেও মহাসমিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিবর্গকে গ্রহণ করা হইত। মধ্যে কিছুকাল এইরূপ প্রতিনিধি গ্রহণ ঠিক ভাবে হইত না। অনন্তর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ডি মন্টফোর্ট এবং ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম এডোয়ার্ড কর্ত্তৃক এই প্রতিনিধি গ্রহণ-প্রথা বিশোধিত হইয়াছিল।

সেকালে মহাসমিতির হস্তে বহু বিষয়ের ক্ষমতাই ন্যস্ত ছিল। অধুনাতন কালে পার্লামেণ্টের যে সমুদায় ক্ষমতা রহিয়াছে, তাৎ-কালিক মহাসমিতির ক্ষমতা তদপেক্ষা অধিকতর ছিল। কু-শাসনের জন্য রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার ক্ষমতা মহাসমিতির ছিল। অবশ্য বহুকাল অন্তর কখন কখন কোন কোন রাজাকে এইরূপ ভাবে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে! সেকালে ইংলণ্ড বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। Northumbria রাজ্যে বহু সংখ্যক নৃপতিকে সিংহাসন-চ্যুত করা হইয়াছিল; এরূপ ব্যাপারে অনেক স্থলে অযথা রক্তপাতও ঘটিত। এতদ্ব্যতীত নৃপতি-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা মহাসমিতির ছিল। সেকালের টিউটনিক রাজগণ নির্ব্বাচিত হইতেন। প্রত্যেক রাজ্যে একটী করিয়া রাজপরিবার থাকিত। সেই রাজপরিবারে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাঁহাকেই মহাসমিতি রাজসিংহাসনে বসাইত। কোন নৃপতির মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি নিতান্ত অনুপযুক্ত না হইতেন এবং সাবালক থাকিতেন, তাহা হইলে সাধারণতঃ তাঁহাকেই তাঁহার পিতৃসিংহাসনে বসান হইত। সমুদায় শাসন-কার্য্যেই মহাসমিতি সাক্ষাৎ ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত। নৃপতির সহিত এক যোগে মহাসমিতির সভ্যগণ আইন প্রণয়ন করিতেন, সাধারণ ব্যাপারের জন্য কর সংগ্রহ করিতেন, সন্ধি-বিগ্রহাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেন, প্রয়োজন হইলে সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিতেন, Folkland বা সাধারণ ভূমি প্রদান করিতেন, বিশপ, বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা ও অপরাপর রাজকর্ম্মচারীকে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিতেন, অপরাধিগণের সম্পত্তি ও যাহারা উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মারা যাইত; তাহাদের সম্পত্তি নৃপতির অধিকারে আনয়ন করিতেন, এবং ধর্ম্মযাজকগণকে পদোচিত উপাধি প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার ব্যাপারে এই মহাসমিতিই চরম বিচারের স্থল বলিয়া পরিগণিত হইত।

কিন্তু যদিও মহাসমিতির ক্ষমতা এতাদৃশ প্রবল ছিল, তাহা হইলেও যখন কোন পরাক্রান্ত নৃপতি সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখন তিনিই সহাসমিতিকে নিজের অধীনে রাখিতে সমর্থ হইতেন। আল্-ফ্রেড ও এথেলষ্টান্ নর্ম্মাণ বিজয়ের পূর্ব্ব সময়ের দুইজন পরাক্রান্ত নৃপতি; তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের তুল্য অন্যান্য ক্ষমতাশালী নৃপতিগণ মহাসমিতির সভ্যগণকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালিত করিতে পারিতেন; এবং এই প্রকারে রাজ্যের সকল বিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকিতেন। যে সকল ক্ষমতা রাজা মহাসমিতির সভ্যগণের সহিত একযোগে ভোগ করিতেন, নর্ম্মাণ বিজয়ের প্রাক্কালে সেই সকল ক্ষমতা রাজা একাই উপভোগ করিতেন। কিন্তু আইন প্রণয়ন ও রাজ্যের রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য কর স্থাপন—এই দুই ব্যাপার রাজা সভ্যগণের পরামর্শ ও সম্মতি গ্রহণ না করিয়া সম্পাদন করিতে পারিতেন না।

এই স্থলে তাৎকালিক ইংলণ্ডের বিচার প্রণালীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্থানীয় আদালতে বিচার সম্পাদন করাই সেকালের প্রথা ছিল। অপরিচিত বিচারালয়ে বিচার না হইয়া স্থানীয় বিচারালয়ে বিচার হইলে, প্রজাগণের পক্ষে নিশ্চিতই সুবিধাজনক হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তৎকালে প্রজাবর্গের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইত। স্থানীয় বিচারালয় সমূহের বিষয় পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। যে কোন মোকদ্দমাতেই প্রত্যেক ব্যক্তি হয় নিজে উপস্থিত হইবে অথবা তাহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে, তৎকালে এই প্রকার প্রথা ছিল। প্রত্যেক বিচারেই কয়েকজন নির্ব্বাচিত জুরি থাকিতেন। এল্ডরম্যান অথবা শেরিফ, এবং বিশপ জুরিগণের সহিত একযোগে আইনের কথা ব্যক্ত করিতেন। আর সাফাই সাক্ষ্যের দ্বারা অথবা পরীক্ষার দ্বারা বিচার্য্য ঘটনা সকল বিনির্ণীত হইত। আসামী তাহার নিজের শপথ ও কয়েকজন সাফাই সাক্ষীর শপথের দ্বারা অপরাধ-মুক্ত হইতে পারিত। সচরাচর দ্বাদশ জন সাফাই সাক্ষীর প্রয়োজন হইত। আসামীর আত্মীয় এবং প্রতিবেশিগণের মধ্য হইতে এইরূপ সাফাই সাক্ষী গ্রহণ করা হইত। যাহার জন্য সাক্ষ্য দিতে সাক্ষীগণকে আনয়ন করা হইত, সেই ব্যক্তি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী, চরিত্র কেমন, এই সকল বিষয়েই তাহারা সাক্ষ্য-প্রদান করিত। কিন্তু সকল স্থলেই সাফাই

সাক্ষ্যের সুবিধা দেওয়া হইত না। গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইলে কেবল পরীক্ষার দ্বারা বিচার্য্য ঘটনা নিরূপণ করা হইত। যদি কোন ব্যক্তি খুন করিবার সময় ধৃত হইত, অথবা যদি কাহারও অপরাধের বিশিষ্ট সাক্ষাৎ প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে পরীক্ষার দ্বারা তাহার অপরাধ নির্ণীত হইত। যে ক্ষেত্রে আসামী উপযুক্ত সংখ্যক সাফাই সাক্ষী সংগ্রহ করিতে না পারিত, অথবা যদি আসামী ইতিপূর্ব্বে মিথ্যাবাদিতার দোষে দূষিত থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই পরীক্ষার প্রয়োজন হইত। আসামী যদি স্বাধীন ব্যক্তি না হইত, তাহা হইলে পরীক্ষার দ্বারা তাহার অপরাধ স্থিরীকৃত হইত; কিন্তু যদি তাহার ভূম্যধিকারী শপথ করিয়া বলিতেন যে, আসামী নির্দ্দোষ, অথবা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করিতেন, তাহা হইলে অপরাধ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষার আর প্রয়োজন হইত না। তৎকালে এইরূপ পরীক্ষাকে ঈশ্বরের বিচার বলা হইত। এবংবিধ পরীক্ষা তিনপ্রকার ছিল; উত্তপ্ত লৌহ, উত্তপ্ত অথবা শীতল জল এবং মন্ত্রপূত খাদ্য এই তিন প্রকার বস্তুর দ্বারা আসামীর দোষাদোষ নির্ণয় করা হইত। শীতল জলের পরীক্ষা ব্যতীত অন্য সব পরীক্ষাই কোন গীর্জ্জা-ঘরে পুরোহিতগণের সাক্ষাতে প্রয়োগ করা হইত। এইরূপ পরীক্ষার স্থলে রাজ-কর্ম্মচারিগণের নানাপ্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনার অবসর থাকিত। ইহা অনুমান করিতে পারা যায়। তবে ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা যে এবম্প্রকার পরীক্ষার মূল ভিত্তি, ইহা সুনিশ্চিত; যাহা হউক, ঈশ্বর তাহা নিশ্চিতই প্রকাশ করিয়া দিবেন, এইরূপ দৃঢ় ধারণা মনে পোষণ করিয়া তখনকার লোকে প্রাগুক্ত পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিত। পূর্ব্বে যে সাফাই সাক্ষীর কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা ব্যতীত অন্য এক শ্রেণীর সাক্ষী ছিল। তাহারা রাজকীয় কর্ম্মচারী, ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিত। সেকালে কেহ যদি কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করিত, অথবা কোন সম্পত্তির ক্ষতি করিত—তাহা হইলে এই উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ-দণ্ড করা হইত। ইউরোপের উত্তরাংশের সকল জাতির মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেরই যেন একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য ছিল, তাহাকে হত্যা করিলে সেই পরিমাণে অর্থদণ্ড (wergild) প্রদান করিতে হইত। কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বধ করিলে সেই হত্যাজনিত অর্থ-দণ্ড তাহার জ্ঞাতিকে প্রদান করা হইত; কোন ক্রীতদাসকে বধ করা হইলে তাহার প্রভুকে সেই অর্থ-দণ্ড প্রদান করা হইত। নিহত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার তারতম্য অনুসারে অর্থদণ্ডের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইত। সাধারণ স্বাধীন ব্যক্তিকে কেহ বধ করিলে দুইশত শিলিং অর্থদণ্ড হইত; বিশিষ্ট ব্যক্তি বধে ছয় শত শিলিং, ও যে বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজকীয় কর্ম্মচারী তাহার বধে বার শত শিলিং অর্থদণ্ড হইত। Ealdarman বধে এই পরিমাণের দ্বিগুণ, নৃপতির জ্ঞাতি বধে তিনগুণ এবং নৃপতিকে বধ করা হইলে ছয় গুণ অর্থ-দণ্ড হইত। অতঃপর রাজ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ ও রাজার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয়! যাহা হউক কোন ব্যক্তিকে বধ করার জন্য উক্ত প্রকার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলেও নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণ হত্যার প্রতিশোধ লইতে পারিত; এ অধিকার তাহাদের ছিল। কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ হইলেই নৃপতি তজ্জন্য জরিমানার টাকা আদায় করিতেন। কতক-গুলি অপরাধের নিমিত্ত নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রদান করা হইত। যে ব্যক্তি রাজদণ্ডের ভয়ে পলায়ন করিত, সে ফেরার (outlaw) বলিয়া গণ্য হইত; হিংস্র পশু বধ করার ন্যায় যে কোন ব্যক্তি তাহাকে বধ করিতে পারিত।

ইংরাজদিগের সেকালের যে আইন-কানুন ছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এথেলবার্ট (৬০০ খৃঃ অঃ) ইংলণ্ডের অন্তর্গত কেণ্টের প্রথম খৃষ্টান রাজা; তৎপ্রচলিত আইনসমূদায় বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, সেকালের প্রথাসমূহ অবলম্বন করিয়াই অনেক আইন গঠিত হইয়াছিল। সে সব প্রথাও এ কালের লোক জানে না; সেই জন্য সেই সব আইনও অনেক স্থলে অবোধ্য ও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে। সাফাই সাক্ষ্য, পরীক্ষা ও অর্থদণ্ড বিষয়ে অনেক আইন ছিল; পবিত্র স্থানের ব(ক্তির বা বস্তুর পবিত্রতাসম্বন্ধে আইন ছিল; কোন্ কোন্ অপরাধে কিরূপ দণ্ড হইবে, তদ্বিষয়ে আইন ছিল। নানাবিধ আইন কানুন প্রণয়ন করার জন্য প্রাচীনকালের রাজাদের মধ্যে নৃপতি আলফ্রেডই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। যেরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাতে বোধ হয় তিনিই অধিকাংশ আইন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; তবে সে সব আইনের অস্তিত্ব তাঁহার পূর্ব্বেও ছিল ইহা সুনিশ্চিত। তিনি তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার আইন সমুদায়ের ভূমিকায় এইরূপ কথাই তিনি লিখিয়াছেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—অতি প্রাচীনকালে রাজাকে জাতীয় দলপতি বিবেচনা করা হইত; পরে তিনি রাজ্যের অধিপতি বলিয়া গণ্য হয়েন। নর্ম্মাণ বিজয়ের পূর্ব্ব সময়েই যে রাজপদের এবম্প্রকার উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, নৃপতি আলফ্রেডের রাজদ্রোহ সংক্রান্ত আইন পাঠ করিলেই তাহা অনুমিত হইবে। সেই আইনে বলা হইয়াছে যে, রাজার জীবন সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র করিলে সেই ষড়যন্ত্রকারীর প্রাণদণ্ড করা হইবে এবং তাহার সমুদায় সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। নর্ম্মাণ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের নৃপতি (Edward the Confessor) এডোয়ার্ড দি কন্-ফেসরের প্রণীত আইনসমূহ এই স্থলে উল্লেখযোগ্য। তৎসমুদায় আইন পাঠে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতির অবস্থা কেমন ছিল, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ঐতিহাসিক ডাক্তার ষ্টাবস্এর একটী কথা এই স্থানে স্মরণ করিতে হইবে; ইনি ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতি বিষয়ক সুন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন, সেকালে ইংলণ্ডে যখনই কোন প্রকার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তখনই আইনসমূহ প্রণয়ন করা হইয়াছে। আলফ্রেডের আইনসমুদায় দেখিলেই মনে হয়, ইংলণ্ডের অংশত্রয় Wessex, Kent এবং Mercia একত্রীভূত হওয়ায় এই সমুদায় আইনের সৃষ্টি। সমুদায় ইংলণ্ড একত্রীভূত হওয়ায় রাজা এডগার আইন প্রণয়ন করেন। ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির সহিত প্রাগুক্ত রাজা এডোয়ার্ডের আইনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কারণ প্রথম উইলিয়ম্ ও প্রথম হেনরি এই দুইজন নর্ম্মাণ নৃপতি এডোয়ার্ডের আইনকে মূল ভিত্তি করিয়া তাহার উপরেই আইন-কানুন গঠন করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের আইন-কানুনের দ্বারা ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতি বিশেষভাবে সমুন্নত হইয়াছে। যাহা হউক সেকালের ইংলণ্ডীয় বিচার-প্রণালী ও আইন-কানুনের বিষয় কতকটা বর্ণিত হইল; এবং তাৎকালিক জাতীয় মহাসমিতি নর্ম্মাণ বিজয়ের পূর্ব্ব সময়ে কতদূর প্রসার প্রাপ্ত ও সমুন্নত হইয়াছিল তাহাও লিখিত হইল।

গঙ্গাতীরে

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

তিন বন্ধুতে বেড়াইতে যাইব স্থির হইয়াছিল। বন্ধু দুইজনের মধ্যে একজন কবি ও একজন চিত্রকর। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এক দিন হাটখোলার ঘাটে প্রাতঃকালে আমরা কালনার টিকিট কিনিয়া হোরমিলার কোম্পানির একখানি ষ্টীমারে স্থান সংগ্রহ করিলাম।

ষ্টীমারখানির পার্শ্বে একটী ফ্ল্যাট বাঁধা। উহাতে নানা প্রকার মাল বোঝাই ছিল। যাত্রী অনেকগুলি হইয়াছিল। আমরা ষ্টীমারের ডেকের উপর বিছানা বিস্তৃত করিয়া বসিলাম। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অতি কষ্টে যে যেখানে পারিল স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়া বসিল। স্থানাভাবে স্ত্রীলোক যাত্রীদের অনেক অসুবিধা হইল।

কলিকাতার সময় ৭৷৷০ ঘটিকায় ভোঁ দিয়া ষ্টীমার ছাড়িল। আজ চতুর্দ্দশী তিথি, গঙ্গায় যথেষ্ট জল থাকায় ছোট ষ্টীমার খানি মাল বোঝাই ফ্ল্যাটটী সঙ্গে লইয়া অতি দ্রুত উত্তরদিকে চলিতে লাগিল। গায়ের জামা কাপড় খুলিয়া ফেলিলাম, গঙ্গার শীতল হাওয়ায় শরীর স্নিগ্ধ হইল।

কলিকাতা পশ্চাতে রাখিয়া যতই আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই গঙ্গার দুইটী তীরের দৃশ্য মনোরম বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে আমরা বেলুর মঠ, ও উহার কিছু উত্তরে অবস্থিত কলিকাতা যোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁর নব-সংস্কৃত ঠাকুর-বাটী ও গঙ্গার অপর পারে স্থিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের লীলা নিকেতন, রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর-বাটী ছাড়াইয়া চলিলাম।

তৎপরে আমরা বালি ছাড়াইয়া চলিলাম। বালি অতি প্রাচীন স্থান। কবিকঙ্কণে ইহার উল্লেখ আছে। দত্ত কায়স্থদিগের আদি আবাস-ভূমি এই বালিতে ছিল। এখানে একটী বিশাল ভাঙ্গা ঘাটের পার্শ্বে একটী শ্বেতবর্ণের বৃহৎ বাগান বাড়ী রহিয়াছে। উহার পার্শ্বেই কলিকাতার এণ্ডুরইউল কোম্পানীর মুৎসুদ্দী ওঙ্কার মল জেঠিয়ার ইংরাজী ধরণের ছবির ন্যায় দেখিতে একটী বৃহৎ বাগান-বাড়ী রহিয়াছে। গঙ্গার ধারে সুউচ্চ পোস্তা গাঁথিয়া লইয়া এই বাগান-বাড়ীর পূর্ব্ব দিক সুদৃঢ় করা হইয়াছে। বাগান-বাটীর মধ্যে একটী বেলে পাথরের ছোট মন্দির রহিয়াছে। এরূপ সুন্দর বাগান-বাড়ী গঙ্গার দুইধারে আর কোথাও চক্ষে পড়ে নাই। বালির কিছু উত্তরে গঙ্গাতীরে রেলিং দ্বারা ঘেরা ফাঁকা জমির মধ্যে অবস্থিত উত্তরপাড়া কলেজ রহিয়াছে। কলেজের বাটীটি দ্বিতল। ইহার আরও অনেক দূর উত্তরে একটী বিশাল বাঁধা ঘাট, ও ঘাটের উপরে চাঁদনী রহিয়াছে। এই চাঁদনীটীর দুই পার্শ্বে ৬টী করিয়া ১২টী শিব-মন্দির আছে। ইহার প্রায় সম্মুখে পূর্ব্ব পারে ব্যারাকপুরে রেলিং দ্বারা ঘেরা লাট সাহেবের বিশাল বাগান-বাটী রহিয়াছে।

ইহার আরও কিছু দূর উত্তরে পলতার জলের কল। এই স্থান হইতে কলিকাতায় পানীয় জল সরবরাহ হয়।

আরও কিঞ্চিৎ উত্তরে অগ্রসর হইয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে শ্রীরামপুর—মাহেশ। এই স্থানে গঙ্গাতীরে অতি যত্নে-রক্ষিত মসী-বিনিন্দিত ২২টী শিব-মন্দির আছে ও তাহার সন্নিকটেই শিব-মন্দিরের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট একটী বিশাল চূড়া বিহীন ইমারৎ রহিয়াছে। ইহার উত্তরে জলের কল ও তদুত্তরে শ্রীরামপুরের রাজা ৺কিশোরীমোহন গোস্বামীর বসত-বাটী ও বাগান বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত আছে। বাড়ীটী লাল বর্ণের। রাজার এই বাটীর পার্শ্বে একটী বাঁধা ঘাট ও ঐ ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া চারিটী শিবমন্দির রহিয়াছে। মাহেশে পূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিংসের বাগান-বাড়ী ছিল। ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে দীনেমারদিগের প্রাধান্য ছিল।

এই স্থলের অপর পারে গঙ্গাতীরে একটী সুউচ্চ কালীমন্দির রহিয়াছে। এই স্থানে গঙ্গার জলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গেল। গঙ্গার মধ্যস্থল দিয়া উত্তর দক্ষিণে লম্বা, যতদূর দৃষ্টি যায়, একটী দুই হস্ত পরিমিত প্রশস্ত কাচের ন্যায় স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণের জলের রেখা বা পথ হইয়াছে। ঐ স্বচ্ছ জলীয় পথটীর দুই পার্শ্বের জলরাশি ঘোলা। এই স্বচ্ছ রেখাটী দেখিতে কতকটা আকাশের ছায়াপথের

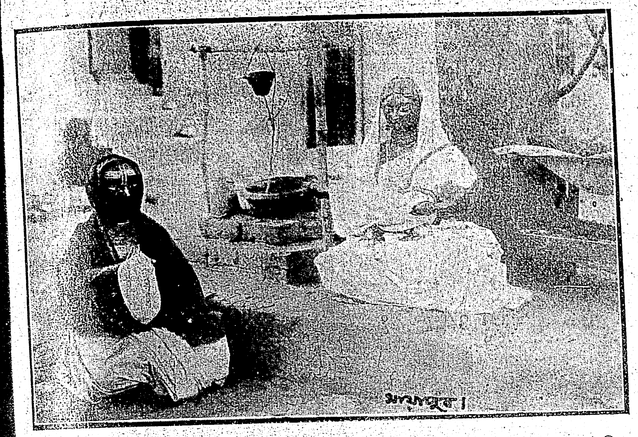

১। মায়াপুরের জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে জগন্নাথ মিশ্র, ও নবজাত চৈতন্য মাতৃক্রোড়ে শায়িত

ন্যায়। কিরূপে এই অপূর্ব্ব রেখাটী জলের উপরে হইল কেহই বলিতে পারিল না।

তৎপরে গঙ্গার উভয় তীরেই বড় বড় কল। উহাদের বৃহৎ চিমনীগুলি ভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে ও কোন কোনটী ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। এই স্থানে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে গঙ্গার ধারের রাস্তার পার্শ্বে কবি সহযাত্রীটী একটী নির্জ্জন শ্মশান ঘাট দেখাইয়া বলিলেন যে, ঐ স্থানে আজ কয় বৎসর হইল তিনি তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীটীকে নিজ হস্তে চিতায় তুলিয়া দিয়া ভস্মে পরিণত হইতে দেখিয়াছেন। কবির চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। আজিও তরুণ কবি সেই মৃত সঙ্গিনীটীর জন্য শেষ দিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

আমরা যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই নৌকা, ডিঙ্গি, ভড়, ষ্টীমলঞ্চ প্রভৃতি কমিয়া আসিতে লাগিল, ও গঙ্গার উভয় তীর লোক-বিরল হইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিলাম।

ক্রমে আমরা কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের শ্যামনগরের ঠাকুরবাটীর পার্শ্বদেশ দিয়া চলিলাম। এই ঠাকুরবাটীর মধ্যস্থ কালীমন্দির, কয়েকটী শিবমন্দির ও অন্যান্য ইমারত-গুলি অতি সুসংস্কৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। ইহার কিছু উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটী শিবমন্দির দাঁড়াইয়া আছে; উহাদের কোন যত্ন হয় না। ইহার পরেই কাঁকনাড়া।

কাঁকনাড়ার অপর পারে গোন্দল-পাড়া মিল। মিলটীর নাম বড় বড় সিমেণ্টের অক্ষরে সবুজ ঘাসের জমির মধ্যে লেখা রহিয়াছে। ইহার কিছু উত্তরে একটী পুরাতন ঠাকুরবাটী।

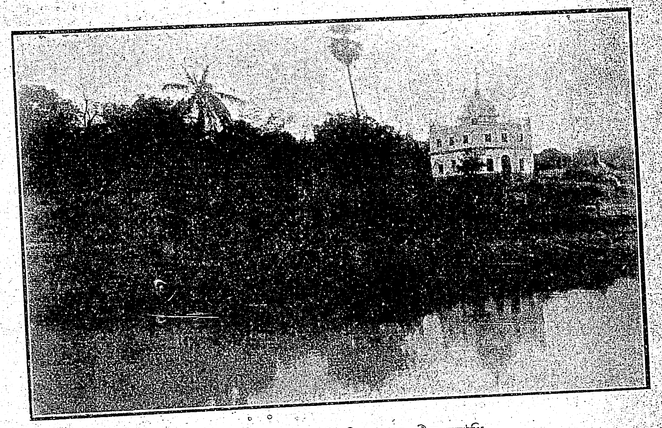

২। মায়াপুরে ভক্তিবিনোদের স্ত্রীর সমাধি

তাহার পরেই চন্দননগর। আমাদের ষ্টীমার চন্দননগরের ধার দিয়া চলিল। গঙ্গার ধারে চন্দন-নগরের "মল" নামক যে রাস্তাটী আছে, উহা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চন্দননগরের দক্ষিণ প্রান্তে জলের কল। "মলের" নীচেই ছবিতে আঁকার ন্যায় সুন্দর একটী ল্যাণ্ডিং ঘাট আছে। মলের ধারেই কতকগুলি সেকেলে পুরাতন ধরণের বাড়ী আছে, উহাদের কোনটীতে "থিসল হোটেল" কোনটীতে "হোটেল ডি প্যারিস" ইত্যাদি রহিয়াছে।

চন্দননগরের উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম পারে লোকের ঘর-

বাড়ী ও লোক-সমাগম বেশী দেখা গেল না। শুধুই বন-জঙ্গল, কদাচিৎ কোথাও দু একটী পাকা কোঠা ও কুঁড়ে ঘর। এই অঞ্চলটী লোকবিরল। ক্রমে একটী কালী মন্দির ও কয়েকটী শিবমন্দির ছাড়াইয়া বেলা প্রায় ১১॥টায় চুঁচড়ার নিকট পঁহুছিলাম। গঙ্গা চুঁচড়া হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। এখানে অনেকগুলি বাড়ীর খিড়কী পূর্ব্বে গঙ্গার জলের মধ্য হইতে পাকা পোস্তা করিয়া গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই বাটীগুলির খিড়কীর মধ্যে বার মাস গঙ্গার জল প্রবাহিত হইত, এক্ষণে গঙ্গা দূরে সরিয়া যাওয়ায় বাড়ীগুলি শুষ্ক ডাঙ্গার উপর দাঁড়াইয়া আছে। এখন বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় আর ঐ বাটীগুলির মধ্যে জল প্রবেশ করে না। বাল্যকালে যখন ছিলাম, তখন চুঁচড়ার এই বাটীগুলির মধ্যে জল প্রবাহিত হইত ও তথায় স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতেন দেখিতাম। চুঁচড়ায় ষণ্ডেশ্বর মহাদেব আছেন ও এই স্থানে বহু সুবর্ণ বণিকের বাস।

৩। মায়াপুরে চৈতন্যদেব ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ

তৎপরে সুবৃহৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হুগলী কলেজ। এই কলেজের বাটীতে পূর্ব্বে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি জেনারেল পেরন বাস করিতেন। তাহার দক্ষিণে একটী অতি বৃহৎ বাড়ী দেখিতে পাইলাম। এই বাড়ীটীর মত বৃহৎ বাড়ী সচরাচর দেখা যায় না। হুগলী কলেজের উত্তরে সার্কিট হাউস। ওলন্দাজগণ ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে চুঁচড়ায় বাস করিতে আরম্ভ করে। এইখানকার এক ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা সর্ব্বপ্রথম টানা পাখার উদ্ভাবন করেন। ইংরাজগণ ওলন্দাজদিগকে যাভাদ্বীপ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে চুঁচড়া গ্রহণ করেন। চুঁচড়ার বিপরীত দিকে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ভাট-পাড়া। ভাটপাড়ার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাঁধা ঘাটটীর এক্ষণে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার ভাটপাড়ায় অপেরা শুনিতে আসিয়া ঐ ঘাটে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত শুইয়া বিশ্রাম করিয়াছিলাম। তখনও ঘাটটীর এরূপ দুর্দ্দশা হয় নাই।

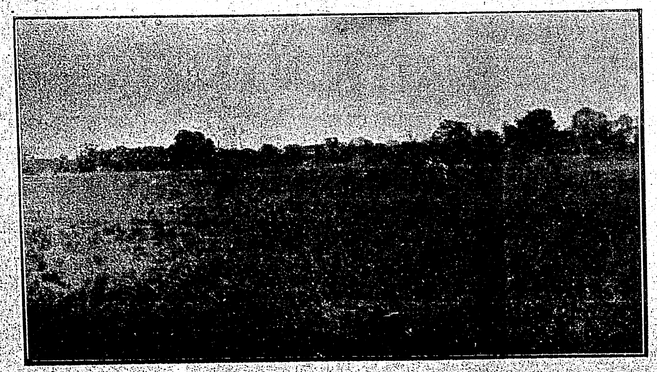

৪। প্রাচীন নবদ্বীপে—বল্লাল দিঘীর শুষ্ক খাদের দৃশ্য

ইহার পর নৈহাটী ছাড়াইয়া আমাদের ষ্টীমার হুগলী পুলের নীচে দিয়া চলিল। নীচে দিয়া আমরা যাইতেছি, আর আমাদের মাথার উপরে ব্রিজের উপর দিয়া নৈহাটী ব্যাণ্ডেল ট্রেণটী যাইতেছে। গঙ্গার মধ্যস্থলে দুই যোড়া থামের উপর এই তিন স্প্যানের পুলটী রহিয়াছে। পুলের নীচে ক্রমাগত পাথর ফেলায় তথায় জল কম। হুগলী ব্রিজের দক্ষিণ দিকে উচ্চ

রেল রাস্তার পার্শ্বেই হুগলীর জেলখানা। এখানে যথেষ্ট বনজঙ্গল আছে। হুগলীর পুল পার হইয়াই উহার কিছু উত্তরে হুগলীর প্রসিদ্ধ বদন ডাক্তারের বাড়ী। এই বদন ডাক্তার এককালে হুগলীর ইমামবাড়ীটী কিনিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বদন ডাক্তারের উত্তরেই প্রসিদ্ধ দানবীর মহম্মদ মসীনের কীর্ত্তি হুগলীর ইমামবাড়ী। ইমামবাড়ীটি ইংরাজী ধরণের। উহা চতুষ্কোণ দ্বিতল বাড়ী—দেখিতে মসজিদের মত নহে; বরং কতকটা চূড়াবিহীন বড় গির্জ্জা বাড়ীর মত এবং কতকটা castleএর মত। বাল্য-কালে হুগলীতে থাকিবার কালে জুতা খুলিয়া এই ইমামবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উঠানের প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় লাল নীল মাছের খেলা দেখিতাম ও ইমাম-বাড়ীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা-ঘরটীর দেয়ালের ফার্শি অক্ষরে লিখিত কোরাণের বয়েৎ ও ঝাড়লণ্ঠন ও সাজ-সজ্জা অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিতাম। ইমামবাড়ীর প্রকাণ্ড ঘড়ির ডায়েলে সুবর্ণরঞ্জিণ ও সময় জ্ঞাপক ফার্শি অঙ্কগুলি বহু দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। ইহার কিছু উত্তরে হুগলীর বৃহৎ বাঁধা ঘাটটী আছে। গঙ্গা দূরে সরিয়া যাওয়ায় পুরাতন বাঁধা ঘাটটী জল হইতে বহু দূরে শুষ্ক ডাঙ্গার উপর অযত্নে পড়িয়া আছে। ঘাটের সন্নিকটেই হুগলীর বিখ্যাত ব্রাঞ্চ স্কুলের একতালা বাড়ী। হুগলীর বাঁধা ঘাট ছাড়াইয়া কিছু উত্তরে গঙ্গাতীরে একটী বন জঙ্গলময় নির্জ্জন স্থানে, একটী শ্বেতবর্ণের সুসংস্কৃত পরিত্যক্ত গির্জ্জা দণ্ডায়মান আছে। ইহা পর্ত্তুগীজদিগের সময়ের গির্জ্জা। এই গির্জ্জাটী ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত ও ইহাই বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গির্জ্জা। হুগলীতে অনেক বন জঙ্গল, ইহা ষ্টীমার হইতেই বুঝা যায়। সপ্তগ্রাম বন্দরের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য পর্ত্তুগীজ-গণ এস্থলে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী বন্দর স্থাপন করে ও ভারতবাসীদের ছেলে মেয়ে ধরিয়া আনিয়া খৃষ্টান করিয়া ভারতের নানা স্থানে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী রূপে বিক্রয় করিত। হলহেড এবং উইলকিন্স সাহেব এদেশে সর্ব্বপ্রথম হুগলীতে ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই স্থানের অপর পারে হালিসহর।

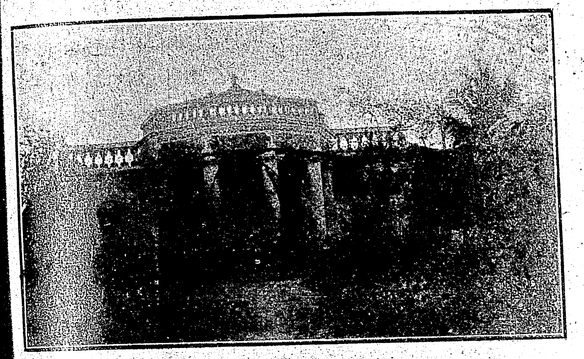

৫। মায়াপুরে চৈতন্য মঠ

তৎপরে আমরা ত্রিবেণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ত্রিবেণীর সম্মুখে গঙ্গাগর্ভে উত্তর দক্ষিণে লম্বা এক বিশাল

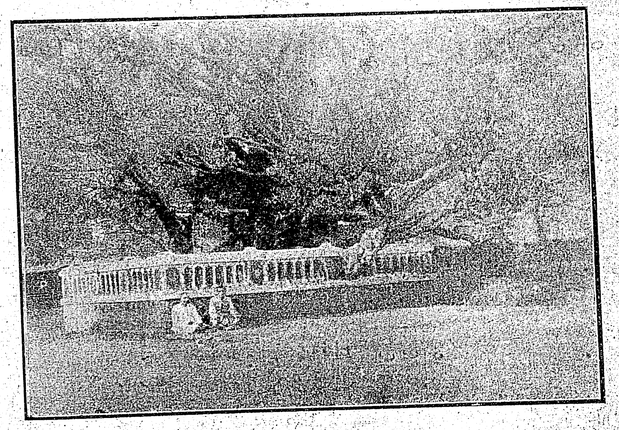

৬। বামুনপুকুর গ্রামে চাঁদ কাজীর গোর

চর পড়িয়াছে। উহা গঙ্গাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ত্রিবেণীর নীচেই গঙ্গার যে শাখাটি প্রবাহিত, উহাতে জল কম। আমাদের ষ্টীমার এই শাখার মধ্যে প্রবেশ করিয়া

৭। বামুনপুকুর গ্রামে "বল্লাল ঢিবি"

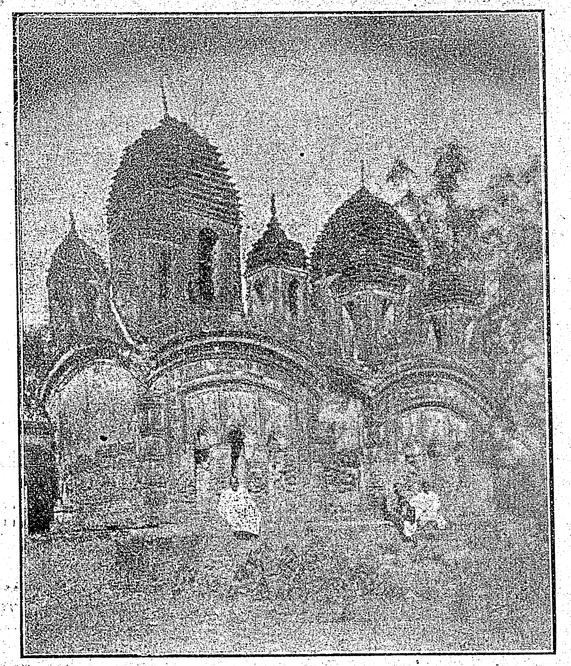

৮। শ্রীপুরে কারুকার্য্যময় ষোড়া শিবমন্দির

কিছুদূর যাইয়া একটি ভদ্র পরিবারকে নামাইয়া দিল। যেখানে ষ্টীমার থামিল, তাহার নিকটে পাড়ের উপরে মুসলমানদের একটী অতি প্রাচীন দরগা রহিয়াছে। উহাকে কাজীর দরগা কহে। ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে ২।৪টী বাগানবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিবেণীতে একটি বড় পাটের কল ও একটী সুরকীর কল চলিতেছে। আর একটী পাটের কল প্রস্তুত হইতেছে। ভবিষ্যতে এই পাটের কলের জন্যই ত্রিবেণীর লোকসংখ্যা বাড়িবে ও ত্রিবেণীর উন্নতি হইবে। এই পাটের কলের জন্য লোক সমাগম হইলে, ত্রিবেণীর ম্যালেরিয়া অনেক কমিয়া যাইবে। ত্রিবেণীতে অত্যন্ত বনজঙ্গল। ম্যালেরিয়ায় ত্রিবেণী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখানে গ্রামের মধ্যে অনেক বড় বড় বাড়ী বনজঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে, লোক নাই।

৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে বহু লোকের বাস ছিল। ত্রিবেণীতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদী পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া তিন দিকে গিয়াছে; সেজন্য ত্রিবেণীকে "মুক্তবেণী" কহে। ত্রিবেণী হইতে কিছু দূরে সরস্বতী নদীর উপর বঙ্গের পুরাতন বন্দর সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ আছে। সপ্তগ্রামে যাইতে হইলেই, আই, রেলের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনে নামিয়া ১৷৷০ মাইল যাইতে হয়। এই সপ্তগ্রাম হইতে বঙ্গের বন্দর সম্রাট সাজাহাঁর সময় হুগলীতে আসে ও হুগলী হইতে ইংরাজ আমলে কলিকাতায় আইসে। ত্রিবেণীতে বারুণী স্নানের সময় মেলা বসে ও বহু লোকসমাগম হয়। প্লিনি ও টলেমির গ্রন্থে ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে। এখানে পূর্ব্বে যথেষ্ট সংস্কৃত-চর্চ্চা হইত। শ্রুতিধর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই

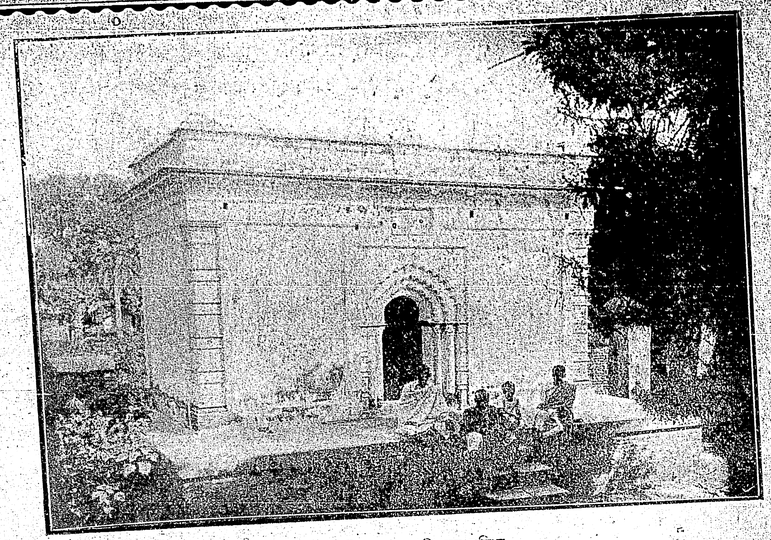

৯। শ্রীপুরে বুড়াশিবের মন্দির

ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি সার উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে হিন্দু আইনের সার সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ত্রিবেণীর স্নানের ঘাটের উপর বাজার প্রভৃতি ও কতকগুলি পুরাতন বাটী আছে। এই স্থানে মহাশ্মশান আছে। এই শ্মশানে সর্ব্বদা চিতা জ্বলিতেছে,

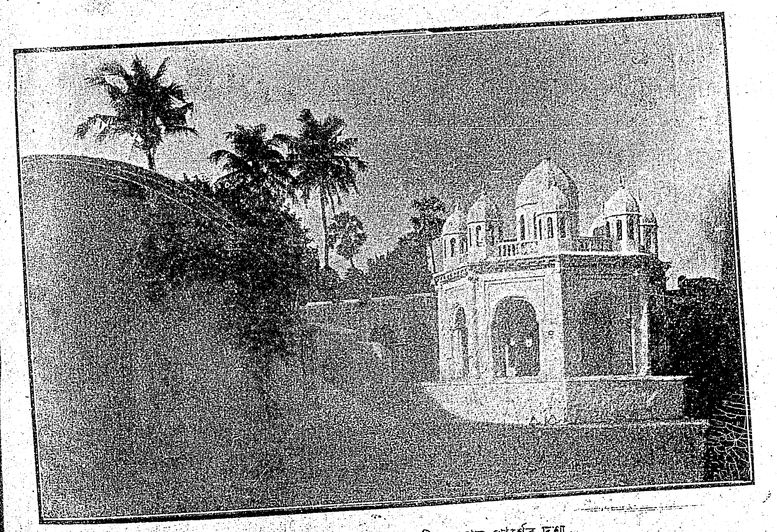

১০। শ্রীপুরে বিখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বের দৃশ্য

উহা কখন একেবারে নির্ব্বাপিত হয় না। বহু দূরদূরান্তর হইতে মৃতদেহ আনিয়া এই মহাশ্মশানে দাহ করা হয়। ত্রিবেণীর সম্মুখে গঙ্গার অপর পারে কাঁচড়াপাড়া ও কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের তীর্থ ঘোষপাড়া অবস্থিত।

পথে ও স্থলপথে উভয়বিধ ডাকাতি হইত। এই জলপথে যাত্রীদিগের গ্রামের বাঁড়ুয্যেগণ জল ও স্থলপথে ডাকাতি করিয়া ও পথিককে গৃহে স্থান দিয়া প্রাণে মারিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া অনেক ধন সম্পত্তি

সম্মুখের চরটী অতিক্রম করিতে প্রায় ১ঘণ্টা সময় লাগিল।

ত্রিবেণীর ৪ মাইল উত্তরে সিঙ্গে ডুমুরদহ। ষ্টীমার হইতে গ্রামটিকে জনমানবহীন বলিয়া মনে হয়। গ্রামটী জঙ্গলপূর্ণ। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে এমন কি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই স্থানে ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে ভীষণ ডাকাতি হইত। জল

করিয়াছিল। ডাকাইতি করিয়া ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি করাই ইহাদের ব্যবসা ছিল। এই স্থানের বিখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যেকে ইংরাজগণ ধরিয়া গঙ্গাতীরে তাহার নিজ দ্বিতল বাটীর সম্মুখে ফাঁসি দিয়াছিলেন। সেই ডাকাতি দ্বারা সৃষ্ট জমিদারী এখনও এই গ্রামের কোন কোন ব্রাহ্মণ পরিবার ভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে গ্রামটী ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।

ক্রমে আমরা জিরেটের পার্শ্বদেশ দিয়া চলিলাম। জিরেটের ঘাটে একখানি শ্বেতবর্ণের মোটর বোট বাঁধা আছে দেখিলাম। জিরেটের গাঙ্গুলীগণ অবস্থাপন্ন লোক। এই জিরেটেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ৺সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটা ও বাসভবন আজিও আছে। জিরেটে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া ও বনজঙ্গল। বেলা প্রায় ৩টার সময় আমরা শ্রীপুর ও সুখড়িয়া ছাড়াইয়া চলিলাম।

রাত্রি প্রায় ৮৷৷০টার সময় আমরা কালনায় পঁহুছিলাম। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু ঝড় হইতেছে; আবার নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়াছে। কালনার কোন বিশিষ্ট ব্যবসাদার পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত আমাদিগের জন্য ষ্টীমার ঘাটে লোক পাঠাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সহিত উক্ত ব্যবসাদারের গৃহে সে রাত্রের জন্য আশ্রয় পাইলাম। সেখানে যে যত্ন পাইলাম, তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। কালনায় অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় আছে, তাহার বিবরণ দিতে গেলে প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

পরদিন বেলা প্রায় ১১টার সময় রেল যোগে আমরা নবদ্বীপ যাত্রা করিলাম। অনুমান অর্দ্ধঘণ্টা পরে নবদ্বীপ ষ্টেশনে পঁহুছিয়া একটী ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিলাম। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের লোকে নবদ্বীপের এক স্থান হইতে অপর স্থানে পদব্রজে যাতায়াত করিত। এক্ষণেই, আই, রেলের ষ্টেসন হওয়ায় অনেকগুলি ঘোড়ার গাড়ী হইয়াছে। গৌরাঙ্গদেবের সময় এই নবদ্বীপের নাম কোল দ্বীপ বা কুলিয়া দ্বীপ ছিল।

নবদ্বীপ একটী বড় সহরে পরিণত হইয়াছে। এখানে পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ধনী লোক আসিয়া বাস করিতেছেন। শুনিলাম, এখানে পাপস্রোত কাশী অপেক্ষা কম নহে। এজন্য কেহ কেহ ইহাকে বাঙ্গালার কাশী কহিয়া থাকেন। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূজা বাটীতে নিম্বদারু নির্ম্মিত গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি, শ্রীবাস অঙ্গন ও পোড়ামাতলা দেখিয়া লইলাম। তখন দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। এত অধিক বেলায় পোড়ামাতলার অতি প্রাচীন শাখা-বিরল বটবৃক্ষের নীচে পূজা হইতেছে। আমাদের সম্মুখে ছাগবলি হইতে দেখিলাম। শুনিলাম পোড়ামার প্রকৃত নাম ৺মায়াদেবী,—একবার অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় "পোড়ামা" নাম হইয়াছে। নবদ্বীপে এক্ষণে অনেক মাড়োয়ারীর সমাগম হইয়াছে। লোকমুখে শুনিলাম যে, এখানে মাড়োয়ারীগণ একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। তথায় সর্ব্বদা হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারিলে, সিধা পাওয়া যায়। নবদ্বীপে অত্যন্ত ঘন বসতি ও অনেক দোকান পসার আছে। ক্রমে আমরা নবদ্বীপের অপর প্রান্তে আসিয়া পঁহুছিলাম ও এক ভাঁড় দধি খরিদ করিয়া লইয়া গঙ্গার বালুকাময় সুদীর্ঘ চড়া অতিক্রম করিয়া কুলিয়ার খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলাম। খেয়াঘাটের চালাঘরে দ্রব্যাদি রাখিয়া আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া জলযোগ করিয়া লইলাম। চৈতন্য ভাগবতে এই কুলিয়া নবদ্বীপ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহা ধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্রে সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥"

চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।"

এইস্থানে গঙ্গা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে ও খড়িয়া নদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে। খড়িয়ার অপর নাম জলঙ্গী। যখন ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে একবার এই কুলিয়া নবদ্বীপে গিয়াছিলাম, তখন এখানে এত কোঠাবাড়ী ও জাঁকজমক ছিল না। চৈতন্যদেবের সময় যে নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ গঠিত হয়, তাহাদের নাম এই—অন্তর্দ্বীপ (মায়াপুর), সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ (স্বরূপগঞ্জ), মধ্যমদ্বীপ, কোলদ্বীপ (অধুনাতন কুলিয়া নবদ্বীপ), ঋতুদ্বীপ, বাজদ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ এবং রুদ্র দ্বীপ—এই নয়টী দ্বীপ।

আমরা সেই দুই প্রহর রৌদ্রে ভিজা গামছা ও ছাতা

১১। শ্রীপুরে ৺গোবিন্দজীউর মন্দির

জলে স্নান করিয়া ঠাকুরবাটীর প্রসাদ লইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

বৈকাল ৫টার সময় আমরা ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। মায়াপুর গ্রামটীর অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান চাষী। গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ এক্ষণে ভক্তিবিনোদ ৺কেদার নাথ দত্ত মহাশয়ের শিষ্যগণের দখলে আছে ও উহাতে

১২। সুখড়িয়ার হরসুন্দরী কালীর ভগ্ন-মন্দির

মাথায় দিয়া খেয়া নৌকায় উঠিলাম। মাঝি আমাদিগকে কুলিয়ার খেয়াঘাটের কোণাকুণি অপর পারে নামাইয়া দিয়া বলিয়া দিল যে, সোজা মাঠ পার হইয়া মায়াপুর যাইতে হইবে। আমরা নদীতীর হইতে উপরে ডাঙ্গায় উঠিয়া মায়াপুরের অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। এক ক্রোশের উপর পথ হাঁটিয়া প্রখর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঠাকুরবাটী ও সমাধি রৌদ্রে অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া অবশেষে বেলা প্রায় ২টার সময় গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেকের মতে এই মায়াপুর ক্ষুদ্র মায়াপুর গ্রামে অবসন্নদেহে উপস্থিত হইলাম ও শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় নিকটস্থ পুকুরের কর্দ্দমাক্ত স্থানটী ক্রমেই জাঁকিয়া উঠিতেছে। মুসলমানগণ ইহাকে

মেয়াপুর বলিত। মায়াপুরের যে অংশটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকৃত, উহা মায়াপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। শুনিলাম যে, এই অংশের মধ্যস্থলে মাটীর নীচে একটী অতি প্রাচীন নিম্ব বৃক্ষের কাণ্ডের নিম্নাংশ আজিও বর্ত্তমান আছে; ঐ কাণ্ড হইতে একটী নূতন ডাল বাহির হইয়া সেই স্থানে আর একটী নিম্ব গাছ হইয়াছে। নিমগাছটীর পার্শ্বে একটী ছোট ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর আছে। উহাকে সূতিকাগৃহ বলা হয়। ঐ গৃহের বারান্দায় চৈতন্যদেবের পিতার মৃন্ময় মূর্ত্তি; গৃহমধ্যে শচীমাতার ক্রোড়ে নবজাত চৈতন্য শুইয়া আছেন। (চিত্র নং ১)

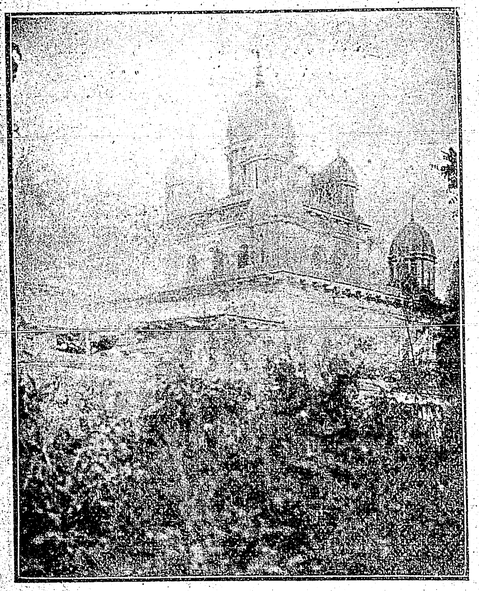

১৩। সুখড়িয়ার নিস্তারিণী কালীর নবরত্ন মন্দির

এতৎস্থানের বৈষ্ণবগণ অর্থাৎ ভক্তিবিনোদ ৺কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের শিষ্যগণ বলেন যে, এই নিম্ব বৃক্ষের তলে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করায়, তাঁহার নাম নিমাই হইয়াছিল। হিন্দুদিগের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে যখন মায়াপুরের এই স্থানটী মুসলমানদিগের দখলে ছিল, তখন এই স্থানে তুলসী বন ছিল। মুসলমানগণ তুলসীবন কাটিয়া যতবার বীজ বপন করিয়াছে, ততবারই ঐ স্থানে ফসল না হইয়া পুনরায় তুলসীবন হইয়াছে। ইহা দেখিয়া অবশেষে মুসলমানগণ আর ঐ স্থানে চাষ দিত না; পরন্তু ঐ স্থানে কোন পীর আছে মনে করিয়া রাত্রে প্রদীপ জ্বালিয়া দিত। তাহারা আবার এ কথাও বলিত যে, ঐ স্থানে হিন্দুদের ঠাকুর আছে। এই স্থানে যখন তুলসী বন ছিল, তখন বৈষ্ণব সাধুগণ আসিয়া এই স্থানের রজে গড়াগড়ি দিয়া যাইতেন। ভক্তিবিনোদ ৺কেদার নাথ দত্ত মহাশয় এই তীর্থটী ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গ্রামটী অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত ও স্বাস্থ্যকর। গ্রামের তিন দিকে নদীর চর, ফাঁকা মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা একটী অতি স্বাস্থ্যকর স্থান।

উক্ত নিম্ব বৃক্ষের পূর্ব্বে একটী বড় কোঠা ঘর আছে; তথায় লোকজন থাকে। এই কোঠা ঘরের পূর্ব্বে একটী বড় ইন্দারা আছে, উহাতে জলোত্তোলনের পম্প লাগান আছে। উক্ত ইন্দারার পূর্ব্ব দিকে ৺কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের পরলোকগত স্ত্রীর দ্বিতল সমাধি মন্দির—ইহা দেখিতে কতকটা মসজিদের ন্যায় হইয়াছে। (চিত্র নং ২)। এই ঘরের দ্বিতলে সর্ব্বদা ঝড়ের বেগে হাওয়া বহিতে থাকে। সে হাওয়া অতি নির্ম্মল।

চৈতন্যদেবের উল্লিখিত জন্মস্থানের নিম্ব বৃক্ষের পশ্চিম দিকে একটী সুউচ্চ একতালা বারান্দাযুক্ত গৃহ আছে। তন্মধ্যে মৃন্ময় চৈতন্যদেবের এবং রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। (চিত্র নং ৩) এই গৃহটীর সম্মুখে একটী বৃহৎ খড়ুয়া আটচালা আছে, উহার মেঝে শান বাঁধান ও উহাতে উৎসবের সময় সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়।

তৎপরে আমরা মায়াপুরের ঠাকুরবাটীর পশ্চিম দ্বার দিয়া নিম্নভূমিতে অবতরণ করিলাম। এই নিম্নভূমিটী গঙ্গার চর। মায়াপুর গ্রামটী এই নিম্নভূমি অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত। বর্ষাকালে মায়াপুরের তলদেশ পর্য্যন্ত বন্যার জল আসিয়া থাকে। এই মায়াপুরের সম্বন্ধে ঘনশ্যাম কৃত "ভক্তিরত্নাকরে" লিখিত আছে—

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌর চন্দ্র ভগবান॥
বৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥"

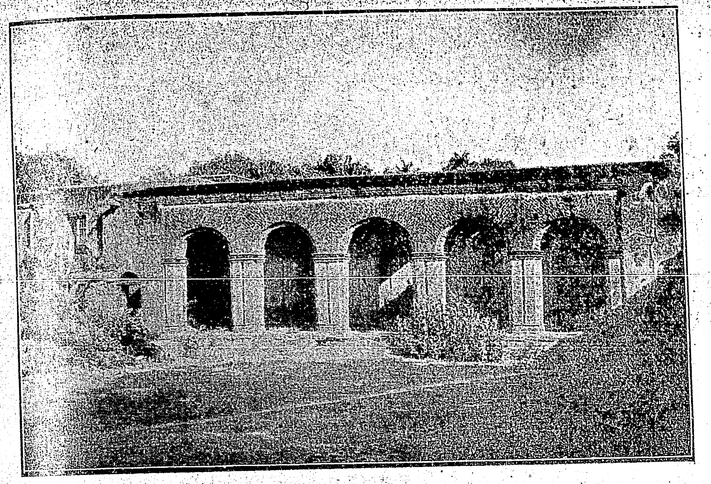

১৪। সুখড়িয়ার দুর্গাপূজার দালান

এবং ঠাকুর নরহরিকৃত নবদ্বীপ পরিক্রমায় লিখিত আছে—

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর॥" (৪নং চিত্র)

৫।৬ মিনিট কাল উত্তর দিকে হাঁটিয়া গিয়া দেখিলাম, আমাদের বাম দিকে গঙ্গার চর বা ফাঁকা মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছবির ন্যায় শোভা পাইতেছে, আর আমাদের ডাইন দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা বল্লাল দীঘির সুবিশাল শুষ্ক খাত পড়িয়া আছে—উহার মধ্যে কোন প্রকার উদ্ভিদ নাই। বল্লাল দীঘির খাতটী ১০০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহার চারিদিকে সুউচ্চ পাড় আজিও বর্ত্তমান আছে। বল্লাল দীঘির উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পাড়ে চাষীদের গ্রাম আছে। গঙ্গার প্লাবনে দীঘিটী পলি পড়িয়া বুজিয়া গিয়াছে।

বল্লাল দীঘির উত্তরে শ্রীবাস অঙ্গন বা খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা। ইহা একটী ছোট বাড়ী—এই স্থানে কয়েকখানি ইষ্টক-নির্ম্মিত ও খড়ুয়া ঘরের সমষ্টি আছে মাত্র। উঠানটীর মধ্যস্থলে মালতী ও মাধবীলতার গাছ দিয়া একটী সুন্দর ছায়াময় স্থান প্রস্তুত হইয়াছে, উহা স্নিগ্ধ ও মনোরম। এই স্থানে কোঠা ঘরে গৌর নিতাই ও শ্রীবাসাদির মৃন্ময় মূর্ত্তি আছে। কথিত আছে যে, মুসলমান কাজী এই স্থানে বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

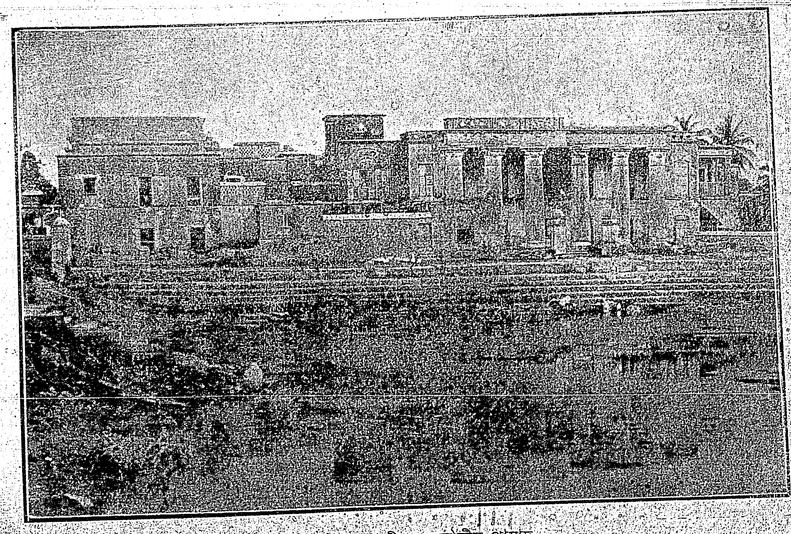

১৫। সুখড়িয়ার রাধাজীবন মুস্তোফীর প্রাসাদ

এই স্থান হইতে শ্রীনাথপুর গ্রাম দেখা যায়। উহা বল্লাল দীঘির দক্ষিণ পশ্চিমের বিশাল চরের পরপারে অবস্থিত। এই শ্রীনাথপুরে জয়দেবের বাসস্থান ছিল। তিনি বল্লালসেনের সভাসদ ছিলেন। এই শ্রীনাথপুরের দক্ষিণ পশ্চিমে ভারুইডাঙ্গা। বল্লাল দীঘি হইতে অনেক দূরে দক্ষিণ দিকে গঙ্গানগর মাঠ। বল্লাল দীঘি হইতে অনেক দূরে উত্তর পশ্চিম দিকে গুড়গুড়ে নদীর পর পারে শিমুলিয়া গ্রাম। উল্লিখিত গঙ্গানগরের মাঠের বহুদূরে দক্ষিণ দিকে সমুদ্র গড়। এই সমুদ্র গড় অতি প্রাচীন স্থান ও এই স্থানে মহাভারতীয় যুগে যুদ্ধাদি হইয়াছিল। বল্লাল দীঘির পূর্ব্ব দিকে প্রায় ৪ মাইল দূরে, খড়িয়া নদীর দক্ষিণ পারে সুবর্ণবিহার গ্রাম আছে। তথায় আজিও একটী উচ্চ ঢিবি আছে ও একটী প্রস্তরের নীচে একটী সুড়ঙ্গ আছে। এই সমুদায় স্থানগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতির সহিত বিজড়িত।

বল্লাল দীঘির দক্ষিণ পাড়ের পশ্চিম-প্রান্তে মায়াপুর গ্রাম। মায়াপুরের পশ্চিম প্রান্তে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও ঠাকুরবাড়ী ইত্যাদি আছে। কিন্তু মায়াপুরের পূর্ব্বাংশে কেবল মুসলমান চাষীদের বাস আছে। বল্লাল দীঘির দক্ষিণ পাড়ের পূর্ব্বাংশে বল্লাল দীঘি নামক একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামটী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-প্রধান। বল্লাল দীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অর্থাৎ ৺কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের শিষ্যগণ একটী মঠ প্রস্তুত করাইতেছেন তাঁহারা উহাকে "চৈতন্য মঠ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। (চিত্র নং ৫) এই স্থানে বৈষ্ণবগণ করেকটী কোঠা ঘর প্রস্তুত করিয়াছেন ও একটী নূতন ধরণের সুবৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করাইতেছেন। কলিকাতার ব্যাঙ্কো কোম্পানীর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই স্বাস্থ্যকর স্থানে বল্লাল দীঘির উচ্চ পাড়ের উপর একটী একতালা পাকা ঘর প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছেন।

উক্ত চৈতন্য মঠ নামক নবপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবদিগের গ্রামটীর উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ দূরে বামুনপুকুর নামক একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামটী অতি প্রাচীন। ইহার দক্ষিণ প্রান্তে একটী পুরাতন পুকুর আছে, উহাতে বার মাস জল থাকে ও উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের ঘাট দুইটীর আজিও শান বাঁধান আছে। এই গ্রামটী মুসলমান-প্রধান, কিন্তু কামার, ছুতার, কুমোর, ময়রা প্রভৃতি কয়েক ঘর হিন্দুর বাস আছে। এই গ্রামে ২।৩টী প্রাচীন মসজিদ আছে। এই গ্রামটী এ অঞ্চলের মধ্যে বড় গ্রাম। গ্রামটীর মাটীর বর্ণ ছাইয়ের ন্যায়। গ্রামটী সমতল ভূমিতে অবস্থিত নহে—গ্রামের কোন স্থান উচ্চ, কোন স্থান নিম্ন। অধিকাংশ গৃহের চাল খড়ের, মাটীর দেয়াল, জানালা নাই। কোঠা বাড়ীও কয়েকটী আছে। একটী ছোট বাজার আছে, তাহাতে ৫।৬ খানি দোকান আছে—দোকানদার সকলেই হিন্দু। গ্রামটীতে অসংখ্য বাঁশঝাড় আছে ও স্থানে স্থানে বাকসের গাছের ঝাড় আছে। গ্রামে অন্য কোন প্রকার বন জঙ্গল নাই। গ্রামের লোক সুস্থ ও সবল,—জ্বর-জাড়ি ও ম্যালেরিয়া কাহাকে বলে জানে না। ইহারা বলে যে ম্যালেরিয়ার দেশ হইতে নৌকা এখানে আসিলে দুই এক মাসের মধ্যেই সুস্থ ও সবল হয়। এদেশে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় মশা থাকে না।

বামুনপুকুর গ্রামটীর মধ্যস্থলে মুসলমান জাতীয় চাঁদ কাজীর গোর স্থান আছে। (চিত্র নং ৬) গোরটীর চতুর্দ্দিকে অল্পোচ্চ ইষ্টকের প্রাচীর আছে। এই চাঁদ কাজি বৈষ্ণবদিগের উপর অনেক প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ণ নাম মৌলানা সিরাজউদ্দীন। শুনা যায়, চৈতন্যদেব এই চাঁদ কাজিকে তাঁহার কংশ মামা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এই গোরটীর মধ্যস্থলে একটী অতি বৃদ্ধ ও অতি মোটা গোলক চাঁপার গাছ আছে। গাছটী ফুলে পরিপূর্ণ,—দেখিয়া মনে হয়, গাছটী কোপরা হইয়া গিয়াছে। উহার একটী ডাল সোজা উঠিয়াছে, অপরটী হেলিয়া গোরের প্রাচীরের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। এরূপ বৃদ্ধ ও মোটা গোলক চাঁপার গাছ অন্য কোথাও দেখি নাই। এই গাছটী শত শত বর্ষ জীবিত আছে ও ঝড় তুফানে ইহার কোন ক্ষতি হয় নাই। এই গোরটী ও ইহার চতুঃপার্শ্বের জমি ৺কেদার নাথ দত্ত মহাশয়ের শিষ্যগণ মুসলমানদিগের নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু হিন্দু যাত্রিগণ এই গোরস্থানে প্রণামী দিয়া থাকেন বলিয়া, মুসলমানগণ তাহাদের অধিকার ছাড়িয়া দিতে চাহে না। চাঁদকাজির বংশধরগণ অল্প বয়স্ক ও তাহাদের অবস্থা হীন হইয়াছে। এই চাঁদকাজী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে—

এই মতে মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিত আইসেন গঙ্গাপথে॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পুণ্যকীর্ত্তি গায়॥
* * * *
নদীয়ার একান্তে নগর শিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু—উত্তরিলা গিয়া॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥

বামুনপুকুর গ্রামের প্রায় পশ্চিম প্রান্তে গ্রামের মুসলমান-দিগের প্রধান মোল্লা সাহেবের বাটী। বাটীর সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে একটী বড় উঠান। বাটীটি ইষ্টক-নির্ম্মিত, একতালা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই উঠানের দক্ষিণ দিকে উত্তরদ্বারী একটী অতি বৃহৎ ও অতি পুরাতন দোচালা বাঙ্গালা ঘর আছে। উহার চারি দিকের দেয়াল ইটের। এই-রূপ আকৃতির একটী চণ্ডীমণ্ডপ উলায় মুস্তৌফী বাটীতে আছে, কেবল পার্থক্য এই যে, এই গৃহটীতে কোন সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাই। মোল্লা সাহেব এই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ও এই গ্রামে তাঁহারই জমিদারী বেশী।

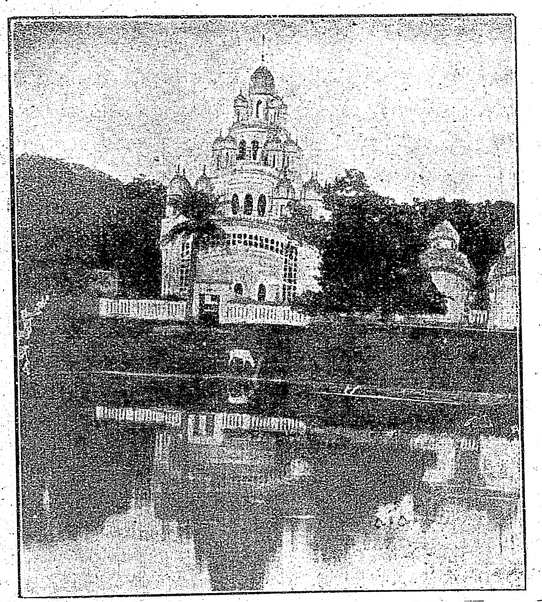

১৬। সুখড়িয়ার আনন্দময়ীর মন্দিরের অভগ্ন অবস্থার দৃশ্য

মোল্লা সাহেবের বাটীর কিছু উত্তরে এই গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ স্থান আছে; উহাকে "বল্লাল ঢিবি" বলা হয় (চিত্র নং ৭)। কথিত আছে এই বামুনপুকুর ও উল্লিখিত মায়াপুর ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলি এক্ষণে যথায় আছে, তথায় প্রাচীন নবদ্বীপ সহর ছিল। এই স্থানে বল্লালসেনের প্রাসাদ বা ঠাকুর-বাটীর ধ্বংসাবশেষ এই বল্লাল ঢিবি আজিও লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই প্রাসাদ বা ঠাকুরবাটী তথা সমস্ত নবদ্বীপ সহর জয় করার পর বিন্ বক্তিয়ার খিলিজী অগ্নি-সংযোগে নগর ধ্বংস করিয়া দিয়া চলিয়া যান; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই লাক্ষ্মণেয় এই প্রাসাদের পূর্ব্ব দিকের খিড়কী দ্বার দিয়া নৌকারোহণে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। এই উচ্চ ঢিবির আগাগোড়া ইট, পাথর ও মৃত্তিকার স্তূপ। ইহার স্থানে স্থানে পাকা গাঁথুনি দেখিয়া মনে হয়, তথায় মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে স্তম্ভাদি আছে। নবদ্বীপেই বাঙ্গালার কলঙ্ক সেই পণ্ডিতগণ থাকিত, যাহাদের গণনা বা প্রতারণা দ্বারা প্রতারিত হইয়া লাক্ষ্মণেয় বৃদ্ধ বয়সে বিনা যুদ্ধে শত্রু হস্তে রাজ্য তুলিয়া দিয়া পলায়ন করিলেন। এই প্রাচীন ঢিবির উপর দাঁড়াইয়া অতীত যুগের কত কথা মনে পড়িতে লাগিল।

বল্লাল ঢিবির উপরে উঠিলে, অল্প দূরে উত্তর দিকে ক্ষুদ্র গুড়গুড়ে নদী বহিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুড়গুড়ের অপর পারে পুরাতন শিমুলিয়া গ্রামের মাঠ।

উক্ত বল্লাল ঢিবির পশ্চিম ও উত্তর দিকে এবং বামুন-পুকুর গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গার পুরাতন খাদগুলি এক্ষণে চর হইয়া আছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই বিশাল চর খু খু

করিতেছে। বল্লাল ঢিবির পূর্ব্বাংশ কলিকাতার পাইক-পাড়ার রাজ-বংশের জমিদারী ও উহার পশ্চিমাংশ এই বামুন-পুকুরের মোল্লা সাহেবের জমিদারী।

এই বল্লাল ঢিবির সন্নিকটে গ্রামের মধ্যে একটী উচ্চ ও বৃহৎ শান বাঁধান দেবস্থান আছে। ঐ স্থানে শিমুলিয়া গ্রামের শিলাময়ী শিমুলিয়া দেবীকে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এই উচ্চ শান বাঁধান স্থানটীতে কয়েকটী শিলা-খণ্ড দেখিলাম। তাঁহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নাম আছে ও পৃথক পৃথক পূজা হয়।

পূর্ব্বে বেলপুকুর গ্রামটি এই বামুনপুকুরের উত্তরে অবস্থিত তারণবাস গ্রামের সংলগ্ন ছিল। বেলপুকুরের ব্রাহ্মণগণ ঐ গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বাস করায় ঐ স্থানের নাম পরে বামুনপুকুর হইয়াছিল।

এই বামুনপুকুর গ্রাম, ইহার দক্ষিণের বল্লাল দীঘি ও মায়াপুর গ্রাম এবং ইহাদের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামগুলি যে বিশাল ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত আছে, তথায় প্রাচীন নবদ্বীপ সহর ছিল। এই বল্লাল ঢিবি যথায় অবস্থিত তথায় রাজ প্রাসাদ ছিল। বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজা লাক্ষ্মণেয় সেনের সময় গঙ্গা এই প্রাচীন নবদ্বীপের পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত ছিল। একশত বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গা এই প্রাচীন নবদ্বীপের ভূমির তথা বল্লাল ঢিবির তলদেশ দিয়া উহার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত ছিল। এখন গঙ্গা সেই পশ্চিম দিক দিয়াই প্রবাহিত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রায় এক ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন নবদ্বীপ ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বঙ্গের ইতিহাসের অনেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। এই নবদ্বীপে বক্তিয়ারের হস্তে লাক্ষ্মণেয় সেন বিনা যুদ্ধে বাঙ্গালা দেশ তুলিয়া দিয়া পলাইয়াছিলেন। এই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য জীবের উদ্ধারের জন্য জন্মিয়াছিলেন ও হরিনামের বান ডাকাইয়াছিলেন। এই প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুরে বহু পণ্ডিত বাস করিতেন। এই স্থানেই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি লিখিয়াছিলেন ও রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়ের টীকা করেন। ইহার বহুকাল পরে এই নবদ্বীপের অদূরে পলাসী-প্রাঙ্গণে বঙ্গের ভাগ্যলক্ষ্মী মুসলমান নবাবকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই প্রাচীন নবদ্বীপের এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে খড়িয়া ও আর এক দিকে ওড়ওড়ে নদী প্রবাহিত থাকায় বর্ষাকালে চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইয়া স্থানটি দ্বীপে পরিণত হয়। আমরা বামুনপুকুর গ্রামটী দেখিয়া সন্ধ্যাকালে পুনরায় মায়াপুরে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে ঝড়ের ন্যায় বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। চারিদিকের মাঠ চন্দ্র কিরণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। আমরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে বাহির চন্দ্র কিরণে প্রবল বায়ুর মধ্যে বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া রাত্রে মায়াপুরের ঠাকুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম ও তথায় আহারাদি করিয়া রাত্রি বাস করিলাম।

বেলা প্রায় ৮ টার সময় আমরা নিজ নিজ দ্রব্যাদি স্কন্ধে ফেলিয়া পদব্রজে খড়িয়া নদী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা মাঠের রাস্তা ধরিয়া চলিবার পর, আমরা মহেশগঞ্জের সম্মুখে খড়িয়ার খেয়া ঘাটে নদী পার হইলাম। তাহার পর গাড়ী করিয়া কৃষ্ণনগর ষ্টেসন ও সেখান হইতে রেলে চড়িয়া উলা বীরনগরে উপস্থিত হইলাম।

সে রাত্রি উলায় বিশ্রাম করিয়া পর দিন প্রত্যুষের ট্রেণে চিত্রকর বন্ধুটীকে সঙ্গে লইয়া ব্যাণ্ডেলে উপস্থিত হইলাম। বেলা অনুমান ৯টার সময় হাওড়া হইতে কাটোয়া যাইবার ট্রেণ ব্যাণ্ডেলে উপস্থিত হইল। আমরা ঐ ট্রেণে চাপিয়া ব্যাণ্ডেল—কাটোয়া লাইনে চলিলাম। রেল লাইনের দুই দিকে কুঁচুই প্রভৃতি নানাবিধ কাঁটা গাছের ও লতার ঝোপ হইয়াছে,—অনেক স্থলে দুর্ভেদ্য জঙ্গল হইয়া আছে। ট্রেণ বাঁশবেড়ে ষ্টেশন ছাড়াইলে রেল লাইনের পশ্চিম দিকে একটী খাদ দেখিতে পাওয়া গেল,—উহা বন-জঙ্গল ও লতায় আচ্ছাদিত। ট্রেণের যাত্রীগণ কহিল যে, উহাই সরস্বতী নদীর শুষ্ক খাদ। এই স্থান হইতে কিয়দ্দূরে বঙ্গের প্রাচীন বাণিজ্য-বন্দর সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ আছে। ই, আই, রেলের ত্রিশ বিঘা ষ্টেসনে নামিয়া প্রায় ১৷৷০ মাইল হাঁটিয়া যাইয়া জঙ্গলাবৃত সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে আমরা ত্রিবেণী ষ্টেসন ছাড়াইয়া বেলা অনুমান ৯-৪৫ মিনিটের সময় বলাগড় ষ্টেসনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলাম। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত ষ্টেসনে লোক ছিল; আমরা তাঁহার সহিত রেল লাইন ধরিয়া শ্রীপুর অভিমুখে চলিলাম।

রেল লাইন ধরিয়া কিয়ৎদূর দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে যাইয়া

একটী ছোট মাঠের মধ্যে নামিলাম। মাঠ পার হইয়া শ্রীপুরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মুস্তৌফীদিগের এক বিশাল দীঘি। দীঘির উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে মুস্তৌফী বাটীর বেষ্টনী গড় আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। আমরা দীঘির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া ক্রমে মুস্তৌফী বাটীর দক্ষিণ প্রান্ত বেষ্টন করিয়া মুস্তৌফীদিগের বাটীতে প্রবেশ করিলাম।

শ্রীপুর অতি প্রাচীন গ্রাম। চৈতন্য দেবের সময় ইহার নাম আঁটি শেওড়া ছিল। মুস্তৌফী-বাটীর খিড়কীর

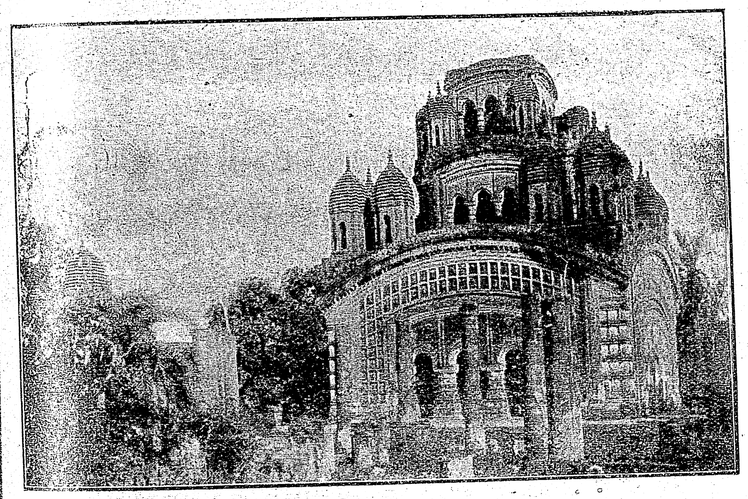

১৭। সুখড়িয়ার ভগ্নচূড় আনন্দময়ীর মন্দিরের দৃশ্য

মধ্যে একটী স্থান আজিও বর্ত্তমান আছে,—তথায় একটী কুঁচলিয়া বৃক্ষের নিম্নে চৈতন্য দেব বিশ্রাম করিয়াছিলেন। গ্রামটী পূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়ার প্রাচীন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ জমিদার দেবরায়দিগের সম্পত্তি ছিল। নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত উলার প্রাচীন জমিদার বংশের ৺রামেশ্বর মুস্তৌফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺রঘুনন্দন মুস্তৌফী শক্তি-উপাসক ছিলেন। তিনি সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় তিনি একজন বিখ্যাত গণক ছিলেন, ও হস্ত চালনা দ্বারা যে কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতেন। কথিত আছে, তিনি অষ্টম বর্ষীয়া যে কোন ব্রাহ্মণ বালিকাকে সম্মুখে রাখিয়া যে কোন প্রশ্নের মীমাংসা জন্য হস্ত চালনা করিতেন। সম্মুখে উপবিষ্টা ব্রাহ্মণ বালিকার হস্তে কাগজ কলম দেওয়া হইত। হস্ত-চালনার ফলে উক্ত ব্রাহ্মণ বালিকার লেখনী মুখে প্রশ্নের মীমাংসার স্বরূপ অপূর্ব্ব সংস্কৃত শ্লোক সকল নির্গত হইত। তিনি গণনা করিয়া বাহির করিয়াছিলেন যে, চৈতন্য দেব অবতার নহেন, খণ্ড অবতার নহেন। পরন্তু তিনি উচ্চ দরের সাধক মাত্র। তাঁহার সে শ্লোক আজিও প্রচলিত আছে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রঘুনন্দনকে নানা জটিল প্রশ্নের গণনার জন্য ঘন ঘন উলা হইতে কৃষ্ণনগরে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন। ইহাতে রঘুনন্দনের সাধনার ব্যাঘাত হইত। কিন্তু রঘুনন্দন কৃষ্ণনগরে যাইতে অস্বীকার করিতেও পারিতেন না; কারণ, তাঁহার জন্মভূমি ও স্বদেশ উলা গ্রামটী কৃষ্ণনগরের রাজ্যভুক্ত ছিল। এ দিকে গঙ্গা নদীও উলা ত্যাগ করিয়া বহু দূরে সরিয়া গেল! অগত্যা রঘুনন্দন সকল দিক ভাবিয়া, উলানিবাসী তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথক হইয়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীপুরে আসিয়া বাস করিবার জন্য বাঁশবেড়িয়ার জমীদার-বংশের নিকট হইতে ৭৫ বিঘা নিষ্কর ভূমি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ উলা ত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে আসিয়া যাহাতে কোনরূপ পার্থক্য অনুভব করিতে না পারেন, তজ্জন্য উলা হইতে রাজমজুর ও শিল্পী আনাইয়া, উলার মুস্তৌফী-বাটীর অনুকরণে গড়-বেষ্টিত বাটী, দীঘি, চণ্ডীমণ্ডপ ও দেবালয়াদি প্রস্তুত করাইয়া, অনুমান ১১২৫ সালে তিনি সপরিবারে উলা ত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তাঁহার বংশ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শ্রীপুরের মুস্তৌফীগণ উলার

মুস্তৌফী-বাটীর অনুকরণে সকল ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীপুর গ্রামটী সমস্তই এক্ষণে মুস্তৌফী-দিগের হস্তগত হইয়াছে।

শ্রীপুরে অনেকগুলি প্রাচীন দেবালয় আছে। সমস্ত-গুলি মুস্তৌফীদিগের। গ্রামটী বন-জঙ্গলময়। একটী বাজার আছে, তাহাতে নানা প্রকার দোকান আছে। গ্রামের নীচেই স্বচ্ছতোয়া গঙ্গা। গঙ্গার তীরে অনেকগুলি নৌকা প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে।

গড়বেষ্টিত মুস্তৌফী-বাটীতে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে কালী পূজার জন্য একতালা শ্যামা-ঘর। এই শ্যামা-ঘরের পূর্ব্বে কারুকার্য্যময় এক ষোড়া ভগ্ন পঞ্চচূড় শিব-মন্দির আছে (চিত্র নং ৮)। এই মন্দিরদ্বয়ের গাত্রে ইটের উপর নানা প্রকার লতা-পাতা ও পশু-পক্ষী খোদাই করা আছে। মন্দিরদ্বয়ের মধ্যের শিবলিঙ্গের নাম মাত্র সেবা হয়। এই শিবমন্দিরদ্বয়ের পশ্চাৎ দিকে কিঞ্চিৎ দূরে একটী ছোট একতালা সেকেলে গৃহ আছে, উহার ছাদ বিলান করা। ঐ গৃহ মধ্যে "বুড়া শিব" নামক একটী অতি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছেন (চিত্র নং ৯)। এই শিবলিঙ্গটী ৺রঘুনন্দন মুস্তৌফী স্বপ্নের নির্দ্দেশ মত এই স্থানে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রাপ্ত হয়েন। উল্লিখিত শ্যামা-ঘরের পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ঠাকুরবাটী আছে, উহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত।

ঠাকুরবাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে দ্বিতল তোরণ দ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ঠাকুরবাটীতে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে বিখ্যাত খড়ুয়া দোচালা চণ্ডী-মণ্ডপ। (চিত্র নং ১০) এই চণ্ডীমণ্ডপে যে সকল কাঠের থাম, আড়া, তীর প্রভৃতি আছে, তাহা সমস্তই কাঁঠাল কাঠের। এই কাঠের উপর উলার মুস্তৌফী বাটীর চণ্ডী-মণ্ডপের অনুকরণে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খোদাই করা আছে। উপরে মটকার সন্নিকটে নানা প্রকার ভঙ্গিমা সহ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা আছে। মণ্ডপের মধ্যে চালের নীচে চালটী ঢাকিবার জন্য রঙ্গীন বাঁশের কাঠীর চিক দেওয়া আছে। উহাতে সুন্দর ভাবে অতি সূক্ষ্ম বেতের সুতায় বাঁধন দিয়া বোনা আছে। এই বাঁশের চিকের আচ্ছাদনের নীচে লাল ও কাল বর্ণের তালের বাতা সাজান আছে। মণ্ডপের তিন দিকের দেওয়াল ইষ্টক-নির্ম্মিত ও উহাতে ইটের উপর খোদাই-করা নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ও লতাপাতা ইত্যাদি আছে। "Hooghly District Gazetteie" নামক গ্রন্থে এই মণ্ডপের কারুকার্য্যের সুখ্যাতি ও বর্ণনা আছে। কথিত আছে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণ আসিয়া আসল দ্বার ভ্রমে এই মণ্ডপের একটী নকল দ্বারে কুঠারাঘাত করিয়াছিল, সে চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে। এই চণ্ডীমণ্ডপে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। মণ্ডপের দক্ষিণে বৃহৎ পাকা নাটমন্দির ও উহার দক্ষিণে গোমঞ্চ আছে। নাটমন্দিরের পূর্ব্বে প্রশস্ত অঙ্গন আছে, অঙ্গনের পূর্ব্বে একটী শিবমন্দির আছে। এই অঙ্গনের উত্তরে শ্বেতবর্ণের রাসমঞ্চ বর্ত্তমান।

উক্ত চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চাতে অর্থাৎ উত্তরে প্রাচীর-বেষ্টিত একটী ঠাকুরবাটী আছে। উহার মধ্যে গৃহদেবতা ৺গোবিন্দজীউ নামক কৃষ্ণরাধা বিগ্রহের একটী মন্দির আছে (চিত্র নং ১১)। কথিত আছে, ইনি অতি জাগ্রত দেবতা। ইঁহার নিত্য পূজার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ইঁহার প্রতিষ্ঠা কালে উলার বাটীর গৃহদেবতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায় নৌকাযোগে শ্রীপুরে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীপুরের পূর্ব্বদিকে পাকা বারইয়ারীতলার চাঁদনীতে একটী শিবমন্দির ও একটী দোলমঞ্চ আছে। ইহার উত্তরে কিছু দূরে বাজার ও তদুত্তরে গঙ্গা প্রবাহিতা।

শ্রীপুর ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এবং জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও এখনও তথায় অনেক লোকের বাস আছে। গ্রামের লোকের অবস্থা ভাল নহে। গ্রামে ম্যালেরিয়া আছে, উহা দূর করিবার জন্য গ্রামবাসীদিগের কোন চেষ্টা নাই। এ স্থানের মুস্তৌফীদিগের অবস্থা এখন ভাল নহে, কিন্তু তাঁহারা গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের বাটীর পূজা পার্ব্বণের যেরূপ সুব্যবস্থা আছে, সেরূপ অন্যত্র সচরাচর দেখা যায় না। এ দিকে বাবুরা বনজঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্রের সহিত বাস করেন, ও ম্যালেরিয়ায় ভোগেন, তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা নাই; কিন্তু অন্য দিকে পূজা পার্ব্বণে বৃথা জাঁক জমকে অর্থ নষ্ট করিয়া থাকেন। সেই অর্থের কিয়দংশ যদি নিজ বাসভূমির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে প্রভূত উপকার সাধিত হইত।

আমরা সেই দিন বৈকালেই শ্রীপুর ত্যাগ করিয়া

রেললাইন ধরিয়া পদব্রজে নিকটবর্ত্তী সুখড়িয়া গ্রামাভিমুখে চলিলাম। শ্রীপুরের সন্নিকটেই সুখড়িয়া—ব্যবধান মাত্র ২ মাইল হইবে।

সন্ধ্যাকালে সুখড়িয়ায় আসিয়া আমার এক বাল্য-বন্ধুর মাতুলালয়ে আশ্রয় লইলাম। আমার বন্ধুটী ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এক্ষণে এই মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। সে রাত্রি বন্ধুগৃহে বাস করিয়া, পর দিন প্রত্যূষে গ্রামের প্রাচীন মন্দিরাদি দেখিতে চলিলাম।

সুখড়িয়া গ্রামটী বর্দ্ধমানের রাজাদিগের খামারবাটী ছিল। নদীয়া জেলার উলা গ্রামের জমিদার-বংশের ৺রামেশ্বর মুস্তৌফীর অন্যতম পুত্র ৺অনন্তরাম মুস্তৌফীর সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোমালিন্য হওয়ায়, অনন্তরাম স্বীয় ভ্রাতৃ-গণের সহিত পৃথক হইয়া, বিষয় বণ্টন করিয়া লইয়া, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সহ-ধর্ম্মিণী ও তদ্গর্ভজাত সন্তানগণকে লইয়া অনুমান ১১২৫ সালের পরে এই স্থানে গঙ্গাতীরে বাস করিতে আসেন। অনন্তরামের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ উলায় থাকিলেন। অনন্তরাম এই স্থানে আসিয়া অনন্তরাম নামক একটী বহুচক্রবিশিষ্ট অমূল্য শালগ্রাম শিলা ও শ্যামরায় নামক কৃষ্ণ-রাধিকা বিগ্রহ স্থাপন করেন। পরে তাঁহার বংশধরগণ অতি বিশাল জমিদারী অর্জ্জন করেন ও হুগলী জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার রূপে পরিগণিত হয়েন। ইহাঁদের প্রাচীন কীর্ত্তি—বহু দেবালয় এই গ্রামে আছে। অনন্তরাম মুস্তৌফী নবাব দরবারে বর্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্রের কোন একটী বিশেষ উপকার করিয়া তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লয়েন যে, তিনি যাহা চাহিবেন তাহা মহারাজাকে দিতে হইবে। পরে তিনি মহারাজাকে সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া মূল্য স্বরূপ ১০০১৲ মুদ্রা দিয়া এই সুখড়িয়া, হুগুই, গোপীনগর ও আর একটী গ্রামের মালেকী স্বত্ব আপন পুত্র তিলক-চন্দ্রের নামে খরিদ করিয়া লয়েন। গ্রামটী মহারাজা দান করিতে চাহিলে মুস্তৌফী দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া মহারাজাকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দেন। অগত্যা মহারাজা অনিচ্ছা সত্ত্বে বিক্রয় পত্র লিখিয়া দেন ও উক্ত বিক্রয় পত্রে স্বাক্ষর কালে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল। মহারাজা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও ভূমি বিক্রয় করি নাই, সর্ব্বপ্রথম আপনাকেই বিক্রয় করিলাম।"

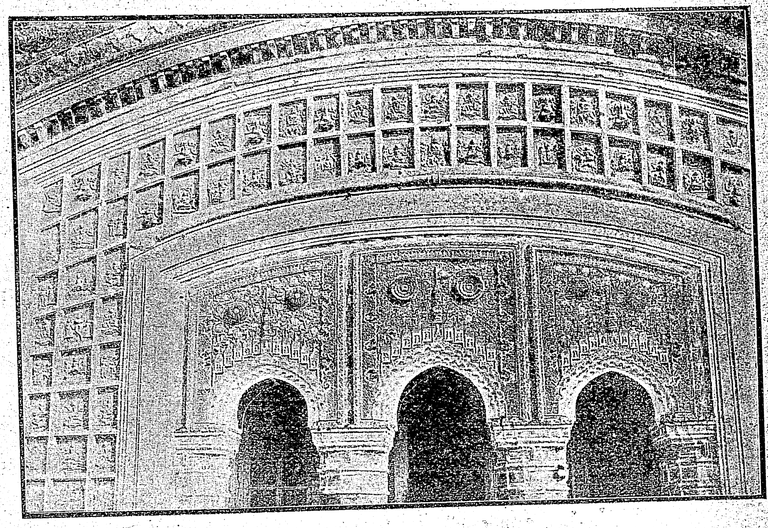

১৮। সুখড়িয়ার আনন্দময়ীর মন্দিরের সম্মুখের কারুকার্য্য

সুখড়িয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গড়-বেষ্টিত মুস্তৌফী-দিগের পুরাতন বাটী আছে। এই পুরাতন বাটীর উত্তরে গঙ্গা প্রবাহিত, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে গড়ের খাদ ও পশ্চিমে গাঙ্গুটীয়া নামক একটী খাল আছে। উহার সহিত গঙ্গার ও গড়ের সংযোগ আছে। এই গড়ের বেষ্টনীর মধ্যে বন-জঙ্গল ও তন্মধ্যে হর্ম্ম্য ও মন্দিরশ্রেণী অযত্নে ধ্বংস পথে চলিয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি প্রস্তুত করিতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। এখন আর উহাদের

প্রতি যত্ন নাই। নানা সরিকের সম্পত্তি হওয়ায় ও দৌহিত্রের দখল হওয়ায়, কারুকার্য্যময় বৃহৎ মন্দিরগুলি ও তন্মধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়া আছে।

গড়ের বেষ্টনীর মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার পশ্চিম পারে ৺হরসুন্দরী নাম্নী কালীর সুবৃহৎ মন্দির শোভিত পূজাবাটী আছে। মন্দিরটীর সম্মুখ ভাগে ইষ্টকের উপর যে কারুকার্য্য ছিল, তাহা এবং মন্দিরের ৯টী চূড়ার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ৫টী চূড়া ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ উঠান ও উঠানের মধ্যস্থলে বৃহৎ নাটমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উঠানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ৭টী করিয়া ১৪টী শিবমন্দির আছে; তন্মধ্যে দুইটী পঞ্চচূড়; অবশিষ্টগুলি একচূড়াবিশিষ্ট। শিবমন্দিরগুলির মধ্যে অসংখ্য কৃষ্ণ প্রস্তরের ছোট বড় শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরগুলির উপরে বন-জঙ্গল ও বৃহৎ অশ্বত্থ-বটের গাছ হইয়াছে। মন্দির মধ্যস্থ দেবতাগুলির নাম মাত্র পূজা হয়। এই সুবৃহৎ ঠাকুরবাটী দেওয়ান ৺রামনিধি মুস্তৌফী ১৭৩৫শকে প্রস্তুত করেন (চিত্র নং ১২)। এই মন্দিরের পশ্চিম ও উত্তর দিকে বাবুদের বিশাল সৌধশ্রেণী বন-জঙ্গলের মধ্যে দণ্ডায়মান আছে। কোন কোন বাটী জনপ্রাণীশূন্য।

গড়ের পশ্চিম দিকে গাঙ্গটীয়া খালের উপরে ৺নিস্তারিণী নাম্নী কালীর সুবৃহৎ পূজাবাটী। এই পূজাবাটী দুইভাগে বিভক্ত; যথা—সদর ও অন্দর। সদর অংশটী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—এই অংশে অতিথিশালা, দুর্গাপূজার দালান ও অনেকগুলি ঘর ছিল। অন্দরের অংশটী এখনও ভাল আছে—এই অংশের প্রাচীরের মধ্যে ৺নিস্তারিণী কালীর নবরত্ন-মন্দির আছে (চিত্র নং ১৩)। মন্দির মধ্যে পূর্ণ আয়তন ভীষণদর্শনা কালী মূর্ত্তি মর্ম্মরনির্ম্মিত এক বিশাল শ্বেতপদ্মের উপরে শায়িত শিবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা আছেন। দেবীর মস্তকে বৃহৎ রৌপ্য ছত্র ও তদুপরি একটী বৃহৎ রূপার পাতের চন্দ্রাতপ চারিটী রৌপ্য দণ্ডের উপর শোভা পাইতেছে। দেবীর মন্দিরের চারি কোণের কুঠারীতে এক একটী করিয়া শিবলিঙ্গ আছে। এই দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। দেবীর চক্ষের চাহনী দেখিলেই সজীব বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে, পূর্ব্বে একাধিক ব্যক্তি একাধিক বার এই দেবীকে রাত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিল। দেবী তাহাদিগকে সে কথা প্রকাশ করিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করেন ও প্রকাশ করিলে মৃত্যু নিশ্চিত জানান। কিন্তু তাহারা সে কথা প্রকাশ করায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দেবীর পূজার এখনও ভাল বন্দোবস্ত আছে। মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ পাকা নাটমন্দির আছে। মন্দিরের পশ্চাতে অর্থাৎ উত্তর দিকে শান বাঁধান ঘাট-যুক্ত একটী উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ বড় পুকুর আছে; কিন্তু উহাতে জল অতি কম। উহাকে নিস্তারিণীর পুকুর কহে। এই ঠাকুর বাটীর পশ্চিমে গাঙ্গটীয়া খালের উপরে একটী পাকা সেতু আছে, উহা সোমড়া ও সুখড়িয়াকে সংযুক্ত করিতেছে।

উক্ত নিস্তারিণীর পুকুরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটী বড় পুকুর আছে। উহা শুষ্ক। এই পুকুরের পূর্ব্ব-পাড়ে সুরেন্দ্রনারায়ণ বাবুর বিশাল সৌধশ্রেণী অযত্নে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ক্রমে উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া আমরা গঙ্গাতীরে আসিলাম। তথায় গঙ্গার উচ্চ তীরের পার্শ্বে একটী বিশাল বট-বৃক্ষের নিম্নে একটী খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট এক তালা গৃহে ক্ষুদ্র প্রস্তর নির্ম্মিত ৺সিদ্ধেশ্বরী কালী আছেন। এই মূর্ত্তিটী কোন যোগী পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর স্থাপন করিয়াছেন। যোগীর মৃত্যুর পর এক্ষণে মূর্ত্তিটী গ্রামের জমিদার বংশের আয়ত্তের মধ্যে আছে, কিন্তু ইঁহার পূজা হয় না বলিয়া মনে হইল—হইলেও তাহা না হইবার সামিল বলা যাইতে পারে। ৺সিদ্ধেশ্বরীর গৃহের পশ্চাতে গঙ্গার তীরে এক সারি তেঁতুল গাছ আছে; তাহাদের ডাল বা পাতা কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, স্থানীয় মাঝিগণ নৌকা প্রস্তুত করিবার জন্য তেঁতুল পাতা কাটিয়া লইয়া যায়। নদী-সৈকতে অনেকগুলি নৌকা প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে।

গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া পুরাতন বাটীর মধ্যস্থ ৺ অনন্তরাম মুস্তৌফী দ্বারা প্রস্তুত পুরাতন পূজার বাটী দেখিতে চলিলাম। সম্মুখে বৃহৎ সিংহদ্বার; তাহার উভয় পার্শ্বের গৃহগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। গৃহগুলির উপরে ও চতুর্দ্দিকে বন জঙ্গল হইয়া পড়িতেছে। সিংহদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে উঠান। এই উঠানের উত্তর দিকে একটী মহল ও দক্ষিণ দিকে আর

একটী অতি বৃহৎ মহল আছে। উত্তর দিকের মহলের মধ্যস্থলে উঠান ও ঐ উঠানের চতুর্দ্দিকে খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট একতালা ঘরের শ্রেণী আজিও দণ্ডায়মান আছে। এই মহলের উত্তর দিকের একতালা গৃহে ৺অনন্তরাম মুস্তৌফী ৺শ্যামরায় বিগ্রহ ও ৺অনন্তদেব নামক শালগ্রাম শিলা স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বিগ্রহদ্বয় পুরাতন মুস্তৌফী বাটীর বাহিরে ৺রাধাজীবন ওরফে একাদশী মুস্তৌফীর বাটীতে আছেন ও তথায় তাঁহাদের পূজা হয়। এই উত্তরের মহলের অন্য তিন দিকের গৃহশ্রেণী মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ বনজঙ্গলাবৃত হইয়া অযত্নে পড়িয়া আছে। দক্ষিণ দিকের বৃহৎ মহলটী দুর্গাপূজার বাটী। এই মহলের মধ্যস্থলে অতি বৃহৎ চৌকা এক উঠান আছে। এই উঠানের উত্তর দিকে দুর্গাপূজার সুবৃহৎ একতালা দালান (চিত্র নং ১৪) আছে এবং এই উঠানের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ হোমঘর। উঠানের অপর দুই দিকে বাবুদের বড় বড় বাড়ী, তাহাদের অধিকাংশই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। অপরাপর স্থানের মুস্তৌফীদিগের অপেক্ষা সুখড়িয়ার মুস্তৌফীদিগের অবস্থা ভাল বলিয়া বৎসর বৎসর দুর্গোৎসব হয় না, পূজার দালানটিও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বড় বড় বাবুরা সহরে বাস করেন—এ সকল তুচ্ছ বিষয়ে সময় নষ্ট করিতে পারেন না—বিশেষতঃ এ গুলি যখন একাধিক সরিকের ভাগের জিনিস।

পুরাতন বাটীর গড়ের বাহিরেই রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে জনমানবহীন একটী দ্বিতল বৈঠকখানা ও একটী একতালা ঠাকুর বাটীর গৃহশ্রেণী জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। এখনও গৃহগুলির ছাদ ও জানালা আছে এবং দেওয়ালে মস্থন পঙ্কের কাজ করা আছে। ডাকাইতের আক্রমণ নিবারণ জন্য সিঁড়ির উপরে চাপা দরজার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু লোক নাই। চারিদিকের বন জঙ্গল ও দারুণ নিস্তব্ধতার মধ্যে এই সকল হর্ম্ম্যশ্রেণী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া পথিকের মনে বিষাদ-কালিমা ঢালিয়া দিতেছে।

তৎপরে আমরা রাস্তার মোড় ঘুরিয়া একটী বৃহৎ প্রাসাদের সম্মুখে আসিলাম। ইহার মধ্যস্থলে একটী দ্বিতল বৈঠকখানা বাটী। উহার দক্ষিণ দিকের গাড়ী-বারান্দার সম্মুখে সুউচ্চ গোল স্তম্ভশ্রেণী শোভা পাইতেছে। এই বৈঠকখানা বাটীর পশ্চিমে অন্দর মহলের প্রাচীর বেষ্টিত দ্বিতল গৃহশ্রেণী। বৈঠকখানার দক্ষিণ দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে শান-বাঁধান উঠান ও উহার চতুর্দ্দিকে গৃহশ্রেণী। তন্মধ্যে উঠানের উত্তর দিকে দুর্গা-পূজার দালান ও পূর্ব্বদিকের একটী গৃহে ৺শিবমোহিনী নামক অষ্ট ধাতুর দুর্গা ও অপর একটী গৃহে প্রাচীন গৃহ-দেবতা ৺শ্যামরায় ও অনন্তদেব শিলা বিরাজমান। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদটি বিখ্যাত ৺ রাধাজীবন ওরফে একাদশী মুস্তৌফীর ত্যক্ত সম্পত্তি (চিত্র নং ১৫)। এই বিশাল সৌধশ্রেণী ও তৎসহ তাঁহার সুবৃহৎ জমিদারী এক্ষণে তাঁহার দৌহিত্রগণ ভোগ করিতেছেন। অত্যধিক কার্পণ্যের জন্য রাধাজীবনকে লোকে "একাদশী" বলিয়া ডাকিত।

এই প্রাসাদের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণে একটী জলপূর্ণ চৌকা পুকুর থাকায় একাদশীর বাটীর আরও শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পুকুরটির চতুর্দ্দিকের পাড় পাকা সিঁড়ি দিয়া আগাগোড়া বাঁধান ছিল; এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। এক্ষণে অযত্নে পুকুরটি নষ্ট হইতে চলিয়াছে। একাদশীর দৌহিত্রগণ বা তাঁহার জ্ঞাতিপুত্রগণ কেহই আর ইহার যত্ন করে না।

এই পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ে ৺বীরেশ্বর মুস্তৌফী কর্ত্তৃক স্থাপিত ৺ আনন্দময়ী ঠাকুরাণীর বৃহৎ ঠাকুরবাটী আছে। বীরেশ্বরের সন্তান না হওয়ায় তিনি এই আনন্দময়ী স্থাপন করিয়া ইহাকেই নিজ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিলেন। কথিত আছে, বীরেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার চতুর্থী শ্রাদ্ধের দিনে ৺ আনন্দময়ী ঠাকুরাণী বালিকা বেশে শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া ছিলেন। কেহ তাঁহাকে ঐরূপ ভাবে বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দেন "আমার পিতা বীরেশ্বরের চতুর্থী শ্রাদ্ধ করিব বলিয়া বসিয়া আছি।" এই বলিয়া দেবী অদৃশ্যা হন। এই ঠাকুরবাটীতে প্রবেশ করিলে উত্তরে ৺ আনন্দময়ীর মন্দির। ঐ মন্দিরের দক্ষিণে উঠানের মধ্যস্থলে বৃহৎ নাট-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ স্তম্ভশ্রেণী আজিও দণ্ডায়মান আছে (চিত্র নং ১৬।১৭।১৮)। এই ঠাকুরবাটীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে এক এক সারিতে ৬টী করিয়া ১২টী মন্দির আছে, তন্মধ্যে দুইটী মন্দির পঞ্চচূড় ও অপরগুলি একটী করিয়া চূড়াবিশিষ্ট। একটী পঞ্চচূড় মন্দিরে প্রস্তর নির্ম্মিত

গণেশমূর্ত্তি আছেন ও অপরগুলিতে শিবলিঙ্গ আছেন। উহাদের নাম মাত্র পূজা হয়। এই পূজা বাটীর আনন্দময়ীর বিশাল ও কারুকার্য্যখচিত মন্দিরের ন্যায় আর একটীও মন্দির এই অঞ্চলে অপর কোথাও নাই। গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের ও ৺ রামচন্দ্রের মন্দির, কালনার চৈতন্যদেবের ত্যক্ত মন্দির ও শান্তিপুরের ৺ শ্যামচাঁদের মন্দির এই ৺ আনন্দময়ীর মন্দিরের তুলনায় কি উচ্চতায় কি মন্দির গাত্রের নয়ন-বিমোহন কারুকার্য্যে সকল বিষয়েই নিকৃষ্ট। এই মন্দির পূর্ব্বে অতি উচ্চ ছিল ও ইহার ২৫টী চূড়া ছিল; ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ইহার শিখর দেশের ৫টী চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত আর উহা মেরামত হইল না। মন্দির-গাত্রে ইষ্টকের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য লতা পাতা, ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদাই করা আছে। সম্মুখে ভিতরের বারান্দার দেওয়ালে নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। চক্ষে না দেখিলে শুধু কাগজে কলমে এই মন্দিরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব। মন্দিরমধ্যে শিবের বক্ষোপরি এক প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি উপবিষ্টা আছেন—ইনিই ৺আনন্দময়ী। এখনও কায়ক্লেশে দেবীর পূজা হইতেছে।

আমরা ঐ দিন আহারাদির পরে দুই প্রহরের ট্রেণে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়া এবারকার ভ্রমণ শেষ করিলাম।

চিঠি

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস

আমার বাবু,

তোমার পত্র পে'লাম। সব কথা জান্‌তে চেয়েছ; কিন্তু লিখ্‌তে আমার কলম সর্‌ছে না। আমার জীবনের কথা কেউ জানে না, কাউকে বলি নি। ভেবেছিলাম, আমার নিজের কথা আমার নিজেরই থাক্; কিন্তু আজ তোমাকে সব জানিয়ে যা'ব।

ভূমিকা লি'খে পত্রখানা বেশী বাড়াতে চাই না; শুধু যে অশুভ মুহূর্ত্ত আমার জীবনচক্রের গতি এমন ভাবে ফিরিয়ে দি'য়েছে, সেই সময় হ'তে আরম্ভ ক'রে, সংক্ষেপে সব ব'লে যাই।

তখন আমার বয়স সবে চোদ্দ ছাড়িয়ে পনেরতে পড়েছে। জগৎ এবং দিনরাতগুলো চোখে একটু নূতন ঠেক্‌ছে। এম্‌নি দিনে, এক স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দাদার সঙ্গে একটি নূতন ছেলেকে দেখলাম। বয়স প্রায় ১৮।১৯; মুখখানি বেশ সরল, সুন্দর। দাদা তাঁকে বাড়ীর ভিতর এ'নে আলাপ করিয়ে দি'য়ে তাঁকে 'যামিনীদা' ব'লে ডাক্‌তে বলে দিলেন। তিনি বাবা এবং মা'র সঙ্গে কথা বলছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম, বেশ নম্র ও বিনয়ী। মা ও বাবা উঠে যা'বার পর, দাদা বললেন, "লতা, একটা গান গা' দেখি।" অনেক আপত্তি করলাম, কিন্তু কোন ফল হল না। গান শেষ হ'লে, যামিনীদা' "বাঃ, বেশ সুন্দর" ব'লে, প্রশংসমান দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের পানে তাকালেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, তবে আর একটা গান—।" দাদা বললেন, "তুমি লতাকে 'আপনি' ব'লে কথা বল্‌ছ কেন, যামিনী? 'তুমি' ব'ল।" তিনি একটু হে'সে বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হ'বে।"

পরের দিন, আমরা 'বোটানিকেল গার্ডেন'এ বেড়াতে গেলাম। যামিনীদা'ও সঙ্গে ছিলেন। দেখলাম, কোন একটা ফুলভরা লতা বা গাছ চোখে পড়লে, তাঁর দৃষ্টি আর অন্য দিকে ফিরছিল না; একবার লতামণ্ডপ বা কুঞ্জের মধ্যে গি'য়ে বস্‌লে সহজে আর উঠিতে চাইছিলেন না। প্রকৃতির কোথাও এতটুকু সৌন্দর্য্য দেখলেই তিনি এমন ভাবে চাইছিলেন যে, তাঁর সেই সুন্দর মুগ্ধ দৃষ্টি দেখ্‌তে, কি জানি কেন, বেশ ভাল লাগছিল। একসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিবার পথে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখনও ক'দিন আছেন?" যামিনী দাদা বললেন, "ঠিক্ নেই।"

পরের দিন, রাস্তার ধারের জানলাটার কাছে ব'সে বোধ হয় সেলাই করছিলাম; হঠাৎ চোখ ফেরাতেই

দেখলাম, যামিনীদা আসছেন। পরমুহূর্ত্তেই একটা খোঁড়া ভিখারী একটা শীর্ণকায় ছেলের হাতে ধরে যামিনীদা'র সাম্‌নে এ'সে ভিক্ষা চাইল। তিনি করুণ নয়নে একবার বুড়োটার, পরে ছেলেটার পানে চে'য়ে রইলেন। মুখ দে'খে বুঝলাম, বুকখানা তাঁর ব্যথায় ভরে এ'সেছে। ভিখারীটা তা'র হতভাগ্য জীবনের দু'একটা কথা ব'লে কেঁদে ফেললে। যামিনীদা'র বড় বড় চোখ দুটি জলে ভ'রে এ'ল। তিনি বললেন, "চুপ কর, কেঁদো না।" তার পর, একটা পকেট হ'তে কিছু পয়সা বে'র ক'রে, আর একটা পকেটে হাত দি'লেন; কিন্তু সে পকেটে কিছু ছিল না। তিনি ভিখারীকে সেই পয়সাগুলি দি'য়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গে'লেন। ভিখারীটাকে যা'বার সময় ব'লে গে'লেন, "আর কিছু নেই।" পরে আপনার মনেই ধীরে ধীরে বললেন, "ভগবান্ যা'কে মন দাও, তা'কে টাকা দাও না কেন?" সে কথাগুলো আমার কাণে এ'সে লাগল। সেদিন তাঁর কোমল হৃদয়ের অনেকখানি পরিচয় পেলাম।

একটু পরে দাদা ডাকলেন, "যামিনীকে এক কাপ চা দিয়ে যা লতা।" চা ও খাবার নি'য়ে গি'য়ে টেবিলে নামিয়ে দিয়ে দাদার চেয়ারের পাশে দাঁড়ালাম। তখন তাঁদের কি কথা হচ্ছিল। দাদা বললেন, "রমণ ছেলেটা কি নীচ দেখেছ, যামিনী।" যামিনীদা' বললেন, "সব কথা ভাল ক'রে না জে'নে কারও উপর একটা মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। আর সত্যই যদি তা' হয়, তবে এখানে ব'সে তা'র চর্চ্চা কল্লে কি হ'বে, বলুন?" দাদা বললেন, "কিন্তু—"যামিনীদা' বললেন, "থাক্‌গে; কি দরকার পরচর্চ্চা ক'রে! আসুন না, তার চেয়ে এই পত্রিকাটা পড়লে ঢের বেশী কাজ হ'বে। কিন্তু, তার চেয়েও ভাল হয়, লতা যদি একটা গান গায়।" এই ব'লে তিনি কথাটাকে ফিরিয়ে দিলেন।

দাদা আমাকে গান গাইতে বললেন। আমি বল্লাম, "এখন থাক্, আমার গলাটা বড় ধ'রে আছে।" দাদা বললেন, "সে আমি জানি; গান গাইতে বললেই গলা ধ'রে যায়। একটু গান শিখেছে ব'লে, মাটিতে আর পা পড়ে না। জান যামিনী, ও নিজের গানে নিজেই মোহিত হ'য়ে যায়; ভাবে, না জানি কত সুন্দরই গায়।"

যামিনীদা' বললেন, "সে ত ভগবানের দেওয়া বর। জানেন না, সেই একটা গল্প আছে?" দাদা বললেন, "কি শুনি?" যামিনীদা' বললেন, "ভীমের এক দিন, কি জানি কি অদ্ভুত খেয়াল হ'য়েছিল। তিনি তাঁর গদা ফেলে দি'য়ে এক পুকুরের ধারে বসে গান করতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে, একটা ধোবা এ'সে জিজ্ঞাসা করল, 'এইখানে আমার গাধাটার চীৎকার শুনছিলাম, সে গাধাটা গে'ল কোথা?' ভীম বুঝতে পারলেন যে, তাঁরই গানকে গাধার চীৎকার ভে'বে ধোবাটা সেখানে এ'সেছে। তাঁর যে গলা খারাপ, তা' তিনি নিজেও বুঝতেন; কিন্তু সেদিন ধোবার কথা শু'নে তিনি ভগবানের কাছে গি'য়ে, রাগে দুঃখে বললেন, "আজ থেকে আমার গলা এম্‌নি ক'রে দিতে হ'বে, যেন লোকে শুনলেই মুগ্ধ হয়।" তখন ভগবান একটু হেসে বর দিলেন, 'আজ হ'তে প্রত্যেকে নিজের গানে মুগ্ধ হ'বে।' ভীম সেইখানে ব'সেই গান ধরলেন—কেমন শু'নায়, দেখবার জন্য। ভগবানের বরে নিজের গান তাঁর নিজের কাণে খুবই ভাল লাগল। ভীম খুসী হ'য়ে চ'লে গেলেন। সেই দিন হ'তে প্রত্যেকের নিজের গান নিজের কাণে খুবই ভাল লাগে।" তার পর আমার দিকে চেয়ে হে'সে বললেন, "তাই ব'লে ভেবো না, আমি তোমাকে কিছু বল্‌ছি, তোমার গান সত্যই খুব সুন্দর!"

সে'দিনের সন্ধ্যাটা এমনি নানা গল্পে, হাস্য পরিহাসে বেশ কেটে গেল। দেখ্‌লাম, তিনি এক আধটু লঘু পরিহাসপ্রিয়, কিন্তু বেশ সংযত। অনেকক্ষণ গল্প ক'রে, চেয়ার হ'তে উ'ঠে যামিনীদা' বললেন, "আজই আমি চ'লে যা'ব।" মনটা কেমন ক'রে উঠল। ভাবলাম, এ' ত স্বাভাবিক,—এক দিনের আলাপ হ'বার পরও কেহ যদি যায়, তবে এমনটা হ'য়ে থাকে।

যামিনীদা'র সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত এ'সে দাঁড়ালাম। দাদা তাঁকে নি'য়ে রাস্তায় নামলেন। হঠাৎ, একটা লোক গ্যাস জ্বালাবার মই দি'য়ে অসাবধানতা বশতঃ যামিনীদা'কে ধাক্কা দিল। তিনি কোন রকমে নিজেকে সাম্‌লে নিলেন, না হলে ভীষণ ভাবে রাস্তার উপর পড়তেন। দাদা ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে লোকটাকে

মারতে গেলেন। যামিনীদা' তৎক্ষণাৎ দাদার হাতটা ধরে ফেলে বললেন, "আহা, উদ্ধত হ'চ্ছেন কেন? ঔদ্ধত্য আমি ভালবাসি না। লোকটা কি আর ইচ্ছা ক'রে আমাকে ধাক্কা দিয়েছে? লে'গে গে'ছে ত' আর কি হ'বে? আসুন, দেখ্‌ছেন না লোকটা ভয়ে ও লজ্জায় কেমন জড়সড় হয়ে উঠেছে।" পরে, সেই লোকটার দিকে ফিরে বললেন, "যাও হে, যাও; কিন্তু রাস্তায় একটু দে'খে শু'নে, ধীরে যা'বে, বুঝলে?" "যে আজ্ঞে, আমার বড় অপরাধ হ'য়ে গেছে; এবারের মত মাপ করুন" ইত্যাদি বলতে বলতে, লজ্জায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে, প্রণাম ক'রে, যামিনীদা'র দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা চ'লে গে'ল। বুঝলাম, প্রহারের চেয়ে এতেই তা'র বেশী শিক্ষা হ'য়েছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে এতক্ষণ যামিনীদা'র দিকে চেয়ে ছিলাম। "আচ্ছা, আসি তবে, লতা" ব'লে তিনি চলে গেলেন।

বসবার ঘরে গি'য়ে বসলাম। মনটা বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হল। ভাবলাম, ইহা ত' স্বাভাবিক; একলা ঘরে ব'সে থাকলেই মন এমন হয়। উঠে পড়লাম। হঠাৎ চেয়ারের পায়ের কাছে একটা রুমাল নজরে পড়তেই, তুলে নিয়ে দেখলাম—যামিনীদা' ফেলে গেছেন। চাকর দি'য়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিবার জন্য দরজা পর্য্যন্ত এ'সে ভাবলাম, একটা রুমাল বই ত' নয়, তা' আর পাঠিয়ে দিতে পারি' না। কিন্তু পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত;—না, থাক্‌গে, ভারী ত' একটা রুমাল, কে আর পাঠায়, থাক্ আমার কাছেই। সে'টা আমার কাছেই রে'খে দিলাম।

তার পর, অনেক দিন কে'টে গে'ছে। এক দিন নিজের ঘরে ব'সে পড়'ছি—হঠাৎ যামিনীদা' ঘরে ঢুকলেন। কেমন হ'য়ে গেলাম, বল্‌তে পারি না; অভ্যর্থনা পর্য্যন্ত করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "কবে এ'লেন?" "কাল রাত্রিতে,—সব ভাল ত'?"

তার পর, প্রায় প্রতি দিনই এসে দাদার সহিত নানা প্রকার আলোচনা করতেন। পাশে ব'সে শুনতাম, মাঝে মাঝে যোগও দিতাম। প্রতি দিনই ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে, মনটা বিকেলের কোন একটি সময়ের জন্য আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকত। বিকেলে যদি যামিনীদা' না আসতেন, তবে ভাবতাম, সন্ধ্যার সময় নিশ্চয় আসবেন। কিন্তু সন্ধ্যাতেও না এলে মনটা কেমন হ'য়ে যেত। মনে হ'ত, তা' হ'লে চলে গেছেন বোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর মন কেমন আড়ষ্ট হয়ে যেত। নিজের উপর কেমন সন্দেহ হ'ল। মনের অন্ধ্র রন্ধ্র পর্য্যন্ত চেয়ে দেখে ভাবলাম—'তাই ত'!

তার পর দিন যামিনীদা' এসে' দাদার সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করলেন। ঠিক করলাম, সে ঘরে যাব না; কিন্তু মিনিট কয়েক পরে নিজের অজ্ঞাতসারেই কি করে সেখানে উপস্থিত হ'লাম! তখন যামিনীদা' বলছিলেন, "আচ্ছা, লোকে উপন্যাস, গল্পের সমালোচনা করে, 'এটা ভাল, সেটা ভাল নয়'; তা' না হয় চলে, কিন্তু 'এমন চরিত্র হয় না কিম্বা এমন মন হয় না' এ কি বলা চ'লে? জগতে যত মানুষ আছে, তত রকমের মন আছে। সমালোচক কি অন্তর্যামী ভগবান যে, তিনি সব মনের খবর রাখেন? আমি সব থেকে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, যখন কেহ নিজের সঙ্কীর্ণতা দিয়ে অন্য জিনিস বিচার করে এবং যা' হো'ক একটা মতামত প্রকাশ ক'রে দে'য়।" দাদা বললেন, "কিন্তু প্রত্যেকের নিজের একটা মতামত আছে ত?" যামিনীদা বললেন, "যারা ভাবে না, বোঝে না, দেখে না, হঠাৎ একটা মতামত প্রকাশ করে, তাদের মতামতের মূল্য কি? আর এক রকমের লোক আছেন, তাঁরা একখানা বহি পড়লেন,—পরে কেহ অবজ্ঞার হাসি হাসলেন,—কেহ বিজ্ঞের মত মুখ বিকৃত করলেন,—কেহ বললেন, দূর ছাই, এখানা আবার এখানা বই,—কেহ বললেন, এমন প্লট বেরিয়ে গেছে। এই সমস্ত বলতে হয় তাই বলেন,—এটা তাঁদের স্বভাব। কিন্তু লেখক কি বলতে চান, কোন দিক দিয়ে দেখাতে চান, তাহার ধার দিয়েও যান না। অথচ তাঁদের অভিজ্ঞতাও অতি যৎসামান্য। সে সব লোকের সমালোচনার কিছু মূল্য নাই। যদি কোন দিন কোন বহির সমালোচনা করেন, তবে সমস্ত খুঁটিয়ে দেখে শুনে, গোঁড়ামি ছেড়ে দিয়ে, (unprejudiced হ'য়ে) সব দিকে চেয়ে, সমালোচনা করবেন। কিন্তু, আজ উঠি, বড় বেশী রাত্রি হ'য়েছে।" দাদা বললেন, "আচ্ছা, কিন্তু, আজ এখানে খে'য়ে যাও, যামিনী।" আমার মনটা বেশ খুসী হ'য়ে উঠ্‌ল; বলে ফেললাম, "সেই

ভাল।" প্রথমে যামিনীদা' একটু আপত্তি করে, শেষে খেতে রাজী হলেন।

খেয়ে, বাইরের বারান্দায় এলেন। দাদা বললেন, "দাঁড়াও যামিনী, আমি গেঞ্জিটা গা'য়ে দিয়ে আসি, তোমাকে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত এ'গিয়ে দিয়ে আসব।" বলে নিজের ঘরে গেলেন। তখন জ্যোৎস্না উঠেছে। যামিনীদা' কোন কথা বললেন না; কিন্তু দু'জনে এমন চুপচাপ্ দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। শুধু এই নীরবতা ভাঙ্গবার জন্য বললাম, "দেখ্‌ছেন, ঐ কালো মেঘটা কেমন মজার দেখাচ্ছে? মাঝখানটা জমাট কালো, কিন্তু চারিধারগুলি চাঁদের আলোতে কেমন রূপালী হ'য়ে উঠেছে?" তিনি শুধু "বেশ সুন্দর" ব'লে চুপ করিলেন। মহা মুস্কিল! দাদাও আসছেন না, অথচ যামিনীদা' আবার চুপ করলেন। বারান্দায় একা দাঁড় করিয়ে রেখেও যাওয়া যায় না; অথচ এমন চুপচাপ্ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও কেমন বিশ্রী ঠেকছিল। তাই আবার বললাম, "আচ্ছা, আপনি ত' খুব মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন? বলুন ত', ওই পাখীটা চুপ ক'রে ব'সে কি ভাব্‌ছে? ও বোধ হয় ভাব্‌ছে, এমন যদি চাঁদের আলো, তবে আবার ওই মেঘের টুক্‌রোটা কেন! কেমন, এই নয়?" এই ব'লে, আল্‌সের ওপর দু'টো নিশাচর পাখীর পানে তাঁ'র দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, "তুমি একজন কবি, দেখ্‌ছি!" "ওমা! আমি আবার কবি হ'লাম কি ক'রে? আমি যে কখনও কবিতা লিখি নি।" এই বলতেই তিনি বললেন, "তোমার বড় ভুল ধারণা, দেখ্‌ছি। তুমি যেমন বললে, এমনি ক'রে যা'রা বলে, ভাবে,—তারাই কবি; তবে, ছন্দে ফুটিয়ে তু'লে লেখাটা, শুধু অভ্যাস।" তার পর, কিছুক্ষণ পরে, পাখী দুটোর পানে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক বলেছ, লতা, পাখী দু'টো হয় ত তাই ভাব্‌ছে। হাঁ, তুমি দেখ্‌ছি একজন কবিও বটে। বাঃ, সব দিকেই সুন্দর; তাই ত' এত ভাল লাগে" এই বলেই তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। কথাগুলো আমার কাণে মধু ঢেলে দিল; মনটা তৃপ্তিতে ভ'রে গেল। নিজের প্রশংসা শুনলে সবারই তৃপ্তি হয়; কিন্তু অন্য কোন মুখ হ'তে শুনলে যে এ'র শতাংশের একাংশও হ'ত না। লজ্জায় আমার মুখ, কাণ, রাঙা হবার সঙ্গে সঙ্গে, মনটা আরও বেশী রাঙা হ'য়ে গেল।

দাদা এ'সে বললেন, "চল যামিনী।" হঠাৎ, মনে হ'ল কবে যা'বেন, জান্‌তে পারলাম না ত? চলে যাওয়ার কথা মনে হ'তেই মনটা কি জানি কেমন খারাপ হ'য়ে গেল। শেষে ভাবলাম, কিন্তু কোন কথা যখন বলে গেলেন না, তখন নিশ্চয়ই এখনও থাকবেন। তা' না হ'লে, নিশ্চয় ব'লে যেতেন। একটা তৃপ্তির দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ল। দাদা বললেন, "যামিনী, চল।" "হাঁ চলুন, আসি লতা।" তার পর যামিনীদা' ঘুরতেই, কতকটা চাঁদের আলো তাঁর মুখে পড়ল। এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ্য করলাম, তেমন সুন্দর মুখখানি কেমন শুষ্ক ও পাংশু হ'য়ে গেছে। বুকের কোথায় ব্যথা ফুটে উঠ্‌ল। মনটা কেমন একটু বিঁধে উঠ্‌ল। ভাবলাম, জিজ্ঞাসা করি, এত শুষ্ক, এমন কাহিল দেখাচ্ছে কেন? কোন অসুখ হ'য়েছিল কি না? যদি না হয়েছিল, তবে এমন কেন? কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও ত' বের হ'ল না! শু'য়ে শুয়ে ভাবলাম, তাঁকে এতটুকু শুষ্ক দেখ্‌লে এমন ব্যথা হয় কেন? এম্‌নি আরও কত কি! তখন খুব গরম পড়েছিল কি না মনে নাই, তবে সেদিন রাত তিনটা পর্য্যন্ত ঘুমুতে পারি নি।

পরের দিন, সকাল হ'তেই শরীরটা খারাপ ছিল। বিকেলে যামিনীদা এ'সে দাদাকে বললেন, "চলুন, একটু ইডেন গার্ডেনে বেড়িয়ে আসি।" দাদা বললেন, "চল;—লতাও যাবি না কি?" যা'বার মত অবস্থা আমার ছিল না; কিন্তু সেই সঙ্গসুখটুকুর আশা ছাড়তে পারলাম না। বললাম, "চল।"

এধারে সেধারে কতক্ষণ বেড়ালাম। ব্যাণ্ড থেমে গেল। তিনজনে প্যাগোডার কাছে ব'সে গল্প আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণ পরে পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে তিনটি ছোকরা যাচ্ছিল, তা'দেরই দিকে চেয়ে দাদা বলে উঠ্‌লেন, "আরে বিনয় যে?" যামিনীদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?" দাদা বললেন, "আমারই এক পুরানো বন্ধু, অনেক দিন দেখা হয় নি; বস, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি।" এই বলে উঠে গেলেন।

যামিনীদা' একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন।

বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল। এমন জায়গায়, এমন সন্ধ্যেয়, এমন নির্জ্জনে, এত কাছে! কিন্তু তবু! তিনি একটু বিশেষ সুরে ডাকলেন, "লতা!" তাঁর মুখের দিকে চেয়েই, চোখ নামিয়ে নিলাম। কিন্তু তিনি আর কিছু বললেন না। জুতো দিয়ে মাটিতে আঁচড় দিতে লাগলেন। ভাবলাম, কি বল্‌বেন? কিন্তু, আমি ত' ওঁর মনের খবর কিছুই জানি না। তিনিও কি—? আচ্ছা, যদি তা' না হ'বে, তবে আমার চোখের উপর তাঁর চোখ যখন পড়েছে, তখন তা'তে অমন দৃষ্টি কেন? আজ এইমাত্র যে শুধু ডেকে চুপ্ করলেন; তা'তে অমন বিশেষ স্বর কেন? আরও কত দিনের অসংখ্য 'খুঁটিনাটি।' কিন্তু, কোন দিন কিছু প্রকাশ হয় নাই! 'লতা' বলে ডেকে চুপ্ করলেন; কিছু বললেন না। কি বলতে চান? মুখে অমন বিশেষ ভাব কেন? তবে কি—? রক্ত দ্রুত চলাচল হ'তে আরম্ভ হ'ল, কিন্তু নিশ্বাস চাপা হয়ে পড়তে লাগল। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা সঙ্কুচিত, প্রসারিত হতে লাগল। ভাবলাম, হাত ধরে জিজ্ঞাসা করি, কি বলিতে চাও, বল। লজ্জা কেন? কিন্তু, তা' বুঝি কেউ পারে! শুধু বললাম, "কি বল্‌ছিলেন?" তিনি কেমন চম্‌কে উঠে বললেন, "ওঃ, কিছু না; তোমার শরীর কেমন আছে?" আমি বললাম "ভাল।" বুঝলাম, অন্যমনস্ক আছেন। একটু পরে ডাকলেন "লতা!" আবার গলার সেই স্বর! আমার কাছে একটু সরে এ'লেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখ্‌লাম, দাদা বলতে বলতে আসছেন, "বড় দেরী হ'য়ে গেল,—অনেক দিন দেখা হয় নি;—চল, এবার বাড়ী ফেরা যাক্।"

প্রতি দিনের কথা ব'লে, আর চিঠি বাড়িয়ে তোমাকে বিরক্ত করব না, কিন্তু মন যে আমার কোথায় গিয়ে পৌঁছল, সে কথাটা কি এ'র পরও আর খুলে বল্‌তে হ'বে? কিন্তু, এক দিন সন্ধ্যেয় আমার হুঁস হ'ল,—এ আমি কচ্ছি কি? শুনলাম, মা বাবাকে বলছেন, "মেয়ে যে পনরও ছাড়িয়ে চল্ল, তা'র ঠিক আছে? বাবা বললেন, "তুমি কি ভাব্‌ছ, আমি নিশ্চিন্ত আছি?"

শরীরটা বুঝি সেদিন সারাদিনই খারাপ ছিল। বিছানায় গিয়ে শু'য়ে পড়লাম। এ আমি কচ্ছি কি? সত্যই ত—বিবাহ বন্ধনে না বাঁধা হ'লে ত' তেমন ক'রে পাওয়া যায় না! তবে কেন? দুষ্ট ঘোড়ার মত যেমন আমাকে এত দিন এমন ক'রে টেনে নিয়ে গেছে,—আজ তা'র লাগাম ধ'রে ফিরাবার জন্য হাত বাড়ালাম,—কিন্তু তা'র সন্ধানও পেলাম না। চাবুকের উপর চাবুক লাগালাম, কিন্তু সে শুধু স্তব্ধ ভাবে নিশ্চল হ'য়ে রইল, কোন ফল হ'ল না; হ'ল শুধু লক্ষ জায়গায় ক্ষত-বিক্ষত।

যাক্, আর বেশী বাড়াব না; শেষ ক'রে ফেলি। কিছু দিন পরে শুনলাম, কোথাকার এক অরুণ প্রকাশের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক্ হ'য়েছে। তিনি নিজে একদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসে দেখে গেলেন। পছন্দ হ'ল; তাঁর বন্ধুবান্ধবদের পরীক্ষাতেও পাশ হ'য়ে গেলাম। বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে গেল।

তার পর এক দিন বাড়ী সাজান হল, সানাই বাজল, ব্যাগপাইপ বাজল। পরের দিন বাবা আমাকে একটা নির্জীব, জড় পদার্থের মতই টেনে নিয়ে গিয়ে সেই অরুণ প্রকাশের হাতে জন্মের মত সঁপে দিলেন। তিনি হ'লেন আমার স্বামী—আমার সমস্ত দেহ-মনের একমাত্র অধিকারী! আর আমি হ'লাম, তাঁর চোখে তাঁর স্ত্রী; কিন্তু নিজের চোখে, একটা দ্বিচারিণী!

আচ্ছা, বিয়ে ত' আমার, কিন্তু আমাকে কেহ ত একটা কথাও—। ওঃ! আমাদের যে কোন মতামত থাক্‌তে নেই—মেয়ে মানুষ যে জড় পদার্থ। ঠিক্! তা'র বাইরে যাওয়া যে বেহায়াপনা—বিলিতি ঢং! তাও ত বটে! ঠিক্!

পরের দিন শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্য যখন গাড়ীতে উঠ্‌লাম, তখন শরীর ও মনের আড়ষ্টতা একটু একটু করে কমতে লাগল। এই কয়দিন যে কেমন আচ্ছন্ন ভাবে কেটে গিয়াছিল, তাহা বুঝতে পারি নি।

স্বামী দিন দিন আমায় খুব ভালবাসতে লাগলেন। ভাবলাম, যৌবন সমাগমে আমার দেহ যত পরিপূর্ণ হচ্ছে, তাঁর ভালবাসাও তত বাড়ছে। (আমার এই পাপ চিন্তার যে কোন হেতু ছিল না, তা' নয়; আমি দু' একটা এমন দেখেছিলাম।) কিন্তু আমি আমার স্বামীকে একেবারে ভুল বুঝেছিলাম। তাঁকে তখন চিন্‌তে পারি নি; পরে বল্‌ছি।

মন সদাই অশান্তিতে থাকত। যামিনীদা'র কথা মনে এলেই তা' জোর ক'রে তাড়িয়ে দিতাম। স্বামীকে প্রাণপণে ভালবাস্‌তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন অশান্তিতে ভ'রে রইল। নিজেকে দ্বিচারিণীর চোখে দেখে সমস্ত শরীর আমার র'য়ে র'য়ে শিউরে উঠ্‌ত। বিবেকের দংশনে, রাত্রিতে স্বামীর আলিঙ্গন হ'তে অনেক দিন নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছি; কিন্তু এক দিন রাত্রে, কিসের মোহে, কোন দুর্ব্বলতার বশে, দেহটা তাঁর আলিঙ্গনে সমর্পণ করলাম। সকালে উঠে নিজেকে আমার অসহ্য লাগল; নিজেকে এত অপবিত্র, ঘৃণিত মনে হ'ল, গ্লানিতে আকণ্ঠ এমন পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল—তোমরা কা'কে 'গণিকা' বল?

তার পর, বুঝি বা এক দিন ভগবানের কৃপায় গুরুতর জ্বর হ'ল। অনেক দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। সেই অজ্ঞান অবস্থায় বিয়ের কথা, যামিনীদার কথা, সব বলেছিলাম এবং এই দ্বিচারিণীর মত জীবন-যাপনের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলাম। স্বামী সব শুনেছিলেন; সব বুঝেও ছিলেন। জ্বর ভাল হ'লে, এক দিন তিনি ডেকে বললেন, জ্বরের ঘোরে তোমার মুখ দিয়ে যা' বের হ'য়েছিল, তা সত্য?" স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম, একটা কথাও মুখ দিয়ে বে'র হ'ল না। বিকৃত স্বরে তিনি বললেন, "তবে কেন তোমার যামিনীদা'র পায়ে প'ড়ে বল নাই, ওগো একটু স্থান দাও! যাও আমার সাম্‌নের থেকে। আমার সমস্ত শরীর মন অপবিত্র—।" তাঁর আর কথা বে'র হ'ল না। তাঁর বুকখানা একবার ফুলে ফুলে উঠ্‌ল। মুখখানা দৃঢ় এবং ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌ল।

পরের দিন, স্বামীর জিদে শাশুড়ী বাবাকে লিখলেন, 'বৌমাকে কিছু দিনের জন্য নিয়ে যান; সময় হ'লে আন্‌ব।'

বাবা যে'য়ে আমাকে এইখানে নিয়ে এসেছেন; কিন্তু আমি ত জানি, আমার আবার সেখানে ফিরে যাবার সময় আর বোধ হয় কখনও আসবে না।

এখন শুধু আমার স্বামীর কথা ভেবে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই। কি দৃঢ়, সংযত মন! কি আশ্চর্য্য আত্মসংযম! এমন অবস্থায় কত স্বামী, স্ত্রীকে খুন্ করেছে শুনেছি; কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। আসবার দিনে কি বললেন; শুন্‌লে হয় ত বিশ্বাস করবে না;—বললেন, "এমনি যদি হ'য়েছিল, তবে বিয়ের আগে তা' বল নি কেন? আপনা হ'তে বল্‌তে পার নি, নয়? কিন্তু বলা ত' উচিত ছিল। তাহ'লে আজ দুজনে এমনি ক'রে মাটি হ'য়ে যে'তাম না। কিন্তু থাক্। আমার কোন কথা প্রকাশ করবার দরকার হ'বে না। আর, আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিতাম না; তবে আমি যে ক'টা দিন এখানে আছি, সেই ক'টা দিন বাপের বাড়ী গি'য়ে থাক; তার পর আমি একটা কাজ নিয়ে আফ্রিকা চলে যাবার পর, মায়ের কাছে আবার ফিরে আস্‌বে।"—বিশ্বাস করতে পারলে না, বোধ হয়? কিন্তু সে কথা থাক্। এই ত' আমার এইটুকু জীবনের এত বড় কথা। চিঠিটা প'ড়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে তাচ্ছীল্য ক'রে ছিঁড়ে ফেলো না; অবসর মত একবার ভে'বো।

আচ্ছা, আসি।—আর একটা কথা,—আমি আর বেঁচে থাক্‌তে পারছি না। নিজেকে শেষ ক'রে ফেল্‌ব, শীঘ্র,—এটা কাব্য নয়; সত্যই পারছি না। আমার স্বামী যদি দেবতা না হ'য়ে মানুষ হ'তেন, তবে ত' সেইদিনই তিনিই সব শেষ ক'রে দিতেন; কিন্তু নিজেকেই নিজের শেষ করতে হ'বে—দেখছি। আমি ভাল ক'রে জানি, এ'তে তুমিও 'না' করবে না! কিন্তু তার আগে যদি—কোথায় আমার জীবনে ভুল বা অন্যায় হ'য়েছিল, তখন কি করা উচিত ছিল এবং এখনই বা কি আর করা উচিত—এই কথাটা জানাতে পার তবে জানিয়ো। আমার জেনে যেতে বড় ইচ্ছা ক'রে।

আচ্ছা, আসি ভাই রাণী; এই হয় ত চিরবিদায়। আর কি লিখব। চিরসুখী হ'ও।

তোমার বাল্যবন্ধু—লতা

বিজ্ঞান ও সভ্যতা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি

মানব-সভ্যতা সেই দিন হইতে প্রকৃত রূপে আরম্ভ হইল, যে দিন সে ধাতু ও প্রস্তরের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে সমর্থ হইল। আজকাল এই ব্যাপারটা নানারূপে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন কালে যে ভাবে অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইত, আধুনিক কালে আর সে ভাবে করা হয় না। এক্ষণে নানা প্রকার তৈল ও গ্যাসের দ্বারা আমরা আলোক জ্বালি। এই তৈল ও গ্যাসই মানব-সভ্যতাটাকে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। আজ-কাল 'গ্যাসোলিনের' সাহায্যে মানবজাতি জলে, স্থলে ও আকাশে অবলীলাক্রমে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই খনিজ তৈলের অত্যধিক ব্যবহারে ইহার অনাটন হইয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত এই তৈলের জন্য জগতে আবার জাতিতে জাতিতে মনোমালিন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে পরিমাণে এই তৈল সমগ্র জগতে খরচ হইতেছে, তাহাতে আর বোধ হয় বিশ ত্রিশ বৎসর মাত্র ইহা পাওয়া যাইবে। পরে ইহার নূতন কোন খনির আবিষ্কার না হইলে ইহার শেষ এইখানেই হইবে। তখন মানবকে পুনরায় অন্য উপায় খুঁজিতে হইবে। এখন হইতেই ইহার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অনেক দেশ এখন হইতেই খনিজ তৈল ত্যাগ করিয়া উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির তৈল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। Dr. Diesel কৃত তৈল-ইঞ্জিন সকল এখন অনেক দেশে এইরূপ তৈলের দ্বারা চালিত হইতেছে। কার্পাস-বীজ-তৈল, আফ্রিকাদেশের তাল জাতীয় বৃক্ষের তৈল, এবং চীনাবাদামের তৈল দ্বারা অধুনা অনেক জাহাজ চালিত হইতেছে। ইহার পরে আমাদের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপর শ্বেতজাতিদের বিষম টান পড়িবে; কারণ, এই সকল উদ্ভিজ্জ তৈল তাহাদিগের দেশে বড় পাওয়া যাইবে না। তখন যে দেশে যত কার্পাস ও চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়, সেই সকল দেশের উপর তাহাদের দৃষ্টি পতিত হইবে; আর এই সকল দেশ লইয়া পুনরায় বিভিন্ন জাতি মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। আজকাল এই কেরোসিন তৈল লইয়া সে গণ্ডগোলটা বেশ চলিতেছে। তাহার প্রমাণ 'মঞ্চুল' দেশ। এই মঞ্চুল দেশ তুরস্কজাতি ইংরেজদিগকে দিতে নারাজ, আর ইংরেজরাও ইহা বেহাত করিতে নারাজ। ইহার

গীমাংসার ফল যে কি হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। পারস্য দেশের তৈলের খনির উপরও আমেরিকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রাচীন সভ্যতা ও অসভ্যতা হইতে আধুনিক সভ্যতা কিসে উন্নত। কি হিসাবে আধুনিক মানবজাতি তাহাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা বড়। প্রাচীন কালে মানবদিগের যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, এখন বোধ হয় সেরূপ নাই; কিন্তু তথাপি, আধুনিক মানব তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত। তাহার কারণ, আধুনিক মানবজাতি তাহার আয়ত্তের মধ্যে পাঁচ সহস্র বৎসরের পুরাতন জ্ঞান-ভাণ্ডার পাইয়াছে। এই সঞ্চিত জ্ঞানই তাহার উন্নতির কারণ,—ইহাতে তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতাও বাড়িয়াছে। প্রাচীন কালে দৈহিক শক্তিতে যাহা সম্ভবপর হইত না, আজ আমরা ক্ষুদ্রকায় হইয়াও কলকব্জার সাহায্যে তাহা করিতে সমর্থ। যুগ-যুগান্তরের জ্ঞানের সমাবেশে আজ আমরা এঞ্জিন, মটর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সমর্থ। আজ কাল আমরা কত দ্রুত কত দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারি; আমাদের দেশের খবর অপর দেশে কত শীঘ্র পাঠাইতে পারি। ঘরে বসিয়া দূরস্থ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারি। এ সকলের মূলে কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। যে সকল ধাতু হইতে কলকব্জা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, এ সকল বস্তুই রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হয়। রসায়ন শাস্ত্র হইতেই কাগজ, কালী, অক্ষর প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া পুস্তকাকারে জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চয় করিতেছে। এস্থলে এই ভাষার বর্ণ আবিষ্কারের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। এই বর্ণ আবিষ্কারটা বড়ই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। প্রায় সকল দেশেই ইহার মূল ভিত্তি একই রূপ। কেবল প্রাচীন মিশর ও আধুনিক চীন দেশের অক্ষরগুলি অন্যরূপ। প্রাচীন মিশরের অক্ষরগুলি কেবলমাত্র নানাবিধ চিত্র। আর চীনদেশের অক্ষরে আমাদিগের ন্যায় স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া কিছুই নাই। এই দুইটী ব্যতিক্রম ভিন্ন জগতের প্রায় সকল ভাষার বর্ণের ভিত্তি একই রূপ। কথা হইতেছে, কোন্ জাতি এই সকল অক্ষরের সামঞ্জস্য করিল। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে কেবলমাত্র প্রাচীন Phoenician জাতিই ইহার আবিষ্কারক। তাহারা অত্যন্ত বাণিজ্যপ্রিয় জাতি ছিল, এবং সেই কারণে, তাহাদিগকে নানা জাতির সহিত মেলামেশা করিতে হইত। নানা দেশের নানা ভাষায় আপন আপন ব্যবসায়ের হিসাবপত্র লিখিবার অসুবিধা বিবেচনায় তাহারা আপন ভাষার প্রায় সহস্রাধিক অক্ষর কমাইয়া কেবল মাত্র একুশটী চলিত অক্ষর রাখিল। ইহাতে তাহাদিগের হিসাবপত্র লেখা অতি অল্পের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যাইত। ইহাই সকল জাতির ভাষাবর্ণের মূল ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই Phoenician জাতির পতনের পর য়ুরোপে 'ভেনীস্' দেশবাসী ইতালীয়রাই বড় ব্যবসাদার জাতি হইয়া উঠিয়াছিল। যখন প্রাচীন জার্ম্মানির হুন্ জাতি ইতালি-দেশ অধিকার করিয়া বসিল, তখন হইতেই ইতালীয়-বাসীরা পলাইয়া নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ সকলে বসবাস করিতে লাগিল। সেই কারণ তাহারা ভেনীসে আসিয়া পড়াতে দেখিল যে, তথায় কোনও বনজঙ্গল নাই, কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্য জন্মে না, কোনও প্রকার ধাতব পদার্থও নাই,—চারিধারে কেবল সমুদ্ররাশি, বালুকারাশি ও সমুদ্রের মৎস্য। তখন এই সমুদ্র হইতেই তাহারা মৎস্য ধরিয়া, সমুদ্রজল হইতে প্রস্তুত লবণের দ্বারা রক্ষিত করিয়া রাখিতে শিখিল, এবং বালুকারাশিকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহা হইতে কাচ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। পরে তাহারা এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া দিল। এই ব্যবসায়ের নিমিত্ত তাহারা নৌকা ও জাহাজ প্রস্তুত আরম্ভ করিল; এবং কালে তাহারা তাহার সংরক্ষণ জন্য বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত ভেনীস প্রাচীন কালে অতি বলশালী নৌশক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত তাহাদিগের দেশের প্রস্তুত কাচের আদর সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে Columbusএর আমেরিকা আবিষ্কারে বহির্গমন বা Vasco da Gamaর ভারতবর্ষের দিকে আগমন—ইহাদের সকলেরই মূলে কেবল একটি মাত্র বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা কেবল নানাজাতীয় মশলার অন্বেষণ। তৎকালে য়ুরোপে মশলার মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল। এই মহার্ঘ বস্তুর জন্য তাহারা অনেক অর্থ-ব্যয় করিত। এ সকল দ্রব্য তখন একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই

য়ুরোপে রপ্তানি হইত। এই নিমিত্ত য়ুরোপীয় সকল জাতিরই দৃষ্টি আমাদের দেশের উপর নিপতিত হইয়াছিল। এ বিষয় লিখিতে গেলে একখানা বৃহৎ ইতিহাসে পরিণত হয়। রবার জাতীয় Caoutchouc'এর জন্য বেল্‌জীয়ন জাতি Congo দেশের বালকদিগের হস্ত সকল কাটিয়া দিয়াছিল। এইরূপ নৃশংস ব্যবহার তাহারা Putamayo দেশবাসীদিগের উপরও করিয়াছিল। কিন্তু আজকাল রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে এই দ্রব্য কত প্রস্তুত হইতেছে। রাসায়নিকেরা যদি এই দ্রব্য কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আবিষ্কার করিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় জগতে ঐরূপ নৃশংস ব্যবহার হইত না। রাসায়নিকেরা জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে পারিলে, জগৎ হইতে অনেক নৃশংস ব্যাপার তিরোহিত হইয়া যায়; অনেক দ্বেষ-হিংসা কমিয়া যায়। তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকার জন্য জগতে অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে। তাহাদিগকে অতঃপর দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন কাল হইতেই জগতের সভ্যতাটা রসায়ন শাস্ত্রের উপরই স্থাপিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র মনুষ্যের বাহ্যিক ব্যবহারের দ্রব্যাদি রসায়ন শাস্ত্র আবিষ্কার করিত; কিন্তু আজকাল তাহারা মনুষ্যের শরীরাভ্যন্তরেও দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা জ্ঞাত হইয়াছে যে, অতি সামান্য বস্তুর তারতম্যে জীবদেহের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে। এই কড্ মাছের তৈলের 'Vitamin A' নামক পদার্থ যদি সূচ্যগ্রভাগ পরিমাণে নিয়ত কোন ইঁদুরছানাকে ভক্ষণ করান যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার পোষ্টাই অতি শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে। অতি সামান্য পুষ্পরেণুর সারাংশ (protein) পদার্থের সাহায্যে একটা গাছকে দ্রুত বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়; কিন্তু ঐ পদার্থ যদি সামান্য পরিমাণে মনুষ্য নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করান যায়—তাহা হইলে তাহাকে হাঁচিতে-হাঁচিতে অস্থির হইতে হইবে। Adrenalin নামক পদার্থ, যাহা মানব-দেহের মূত্রাশয়ের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে পাওয়া যায়, তাহার ৩৩০,০০০,০০০, ভাগের এক ভাগ মাত্র মনুষ্যদেহের ত্বকে প্রবিষ্ট করাইলে তাহার অসাধারণ গুণের ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ মাংসপেশীর ঝিল্লির উপর দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের মস্তিষ্ক-মধ্যে pituitary gland নামক যে গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে hormone নামক এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। উহা অপেক্ষা আরও অল্প-মাত্রায় দেহে প্রবিষ্ট করাইলে এই পদার্থের আশ্চর্য্য গুণ লক্ষিত হয়। আমাদের শোণিতের মধ্যে সামান্য অম্ল বা ক্ষারের ইতর-বিশেষে প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। কত প্রকার রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা মানব-দেহে কতরূপ যে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যায়, তাহার আর সংখ্যা নাই। এই ধরুন না কেন, যদি বেশ খোষ-মেজাজে স্বপ্ন দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, আফিং, গাঁজা, strychnine, hashish প্রভৃতি দ্রব্যাদি নানা ভাবে সেবন করিলে, ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

ইদানীং জীবাণুতাত্ত্বিকগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে, অনেক জীবাণু আছে, যাহারা মূলে একই জাতি, কেবল মাত্র বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে বসবাস করিতে করিতে তাহারা নানাবিধ আকার ধারণ করে। তাহাতে আমরা ভুলক্রমে তাহাদিগকে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি বলিয়া মনে করি। ইহার একটা উদাহরণ দিতেছি। এই azotobacter নামক জীবাণু নানা অবস্থায় নানা ভাবে জন্মগ্রহণ করে। কখনও বা তাহারা গোলাকার, কখনও বা লম্বাকৃতিবিশিষ্ট, কখনও বা ক্ষুদ্রকায়, কখনও বা তাহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ মাত্রায় বৃহৎ; এই প্রকার নানা রূপ আকার তাহারা ধারণ করে। ইহারা আবার কখনও কখনও এরূপ স্বচ্ছ ও পিচ্ছিল ভাব ধারণ করে যে, তাহাতে করিয়া তাহাদিগের গাত্র কোনরূপ রঞ্জন-দ্রব্যাদির দ্বারা রঞ্জিত করা যায় না। ইহাতে microscope সাহায্যে তাহাদিগকে চিনিতে পারা দুষ্কর হয়। আবার কখনও বেশ সুন্দর কঠিন ভাব ধারণ করে। ইহারা যেন বহুরূপী। পীড়া উৎপাদনকারী অনেক জীবাণু আছে, যাহারা অনেক সময় ঐরূপ হয়; যেমন প্লেগ, কলেরা, ডিপ্‌থিরিয়া, anthrax (ইহার দ্বারা মারাত্মক ক্ষত উৎপন্ন হয়) প্রভৃতি ব্যারামের জীবাণুগণ নানা অবস্থায় নানা ভাব ধারণ করে। ভূমির মধ্যে যে সকল জীবাণু পাওয়া যায়, তাহারাও নানা স্তরে বাস করিতে করিতে নানা রূপ ধারণ করে;—অথচ মূলে তাহারা একই জীবাণু। উপরিউক্ত কারণে অধুনা জীবাণু-তাত্ত্বিকগণের

নিকট জীবাণুদিগের আচার-ব্যবহার বা গঠন দেখিয়া তাহাদিগের জাতি-নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Aristotle বা Linnaeusএর সময় হইতে জীবজন্তু ও গাছপালাদিগকে তাহাদের দৈহিক গঠন ও আচার-ব্যবহার হিসাবে পৃথক করা হইত। পূর্ব্বে রসায়নবিদ্‌গণও এইরূপে কেবলমাত্র তাহাদের স্ফটিকাকৃতি হিসাবে খনিজ-স্ফটিক দ্রব্যাদির শ্রেণীবিভাগ করিতেন। কিন্তু আজকাল আর সেরূপ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় না। এক্ষণে রাসায়নিক বিশ্লেষণে যেরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ হিসাবে তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। কালে জীবাণুতাত্ত্বিকগণকেও এইরূপ হিসাবে জীবাণুগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে ইহা বেশ উপলব্ধি হইয়াছে যে, দেহের মধ্যে অতি সামান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির তারতম্যে জীবগণের স্বভাব ও আকৃতির পার্থক্য ঘটে। কালে ইহাই দাঁড়াইবে যে heredity বা বংশাবলীর ধারা বলিয়া কিছুই থাকিবে না; যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেইরূপ সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করিতে পারিবে,—যথা মোটা, রোগা, ফরসা বা কাল, লম্বা বা বেঁটে প্রভৃতি। মনুষ্যদেহ মধ্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যাইবে যে, কে প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে, বা কে মূর্খ হইবে, বা কে ভীরু হইবে।

অধুনা রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা আমাদিগের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অনেকটা বাড়িয়াছে। কালে এই রসায়ন-শাস্ত্রই জীবগণের জন্ম-মৃত্যুর কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইবে। যেমন কোন ভাস্কর যখন কোন একটা মূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে আপন করতলগত করিয়া রাখে,—যাহা মন চায় তাহাই করিতে পারে। তদ্রূপ রসায়ন শাস্ত্রও মানব-জন্মটাকে আপন অধিগত করিয়া ফেলিবে,—দেহের গঠন ও চরিত্রের উপর আপন ক্ষমতা জাহির করিয়া রাখিবে। এখন রাসায়নিক অনেক পদার্থের, যেমন, মদ্য, অহিফেণ, কোকেন প্রভৃতির, অনিষ্টকর গুণ আমাদের জানা আছে; ইহাতে সমাজের ও সভ্যতার কেবলমাত্র অনিষ্টই ঘটিতেছে। কিন্তু কালে যখন কোন অমৃতরূপ উপকারী পদার্থের আবিষ্কার হইবে, তাহাতে হয় ত লোকে অজর অমর হইলেও হইতে পারিবে। আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদের ইহাই প্রকৃত "রসায়ন"। প্রাচীনকালে আর্য্য-ঋষিগণ যাহার অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ইদানীং রসায়নবিদেরাও তাহারই অন্বেষণ করিতেছেন। ইহার পথও অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। অধুনা আমরা জ্ঞাত আছি যে, মনুষ্যের যে সকল সদ্‌গুণ আবশ্যক, যেমন সুশ্রী হওয়া, সাহসী হওয়া, অমায়িক হওয়া, মিষ্টভাষী হওয়া, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি,—যাহার দ্বারা আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি,—তাহার মূলে কেবলমাত্র মনুষ্য-দেহজাত hormone নামক রাসায়নিক পদার্থ নিহিত রহিয়াছে। মানব-দেহের গলার পার্শ্বের দুইটী গ্রন্থির আকারের তারতম্যে তাহার স্বভাবেরও তারতম্য ঘটে। এই গ্রন্থিকে ইংরেজীতে Thyroid gland কহে। ইহার আয়তন বৃহৎ হইলে মানবগণ অতিশয় ক্রোধী হয়, এবং ইহার আকার ক্ষুদ্র হইলে মানবগণ অতিশয় বিমর্ষভাবাপন্ন হয়। বানরের গলা হইতে এই গ্রন্থি তুলিয়া আজকাল মানবদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া য়ুরোপে ডাক্তারগণ অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পুনরায় যুবাভাবাপন্ন করাইয়া দিতেছেন। সম্প্রতি কানাডা দেশ হইতে Insulin নামক এক প্রকার পদার্থ আমাদিগের পেটের ভিতরকার Pancreas নামক যন্ত্র হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ডাক্তারগণ বহুমূত্র ব্যারাম একেবারে আরোগ্য করিয়া দিতেছেন। এই ঔষধ আমাদিগের দেশে এখনও বহুল পরিমাণে প্রচার হয় নাই। মানবদেহে ইহার গুণ আশ্চর্য্য রকমের। ইহা মানবদেহে প্রবিষ্ট করাইলে শোণিতের শর্করা একেবারে কমাইয়া দেয়। তাহাতে প্রস্রাবের সহিত আর শর্করা বহির্গত হয় না। কিন্তু ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে প্রাণে একরূপ মজার আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে হয় যেন, প্রাণে আর সাহস নাই, যেন আর বেশী দিন বাঁচিব না, প্রভৃতি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখে একটিমাত্র ছোট লজঞ্চুস রাখিলে প্রাণ হইতে সে আতঙ্ক তিরোহিত হয়। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অতি সামান্য পরিমাণে শর্করা যদি দেহের শোণিতের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্য ভীরু না হইয়া সাহসী হয়। যখন কোন লোক কাহারও সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার দেহে adrenalin নামক পদার্থ অধিক পরিমাণে বহির্গত হইতে থাকে, এবং এই কারণে শোণিতেও শর্করার অংশ অধিক হয়। ইহাতে সে ব্যক্তি অধিক বলশালী ও সাহসী হইয়া কার্য্য করিতে পারে। গাছেতে

এক প্রকার উকুনের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ধরে। ইহাদের যদি অধিক পরিমাণে শর্করাঘটিত দ্রব্যাদি খাওয়ান যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের দেহে এত তেজ হয় যে, শীঘ্রই তাহাদিগের গাত্রে ডানা গজাইয়া উঠে, এবং তাহার দ্বারা তাহারা উড়িতে পারে। কিন্তু মদ্য খাওয়াইলে তদ্রূপ হয় না। মনুষ্য দেহে এই মদ্যের গুণ বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন। মদ্য মনুষ্যের মস্তিষ্কের উপর কার্য্য করে। এই কারণে, তাহার আপন কার্য্যের উপর কোন ক্ষমতা থাকে না, হাত পা টলিতে থাকে; এবং মনের কপাট খুলিয়া গিয়া মুখ দিয়া ভাষারূপে বহির্গত হইতে থাকে। এই মদ বা alcoholও একটী রাসায়নিক পদার্থ মাত্র। অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাহার গুণে আপনারা চমৎকৃত হইয়া যাইবেন। সচরাচর চলিত অনেক বস্তুর গুণ আপনারা জ্ঞাত আছেন, যেমন, ক্লোরোফরম, কোকেন, মর্ফিয়া, veronal প্রভৃতি। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না, মনুষ্যের এইরূপ অবস্থা করা যাইতে পারে, যাহার দ্বারা তাহার আলোক সহ্য করিবার ক্ষমতা একেবারেই তিরোহিত হইবে। মনুষ্যের ত্বকে সামান্য পরিমাণে Hematoporphyrin নামক পদার্থ প্রবিষ্ট করাইলে, সে যদি বাটীর বাহির হয়, তাহা হইলে আলোক লাগিয়া তাহার মৃত্যু ঘটিবে; এমন কি মেঘলার দিনেও তদ্রূপ হইবে; কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকিলে কিছুই হইবে না।

বিজ্ঞানের কৃপায় মনুষ্য আজ জীবজন্তুর পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা আভ্যন্তরিক ভাবে সামান্য সামান্য রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগের আকারপ্রকারের বিভিন্নতা সম্পাদন করিতেছে। জলের মধ্যে অল্প পরিমাণে magnesium chloride মিশ্রিত করিয়া তাহাতে মৎস্য ডিম্ব ফুটাইলে, সেই মৎস্যের দুই পার্শ্বে দুইটী চক্ষু না হইয়া মস্তকের মধ্যস্থলে একটীমাত্র চক্ষু ফুটে। আমেরিকার শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক Child সাহেব ভ্রূণের মধ্যে নানাবিধ বৈদ্যুতিক স্রোত, আলোক, তেজ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জীবগণের গঠনাকৃতির পরিবর্ত্তন ভ্রূণের মধ্যে সম্পাদিত হইতে পারে। তিনি বলেন যে, অতি বিশালকায় বা অতি ক্ষুদ্রকায় বা নানারূপ অদ্ভুতাকৃতি জীব-জন্তুর সৃষ্টি করা বিশেষ কঠিন নহে। প্রাচীন কালে আমরা যেরূপ মনুষ্যের বিবরণ পড়িয়াছি—যেমন একচোখো, রাক্ষসাকৃতি বা বিকটাকৃতি, প্রভৃতি দানবদৈত্যের কথা;—তাহা অবিশ্বাস্য নহে। তৎকালীন পারিপার্শ্বিক গুণে ওরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। Allen এবং Doisy সাহেবরা মনুষ্য দেহের Hormone নামক পদার্থের আশ্চর্য্য গুণ দেখাইতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, জীবদেহে স্ত্রী-পুরুষ জাতিভেদ ইহারই দ্বারা সাধিত হয়। এই দ্রব্য সামান্য পরিমাণে স্ত্রীলোকদের দেহে প্রবিষ্ট করাইলে, তাহারা প্রেমোন্মত্ত হয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা ইঁদুরছানার দেহে ঐ দ্রব্য প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, তাহারা ঐ অপরিণত বয়সেই সহবাসের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। Goldschmidt (১) সাহেব বলেন যে, এই পদার্থের সমতুল্যতায় বা অপ্রতুলতায় স্তন্যপায়ী জীবজন্তু ও পক্ষীদিগের মধ্যে তাহাদের স্ত্রী-পুরুষ প্রকৃতির ভেদাভেদ হয়। পুরুষদেহে পুং-hormone, এবং স্ত্রীদেহে স্ত্রী-hormone অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ কেবলমাত্র সামান্য মাত্রায় দৈহিক পদার্থের নির্গমনের উপর নির্ভর করিতেছে। কালে এই রসায়ন-শাস্ত্র আমাদের লিঙ্গ ভেদ করিয়া দিতে পারিবে। এই শাস্ত্র এক্ষণেই ইহা প্রমাণ করিতেছে যে, আমাদের খাদ্যে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট Vitamin পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের দেহের পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে এবং ইহাতে মানবের নপুংসকত্ব আনয়ন করে (২)।

প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল জাতি তৎকালে বর্ত্তমান ছিল, এখন আর তাহারা নাই। ইহার মূলে হয় ত তাহাদিগের কোন খাদ্য পরিবর্ত্তন করার কারণ নিহিত রহিয়াছে, যাহাতে কোন প্রকার Vitamin পদার্থের অনাটনে তাহাদিগের প্রজনন-ক্ষমতার হ্রাস পাইয়াছে। রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা যে লিঙ্গের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহার দুই একটী উদাহরণ আপনাদিগকে দিতেছি। Edinburgh সহরের Dr.

(১) Mechanism and Physiology of Sex Determination—1923.

(২) Journal of Biological Chemistry, 58, 709—1924.

Crew সাহেব সম্প্রতি একটি পূর্ণায়তন মুরগীকে মোরগে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। Carnegie Station for Experimental Evolution নামক গবেষণা-ক্ষেত্রে Dr. Oscar Riddle সাহেব ঐরূপে একটী কপোতীকে পুং-কপোতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে, কালে বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের সভ্যতাটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে। যে দিন জগতের স্ত্রীলোকেরা পুরুষ-বিদ্রোহী হইয়া ঐরূপে আপনাদের স্ত্রীত্বের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিতে সমর্থ হইবে, তখন জগতের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? আজকাল আর বংশানুক্রমিক ধারা বলিয়া কিছুই নাই; একই বংশের লোককে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ভাবাপন্ন করা যাইতে পারিবে। এক্ষণে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে যাহার দ্বারা বংশানুক্রমে স্বভাব-চরিত্র আকৃতি প্রভৃতি সমভাবে রক্ষিত থাকে, তাহার মূলে কেবলমাত্র এক "Chromosome" নামক পদার্থ রহিয়াছে। এই পদার্থ জননকারীর বীজের মধ্যে থাকিয়া তাহা সম্পাদিত করে। ইহার পরিবর্ত্তন ঘটাইলেই দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তন সম্পাদন করা বিশেষ কঠিন নহে। এই chromosome পদার্থ সকল জীবেরই germ-cell মধ্যে আছে। ইহার পরিবর্ত্তনে বংশাবলীর ধারা একেবারে বদলাইয়া যাইতে পারে। ইহা কিরূপ ভাবে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার উদাহরণ দিতেছি। প্রথমতঃ গাছপালা ও জীবজন্তুর "কলম" করিয়া, অর্থাৎ কি না বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে কোন জাতির পরিবর্ত্তন সংঘটন করা। ইহার সত্যতা বোধ হয় আপনারা বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। এইরূপ প্রথাকে ইংরেজিতে বলে "biologically by eugenics"। দ্বিতীয়তঃ—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটন করা—যেমন দেহের মধ্যে নানাপ্রকার vitamin এবং hormone পদার্থ প্রবিষ্ট করাইলে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে।

এক্ষণে ডাক্তারগণ এইরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, আমাদের আর নানাপ্রকার বিস্বাদ ঔষধাদি খাইতে হয় না। মিছামিছি কতকগুলা বাহিক ধাতুঘটিত বা উদ্ভিজ্জাত ঔষধ দেহে প্রবিষ্ট না করাইয়া, দেহের মধ্যে যে বস্তুর অভাবে যে ব্যারাম হয়, তাহা প্রয়োগ করিলেই ভাল হয়। অবশ্য অনেক চিকিৎসক তাহাই করিতেছেন, এবং আজকাল তাঁহারা দেহের শোণিতের সহিত hormone, বা insulin, বা thyroxin, বা adrenalin প্রভৃতি দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া, কেবল মাত্র দৈহিক যে সকল বস্তুর অনাটন রহিয়াছে, তাহাই প্রবিষ্ট করাইতেছেন। ইহাতে শরীরাভ্যন্তরে যাহে কতকগুলা তিক্ত কটু কষায় প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রবিষ্ট হইতেছে না। ঐ সকল দ্রব্যকে ঔষধ না বলিয়া বরং খাদ্যদ্রব্য বলিলেও চলে। এই সকল স্বাভাবিক দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তনে নকল উপায়ে যখন তাহা প্রস্তুত হইবে, তখন হয় ত ইহাপেক্ষা অধিক গুণশালী দ্রব্যাদিরও আবিষ্কার হইতে পারে। তাহা দ্বারা মানব দেহের হয় ত আরও উন্নতি হইতে পারিবে, মানবগণের আকৃতি প্রকৃতিও হয় ত বিভিন্নরূপ হইতে পারে।

দার্শনিকেরা সময় ও স্থান (Time and Space) ব্যতীত কোনও চিন্তা করিতে পারেন না। কিন্তু ইহার সম্যক জ্ঞান উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই জ্ঞানের মূলে রসায়ন-শাস্ত্রের জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। এই ধরুন, যখন আমাদের কোন স্থানে চলিয়া যাইতে অধিক পরিশ্রম হয়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা অধিক স্থান চলিয়াছি; কারণ, এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এক ক্রোশ রাস্তা হাঁটিলে যে পরিশ্রম হইবে, দুই ক্রোশ রাস্তা হাঁটিলে তাহার অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম বোধ হইবে। তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে স্থানের দূরত্ব জ্ঞান আমাদের দৈহিক ক্লেশ অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। সময়েরও জ্ঞান আমাদের ঐরূপে হয়। বসিয়া বসিয়া পাঁচমিনিটকাল হাতুড়ি পিটিলে যেটুকু অবসাদ আসে, দশমিনিট কাল তাহা করিলে তাহাপেক্ষা অধিক অবসাদ বোধ হইবে। সুতরাং সময়ের মাপ ও জ্ঞান দৈহিক ক্লান্তি অনুভূতির উপরই নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, আমরা দৈহিক অবসাদ কেন অনুভব করি? রসায়ন-শাস্ত্র বলে যে, আমরা যখন কার্য্য করিতে থাকি, তখন আমাদের মাংসপেশী সমূহের মধ্যে lactic acid নামক পদার্থ বহির্গত হইতে থাকে। (৩) যত পরিমাণে ইহা রক্তের মধ্যে বহির্গত হইবে,

(৩) "Physiology of Muscular Exercise"—Brainbridge.

তত পরিমাণে মনুষ্য অবসাদ অনুভব করিবে। আমাদের হস্তপদাদির সঞ্চালনের দ্বারাই আমরা স্থানের অস্তিত্ব জ্ঞাত হই। এর প্রমাণ স্বরূপ amoeba নামক ক্ষুদ্র জীবাণুর বিষয় বলা যাইতে পারে। ইহা দেখিতে অনেকটা গোলাকার; এই জীবাণুর যে পারিপার্শ্বিক স্থানের কোনও জ্ঞান থাকিতে পারে তাহা অবিশ্বাস্য। তথাপি ইহারা স্থান পরিবর্ত্তন করে,—কিরূপে? ইহার বৈজ্ঞানিক যে প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাই বলিতেছি। ইহারা যখন স্থির নিশ্চল ভাবে জলের উপর ভাসিতে থাকে, তখন তাহাদের গাত্রের উপর সৎসামান্য মাত্রায় ঐ lactic acid জন্মায়। অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার দেহাভ্যন্তরের protoplasmic granuile গুলি দেহের মধ্য হইতে জল টানিয়া সেই স্থানে লইয়া আইসে। ইহাতে তাহাদের দেহের উপর যেন একটা হস্তপদ রূপ কিছু জন্মিল বলিয়া বোধ হয়, আর ইহার সাহায্যে তাহারা নিজ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অগ্রসর হয়। যখন এ lactic acid তাহার দেহ হইতে ফুরাইয়া যায়, অমনি আবার তাহারা স্থির নিশ্চল ভাবে ভাসিতে থাকে। ইহাতে অনেকটা অনুমান হয় যে, জীবজন্তুদিগের হস্তপদাদির আবির্ভাব বোধ হয় এইরূপে সংঘটিত হইয়াছে। ইহার মূলে বোধ হয় ঐ lactic acidএর সঞ্চয় রহিয়াছে। যদি স্থান ও সময়ের জ্ঞানটাও আমাদের রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রসায়ন শাস্ত্রটার মধ্যে গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যামিতির ভিত্তি রহিয়াছে। আর Einsteinএর Theory of four dimensional time-space continuumএর মূলেও ঐ রাসায়নিক পদার্থ অম্লজানের (oxygen) অনাটন রহিয়াছে। তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, জগতের ভিত্তিটাই ঐ lactic acid theoryর উপর স্থাপিত রহিয়াছে।

কালে এই সকল বৈজ্ঞানিক রহস্য যে পৃথিবীর সভ্যতাটাকে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিবে, তাহা বলা বড় কঠিন। এক্ষণে লোকে ইহাই ধারণা করিতেছে যে, যেরূপ ভাবে পৃথিবীর সকল জাতি আপন আপন নিধন কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত যে সকল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি বারুদের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে মানবজাতি আপন জ্ঞানজাত দ্রব্যাদির দ্বারাই আপনারা জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। বিজ্ঞানের ফল উপকারী যত, অপকারীও তত। এখনও যদি জগতের রসায়নবেদগণ ঐসকল মারাত্মক দ্রব্যাদির আবিষ্কার ত্যাগ করিয়া জীবনী রসায়নের আবিষ্কারে মনোনিবেশ না করে, তাহা হইলে জগতের ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। আশা করি, জগতের বৈজ্ঞানিকেরা সুকার্য্যে রত থাকিয়া জগতের সভ্যতার যেন মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন।

বাজিকর

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সে এক রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নবেলায় কলিকাতার একটা গলি-রাস্তার মোড়ে বাজিকরের টুম্‌টুমি বাজিয়া উঠিল,—টুম্-টুম্-টুম্-টুম্! টুম্-টুম্-টুম্-টুম্!...

মাসখানেক ধরিয়া এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্র এত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে যে, রাস্তায় লোক-চলাচল একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। কর্ম্ম-কোলাহলমুখর কলিকাতা নগরীটা, মনে হইতেছে যেন, গুমট্ গরমে একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পেটের দায়ে পথে-পথে ঘুরিয়া পরের করুণায় যাহারা আত্ম-সমর্পণ করে, রৌদ্র, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করিয়া উপার্জ্জনের জন্য এমনি করিয়া পরিশ্রম তাহাদের করিতেই হয়।

সম্মুখে বড়-রাস্তার উপর ক্বচিৎ দু'একটা গাড়ী-ঘোড়া, মোটর ইত্যাদি যান-বাহন দেখা যাইতেছে। তাহাদের অলস-মন্থর গতিধ্বনি শুনিয়া মনে হয়, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহারা চলিয়াছে।

দুইটা বৃদ্ধ গরু বোঝাই-দেওয়া একটা গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের চাবুকের ঘায়ে তাহাদের পৃষ্ঠে ঘা হইয়া গিয়াছে,—মুখ দিয়া ফেনা ভাঙিতেছে!...

একটা ছ্যাক্‌ড়া ঘোড়ার গাড়ী সশব্দে তাহাদের পার হইয়া গেল। ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের শব্দ ছাপাইয়া কোচম্যানের চাবুকের শব্দ বড় তীব্র ভাবে কাণে আসিয়া বাজিতেছে।

"চনাব তীরে রঞ্জা"—পাঞ্জাবী-উপকথা

শিল্প—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

গঞ্জরাবশেষ ঘোড়া দুইটা লাফাইয়া লাফাইয়া কখনও জোরে কখনও ধীরে দৌড়িতেছিল!

পথপ্রান্তে হঠাৎ একজন রিক্‌শাওয়ালার ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। দুইটা মোটা লোককে টানিয়া টানিয়া লোকটি একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। আরোহীদের মধ্যে একজন কহিল, আরে, টিমিক্ টিমিক্ কাহে করতা হায়—জোরসে চলো। ঘণ্টার শব্দ আর শুনিতে পাওয়া গেল না। লোকটা প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

একজন ফিরিওয়ালা কি-একটা সস্তা জিনিষের দর হাঁকিতেছিল,—বোধ করি এখনও তাহার আহারের সংস্থান হয় নাই।

পরক্ষণেই একজন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক কাতরকণ্ঠে একমুষ্টি অন্নের জন্য বৃথাই কাঁদিয়া গেল!...

বড়-রাস্তার অনতিদূরে যে-গলিটার ভিতর বাজিকর তাহার টুম্‌টুমি বাজাইয়া ঘুরিতেছিল, তাহার দুই পার্শ্বে বারবনিতাদের বাড়ী।

বয়স তাহার পঞ্চাশ পার হইয়া গেছে। মুখের উপর খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, পরিধানে এক ছিন্ন-মলিন বস্ত্র, কাঁধে একটা ঝুলি, বামহস্তে একটি ছোট মাটির ভাঁড়, এবং সবুজ রঙের একটি কাঠের টিয়াপাখী, ডানহাতে তমরুর মত একটি টুম্‌টুমি!

রৌদ্রের তেজে রাস্তার তপ্ত ধূলার উপর সে হাঁটিতে পারিতেছিল না। দেওয়ালের কোণ ঘেঁসিয়া যে-ছায়াটুকু পড়িয়াছে, তাহারই উপর দিয়া সে অতি কষ্টে চলিতেছিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া আবার টুম্‌টুমি বাজাইয়া সে তাহার পিপাসা-দীর্ণ শুষ্ককণ্ঠে হাঁকিল,—বাজি আছে, খেলা আছে,—ভূত আছে,—ওষুধ আ—ছে!...

আজ যে-রাস্তা ধরিয়া সে হাঁটিতেছিল, সেখানে পূর্ব্বে কোন দিন সে আসিয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ হয় না। এই সব অপরিচিত স্থানেই তাহার উপার্জ্জনের সম্ভাবনা কিছু বেশী। তাই, সে তাহার বার্দ্ধক্যজীর্ণ শিথিল হস্তের মুষ্টি প্রাণপণ শক্তিতে দৃঢ় করিয়া তাহার টুম্‌টুমি বাজাইয়া চীৎকার করিতেছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের সুমুখে মধ্যাহ্নবেলা ক্রমশঃ অপরাহ্ণের দিকে চলিয়া পড়িতে লাগিল,—রৌদ্রের প্রখর দীপ্তি ক্রমশঃ তেজহীন ম্লান হইয়া আসিল, তথাপি একটা লোকও তাহাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। বুড়া ভাবিল, আজ বুঝি বা তাহাকে উপবাস করিয়াই কাটাইতে হয়।

সেই রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি লোক, কালো-রঙের শতচ্ছিন্ন একটি জামা গায়ে দিয়া পৃষ্ঠে তাহার একটি ছোট বোচ্‌কা বাঁধিয়া চলিতেছিল। সহসা সে অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, রিপু কম্ম আছে,—রিপু কম্ম!... লোকটি একবার বড় সকরুণভাবে বৃদ্ধ বাজিকরের দিকে তাকাইয়া তাহার জরাজীর্ণ চটি জুতার ফট্ ফট্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৃদ্ধ যতই কাতর হইয়া পড়িতেছিল, দুঃখ-দুর্ভাবনায় মন তাহার ততই পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার বাজনা শুনিয়া পাশের ঘরের একটি মেয়ে দরজার নিকট ছুটিয়া আসিল। তাহার একটুখানি আশা হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাগে এবং দুঃখে তাহার দেহমন ভরিয়া উঠিল,—হাতের বাজনাটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল।

তিন-চারিটা ঘর পার হইয়া আসিতেই, পাশের একটা বাড়ীর জানালা খুলিয়া এক তরুণী জিজ্ঞাসা করিল, ও কি গা?

বৃদ্ধ কহিল, বাজি আছে মা, কত রকমের খেলা আছে, কাঠের টিয়া জল খাবে,—টাকা পয়সা উড়ে যাবে,—আরও কত আছে মা!...দেখ্‌বি? বলিয়া আগ্রহাতিশয্যে বৃদ্ধ তাহার কোটরপ্রবিষ্ট দুইটা উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দিয়া তরুণীর মুখের পানে একবার তাকাইল।

মেয়েটি বলিল, বাইরের দরজা দিয়ে উঠোনে পেরিয়ে এসো,—দেখ্‌ব।

এই বলিয়া সে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল; উপরের রেলিং ধরিয়া আর একটি মেয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাকে ডাক্‌চিস্ লা কিরণ?

কিরণ বলিল, নেবে আয়,—বাজি দেখ্‌বি।

আ মরি! বাজি দেখ্‌বার সময়টি বেশ! বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কিন্তু সে চলিয়া গেলেও, বাজিকরের টুম্‌টুমির শব্দ শুনিয়া আরও অনেক মেয়ে আসিয়া জড় হইল।

বুড়াকে তাহার দরজার নিকট বসাইয়া কিরণ বলিল, দেখাও এবার। কত নেবে?

একে-একে তাহার প্রত্যেকটি আসবাব সুমুখে নামাইয়া বৃদ্ধ বলিল, আগে এক গ্লাস জল দে মা, একটু খাই। বাজি দেখে' তার পর দাম দিস্,—আগে থেকে দর-কসাকসি কেন মা?

বুড়ার মুখে দর-কসাকসির ইঙ্গিত শুনিয়া একটা মেয়ে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিরণ তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল আনিয়া তাহার মাটির পাত্রে ঢালিয়া দিতেই এক চুমুকে সেটুকু খাইয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ বলিল, এইবার ছাখ্ মা। আগে কিসের খেলা দেখ্‌বি?—টাকার?

এই বলিয়া বাজিকর তাহার থলি হইতে একটি টাকা ও কিসের একটা লম্বা হাড় বাহির করিল। টাকাটা বাঁহাতে রাখিয়া ডানহাত দিয়া হাড়টা হাতের উপর একবার ঠেকাইবামাত্র হাতের মুঠা খুলিয়া দেখাইল, টাকাটা অদৃশ্য হইয়া গেছে।

ছাই বাজি। এমন আমিও পারি। বলিয়া বোধ করি রাত্রির সাজসজ্জা করিবার জন্য একটা মেয়ে চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে আর একটা গেল। কিরণ কিন্তু সেখান হইতে নড়িল না!

অনেক কষ্টে দর্শক মিলিয়াছে দেখিয়া বাজিকর দক্ষতার সহিত আজ তাহার সমস্ত কৌশল একটি একটি করিয়া দেখাইতে লাগিল। কাঠের টিয়াপাখী জল খাইল, টাকা উড়িল, পয়সা উড়িল, মার্ব্বেল উড়িল! বুড়া বলিল, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে সে না কি মানুষও উড়াইতে পারে।...

এইসব কৌশল দেখিতে দেখিতে বহু দিনের একটা পুরাতন কথা হঠাৎ কিরণের মনে পড়িয়া গেল। ভোজ-বিদ্যার মত কে যেন তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা যবনিকা ফেলিয়া দিয়া তাহার বর্ত্তমান দুর্ব্বহ জীবনটাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল। কে যেন তাহার এই কলিকাতার আবর্জ্জনাময় মলিন পল্লীর কদর্য্য জীবনপথ হইতে সে কোন্ দূর পশ্চাতের সৌন্দর্য্য সুষমাময় অমলিন পল্লীপথে তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। সে যে বারবনিতা, সে কথা সে আজ ভুলিয়া গেল,—রাত্রির জন্য তাহাকে যে এখনই প্রাণপণে সাজসজ্জা করিতে হইবে, সে কথা তাহার মনে পড়িল না,—নিজের দেহ বিক্রয় করিয়া তাহাকে যে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়, সে প্রাণান্তকর চিন্তা নিমেষের জন্য সে বিস্মৃত হইল!... সে আজ অনেক দিনের কথা। তাহার বাবা, মা, ভাই, বোন্, গৃহ, সংসারের মধ্যে সে ছিল তখন একটি দশ-এগারো বৎসরের বালিকা। এক দিন এম্‌নি একজন বিদেশী বাজিকর সাপ খেলাইয়া বাজি দেখাইবার জন্য তাহাদের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সে কি উৎসাহ! সেই উৎসুক বালক-বালিকার মধ্যে সেও তো ছিল! তাহাদের আনন্দে যোগ দিয়া হৈ হৈ করিয়া সমস্ত দিন সাপ খেলা আর বাজি দেখিয়া বৈকালে যখন সে বাড়ী ঢুকিল, তাহার মা তাহাকে কত-না তিরস্কার করিলেন! তাহার সেই ছোট ভাইটি তাহার সঙ্গে ছিল,—তাহার জন্য সেও মা'র খাইল। সেই তাহার ভাই,—যাহাকে সে এত ভালবাসিত,—সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে!...কত বড় হইয়াছে সে!...তাহার মা, বাবা, বোন! তাহাদের সেই ঘর, সেই গ্রাম!...সে তো ইচ্ছা করিলেই আজ আর তাহাদের কাছে যাইতে পারে না! যে জীবনকে সে এক দিন হেলায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, যাহার সহিত তাহার সম্পর্ক চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে,—যে গৃহের হাসি কান্না, আনন্দ নিরানন্দ, প্রতি দিনের প্রত্যেকটি অতি তুচ্ছ ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ এবং পবিত্র মাধুর্য্য আজ তাহার কাছে স্বপ্নের প্রহেলিকার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে পথ কি আজ তাহার জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল!...মাগো! সে যে তাহার একটি মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য আজ মহাসমুদ্রের অতলতলে তলাইয়া গেছে!... এই উঞ্ছবৃত্তি হইতে তাহার কি আর নিস্তার নাই মা!...

কিরণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল!...

বুড়া একটা নূতন খেলা দেখাইবার জন্য তাহার ঝুলি হইতে কি একটা বস্তু বাহির করিতে যাইবে, এমন সময় কিরণ কহিল, হ্যাঁগা, তোমার দেশ কোথায়?

বাজিকর কিরণের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, আমার দেশ—মেদিনীপুর জেলায় মা।

কিরণের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলায়। সে একবার

ভাবিল, বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুর কত দূরে এবং সে কোনও দিন বাজি দেখাইবার জন্য তাহাদের জেলায় গিয়াছে কি না, সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কোন কথাই তাহার জিজ্ঞাসা করা হইল না। আরও যে দুইটা মেয়ে দাঁড়াইয়া বাজি দেখিতেছিল, কিরণ একবার তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

এমন সময় জুতা মচ্ মচ্ করিয়া আফিস্ ফেরত কিরণের এক বাবু হঠাৎ তাহাদের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অস্থি এবং চর্ম্ম ব্যতীত শরীরে তাহার মাংস আছে বলিয়া বোধ হয় না; চোখ দুইটা বড় বড়,—সে যে কত বড় দুর্নিবার শক্তিতে নিজেকে ধ্বংস করিয়াছে, তাহা তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং তাহার বিবর্ণ মলিন ঠোঁট দুইটা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। একবার বুড়া বাজিকরের দিকে, একবার কিরণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাবু বলিল, কি হচ্ছে এ সব?

কিরণ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বুড়া কহিল, দুটো বাজি দেখাচ্ছি বাবু। এই দেখুন, এই তো একটা হাড়,—বলিয়া বাবুকে কি একটা তারিফ্ সে দেখাইতে যাইতেছিল; বাবু বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব হয়েছে। ও সব ঢের দেখেছি বাবা, তুমি চুপ কর।

কিরণ তাহার বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ওগো, একটা টাকা দাও দেখি?

বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, টাকা? কি হবে টাকা?

ওকে দেব। বলিয়া সে বাজিকরকে দেখাইয়া দিল।

তা আবার টাকা কেন? দুগণ্ডা পয়সা দিয়ে দাও না?

তুমি দাও না একটা টাকা। আমি আবার দেব তোমায়।

বাবু বাধ্য হইয়া পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বাজিকরের থলির নিকট ছুড়িয়া দিয়া বলিল, যাও বাপু যাও। মেয়েদের ভুলিয়ে খুব রোজগার কোরতে শিখেছ যা হোক্।...এসো কিরণ এসো। বলিয়া বাবু তাহার কাপড়ের আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়া বৃদ্ধ খুসী হইয়া বলিল, আরও গোটা দুই ভাল বাজি দেখ্‌বি মা?

কিরণ সজোরে একটা হেঁচ্‌কা টান্ দিয়া বাবুর হাত হইতে তাহার কাপড়খানা টানিয়া লইল। বলিল, তুমি একটু বসো না বাপু, আমি যাচ্ছি।—নাও, দেখাও তো তুমি। বলিয়া কিরণ তাহার দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

বাবু একা একা ঘরের ভিতর অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রোষগম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, কিরণ!

এ সময় কিরণের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না; সেও রাগিয়া উত্তর দিল, যাব না, যাও।

বাবু আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, কিরণের পশ্চাতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দাও কিরণ, আমি চল্লুম।

ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া বুড়া তাহার আসবাব পত্র গুটাইয়া লইতেছিল। বলিল, হয়ে গেছে বাবু, আমি উঠি।

না, তুমি যেও না। বলিয়া কিরণ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তাহার বালিসের তলা হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বাবুর হাতে দিয়া বলিল, ভারি ত টাকা দেখাচ্ছেন,—এই নাও তোমার টাকা।

রাগে হন্ হন্ করিয়া বাবু বাহির হইয়া গেল।

বুড়াও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, আমি তাহ'লে আসি মা।

যাও। বলিয়া কিরণ মুখ ভার করিয়া কবাট ধরিয়া নিতান্ত অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বুড়া বাজিকর চলিয়া গেল।

কিরণ একবার বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া রাস্তার উপর উঁকি মারিয়া দেখিল, তাহার বাবু সজোরে হাঁটিয়া গলিটার প্রায় শেষপ্রান্তে তাহারই কোন্ এক প্রতি-বেশিনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

কিরণ ধীরে ধীরে তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ছোট জানালাটির সুমুখে গিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার গা-ধোয়া, চুল-বাঁধা কিছুই হয় নাই,—সে কথা তাহার মনেও ছিল না! কিসের যেন একটা অশান্ত আক্ষেপ তাহার মনের ভিতর অব্যক্ত বেদনায় গুমরিয়া মরিতে লাগিল। কিরণ আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইবার জন্য জানালার বাহিরে তাকাইল। তাহার এই জানালার পথে দূরে বড় রাস্তাটা পর্য্যন্ত নজর চলিতেছিল। রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া, পথিকের

চলাচল, সবদিন যেমন চলে, আজিও তেমনি চলিতেছে। বেল-ফুলের মালা, ঘুগ্‌নিদানা, কুল্‌ফি বরফ, রোজ যেমন হাঁকিয়া যায়, আজও তাহারা তেম্‌নি হাঁকিয়া গেল।

দরজায় দাঁড়াইয়া ক্রেতা ডাকিবার জন্য একটি মেয়ে ডাকিল, আস্‌বি না কিরণ?

তাহাদের প্রতি দিনের সুনির্দ্দিষ্ট বীভৎস কর্ম্ম-পদ্ধতি আজ কিরণের নিকট বিষের মত মনে হইতেছিল,—সে ঘাড় নাড়িয়া কোন রকমে তাহাকে জানাইয়া দিল যে, সে যাইবে না।

এতগুলা চোখের সুমুখে বাজিকর যেমন করিয়া জিনিস-গুলা উড়াইয়া দিতেছিল,—আজ কিরণের মনে হইল, তেমনি করিয়া কে যেন তাহার মনটাকেও আজ কোথায় কোন্ দিক দিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে!

ধীরে-ধীরে দরজায় খিল্ আঁটিয়া দিয়া সে তাহার বিছানার একপার্শ্বে এলাইয়া পড়িল।

এমন সময় কালো-কুচ্‌কুচে বিরাট এক মাংস-স্তূপের মত একটা লোক হেলিয়া-দুলিয়া কিরণের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফের মধ্যে তাহার গোলাকার চোখ দুইটা রাঙা আলোর মতই জ্বলিতেছিল!

কিরণের রুদ্ধ দরজায় গুম্ গুম্ করিয়া বারকতক করাঘাত করিয়া পাশের একটি মেয়েকে সে জিজ্ঞাসা করিল, লোক আছে না কি?

মেয়েটা উত্তর দিল, আজ ওর ভাব লেগেছে বাবু, কাল এসো।

আর একটি মেয়ে যেন তাহার মুখের কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিল, কাল কেন, আর খানিক্ পরেই এসো!

দুজনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পথের ধারে কতকগুলা খেঁকি কুকুর সেই সময় ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিতেছিল!.....

ভাদরে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

নির্ঝরে বারি ঝরে আজি ভাদরে,
ধরণী বরিছে বুকে তারে আদরে!
আজি, প্রিয়া বসে প্রিয় পাশে,
চখাচখী স'রে আসে,
মেঘেরে চপলা আজি চুমে সাদরে!
শিশুটিরে কোলে টানি জননী চুমে;
কচি আঁখি মুদে আসে মধুর ঘুমে।
আজি, নীরধারা নির্ঝরে
ধরা পরে ক্ষীর ঝরে
সে সুধা ঝরিয়া পড়ে তৃষিত ভূমে!
আপন খেয়ালে ক্ষ্যাপা বিজলী দোলে,
ক্ষণে ক্ষণে তিমিরের আঁচল তোলে!
বজ্রের গরজনে
সে হাসে আপন মনে
সহসা লুকায়ে যায় মেঘের কোলে!
হঠাৎ বাদল-রাণী কাঁদিয়া ওঠে!
করুণ নয়ন-পুটে বেদন ফোটে!
বেলা যুথি বন 'পরে
আঁখিজল গলে' পড়ে,
ক্রন্দন সমীরণে ভুবনে লোটে!
আজি, বেগবান কালো মেঘে বাদল বেলা
মাদলের তালে তালে জমাল খেলা;
নূপুর পরিয়া তারা
নাচিছে পাগলপারা,
উজলিয়া আজিকার সজল মেলা!
ভাদ্র জাগিল আজি রুদ্র বেগে,
জলের ঝাপটে আর ঝড়ের মেঘে!
ভরে' দিল নদ নালা
ভেঙে দিল ডাল পালা,
দাদুরী কাজরী গায় আজিকে জেগে!

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্-সি

বিমান-পথ

রেল, ষ্টীমার ও জাহাজের পরিবর্ত্তে যা'তে বিমান-পথে দেশ-বিদেশে যাতায়াত করতে পারা যায়, তা'র চেষ্টা বহুকাল ধরে চলে আস্‌ছে। তবে উপর্য্যুপরি কয়েকটি দুর্ঘটনার পর এই চেষ্টার কিঞ্চিৎ বিরাম দেখা গে'ছল বটে, কিন্তু আবার পূর্ণ উদ্যমে সে চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় কারখানায় যাত্রী বহনোপযোগী

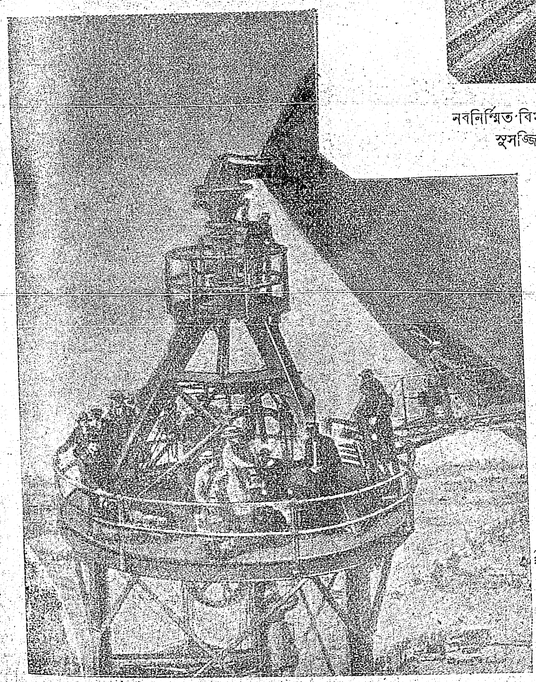

নবনির্ম্মিত বিমানের ষ্টেসন।
(জার্ম্মাণী সম্প্রতি এই নূতন বিমান ষ্টেসন তৈয়ারী করেছে, একখানি বিমান পর্য্যন্ত ষ্টেসনে আটকান আছে)

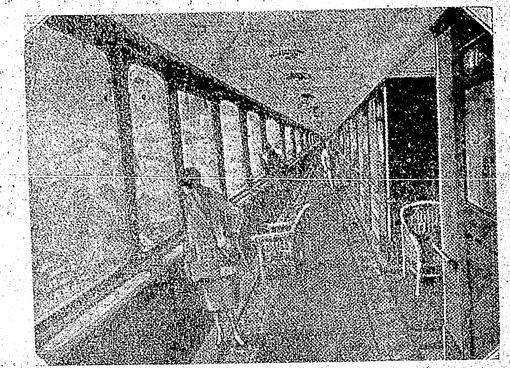

নবনির্ম্মিত বিমানের ভিতর দিক। (আমেরিকার নবনির্ম্মিত বিমানের সুসজ্জিত বারাণ্ডার উপর দিয়ে একজন সুন্দরী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে যাচ্ছেন)

বৃহৎ আকারের বিমানপোত সব তৈয়ারী হচ্ছে। নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হলেই সত্বর তা'র অভিযান আরম্ভ হবে। জার্ম্মাণী শুধু পোত নির্ম্মাণ নিয়েই ব্যস্ত নেই, সে এই জাহাজের কাজটা যা'তে বেশ চলে তা'র জন্যে শূন্যে বিমান-ষ্টেসন পর্য্যন্ত তৈরী ক'রেছে।

আয়ুনাশের কারণ

যক্ষ্মা, বসন্ত, ডিপ্‌থেরিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাধির ফলে মানুষের আয়ুনাশ হয়। আমেরিকা ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনেক দেশে মানুষের পরমায়ু সাধারণতঃ ৫৮ বৎসরে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও জীবনের মেয়াদটা অধিকাংশ লোকের আশী বৎসরই ছিল, কিন্তু আজকাল বড় একটা কেউ ষাট বৎসর পার হতে পারছে না। এই ভীষণ ব্যাপার উপলব্ধি করে, তা'র প্রতীকার করবার জন্যে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক ডাঃ রে লাইম্যান উইলবার (Dr.

Ray Lyman Wilbur) কয়েক বৎসর ধরে বিপুল চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের বর্ত্তমান আয়ুখর্ব্বতার কারণ শুধু তাদের রসকোষের (glands) কার্য্যকরী শক্তির অভাবে বা হ্রাসের জন্য

রসকোষের সন্ধান। (রে সাহেব রোগীর কর্ণ পরীক্ষা ক'রে কোন্ রসকোষের দোষ হয়েছে তা' নির্ণয় ক'রছেন)

ঘটে থাকে। তিনি বলেন যে, মানুষ যদি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাকবার ইচ্ছা ক'রে, তবে তা'র শরীর একটু খারাপ বোধ হলেই, বা কোনও ব্যাধির আক্রমণের সূত্রপাতেই কোনও বিশেষজ্ঞের কাছে তার বিশেষ

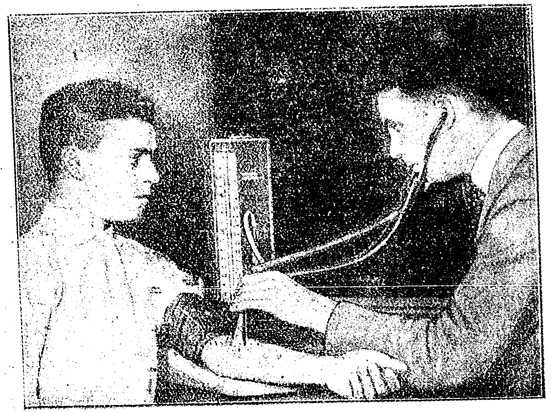

রসকোষের পরীক্ষা। (রে সাহেব রোগীর রক্তের সংস্থাপন পরীক্ষা ক'রে রসকোষের দোষ নির্দ্ধারণ ক'রছেন)

কোনও রসকোষের দুর্ব্বলতার চিকিৎসা করান উচিত। রোগের প্রথম অবস্থায় রে সাহেব অনেক রোগীর কেবল তা'র বিশেষ কোন্ রসকোষের দুর্ব্বলতা ঘটেছে তা'র সন্ধান ক'রে তা'রই চিকিৎসার দ্বারা তা'দের সম্পূর্ণ আরোগ্য ক'রছেন।

ঝড়ের ছবি

ঘূর্ণি ঝড়ের আলোক-চিত্র আজ পর্য্যন্ত কেউ তুল্‌তে পারেন নি। গেইল পিকওয়েল (Gayle Pickwell) নামে একজন আমেরিকান অনেক দিন ধরে চেষ্টা করবার পর কয়েকখানি মাত্র ছবি তুল্‌তে পেরেছেন। এই ছবিগুলি তোলবার সময় তাঁর জীবন অনেক সময় সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল, এমন কি

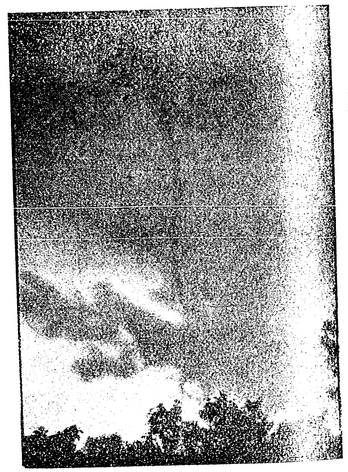

ঘূর্ণিবায়ু (প্রথম অবস্থা)

দু' তিনবার তিনি ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে পড়ে মারা যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছেন। ফলে তাকে ৭।৮ দিন ধরে শয্যাগত হয়ে থাকতে হয়। পিকওয়েল সাহেব ঝড়ের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অবস্থার ছবি তোলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সফলকাম হতে পারেন নি।

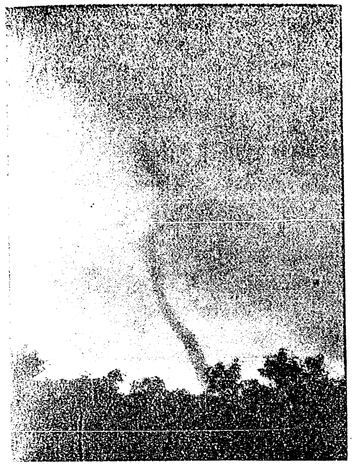

ঘূর্ণিবায়ু (দ্বিতীয় অবস্থা)

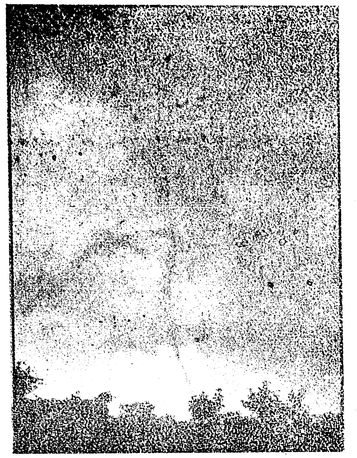

ঘূর্ণিবায়ু (তৃতীয় অবস্থা)

বধিরের শ্রবণশক্তি

রেডিও যন্ত্র কোনও লোকের বধিরতা দূর করতে পারে না বটে, কিন্তু যারা অল্প বধির তাদের শ্রবণ শক্তির অভাব অস্থায়ী ভাবে মোচন করতে পারে। খুব জোরে কথা ব'ললে যাঁরা শুনতে পান, তাঁদের কাণে যদি রেডিওর শ্রবণ-যন্ত্রটী পরিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে তাঁরা সমস্ত কথা স্পষ্ট শুনতে পান। তবে আমরা রেডিয়োতে কথা বলতে সাধারণতঃ যে যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি, সেরকম যন্ত্র বধিরের শোনবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ডাঃ হ্যারল্ড (Dr. Harold) তাই বধিরদের জন্য একটু ভিন্ন রকমের এক যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে বধিরেরা সকল কথা এমন স্পষ্ট শুনতে পায় যে, মনে হয় যেন তারা তাদের শ্রবণশক্তি আবার ফিরে পেয়েছে।

শিশুর রসকোষের চিকিৎসা। (রে সাহেবের নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবিকাগণ বালকবালিকাদিগের কণ্ঠনালী ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রছেন)

খোদার উপর খোদকারী

যুদ্ধের সময় গোলা লেগে বা উচ্চস্থান থেকে পড়ে গিয়ে অনেক সময় লোকের দেহের নানা স্থানের অস্থি চূর্ণ হয়ে যায়। সে অবস্থায় আহত অঙ্গ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায়

বধিরের শ্রবণ-শক্তি। (হ্যাংল্ড সাহেবের পরীক্ষাগারে বধিরেরা কাণে শ্রবণ যন্ত্র প'রে রেডিয়ো শুনতে পারছে)

থাকে না। সুতরাং সেই সব হতাগ্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনেক সময় একেবারে চির কালের জন্য অকেজো হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্প্রতি ওনটেরিওর (Ontario) একজন বৈজ্ঞানিক ডাঃ সেকর্ড (Dr. Secord of Brantford) সেই চূর্ণ অস্থি শরীর থেকে বার করে দিয়ে আবার নূতন অস্থি সংযোগ করে সেই আহত অঙ্গকে কার্য্যক্ষম ক'রে দিচ্ছেন।

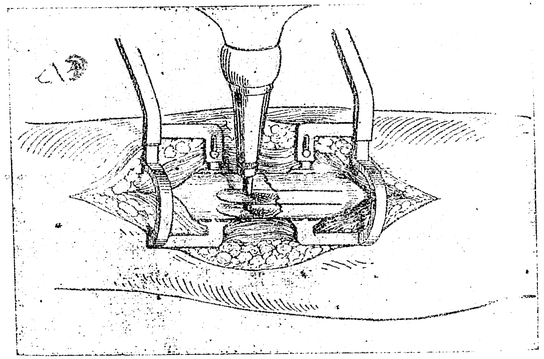

কনুইয়ের হাড় জোড়বার কৌশল। (কনুইয়ের হাড় ভেঙ্গে গেলে বা গুড়ো হয়ে গেলে নূতন হাড়ের চাবি তৈয়ারী ক'রে তাকে জোড়া হচ্ছে)

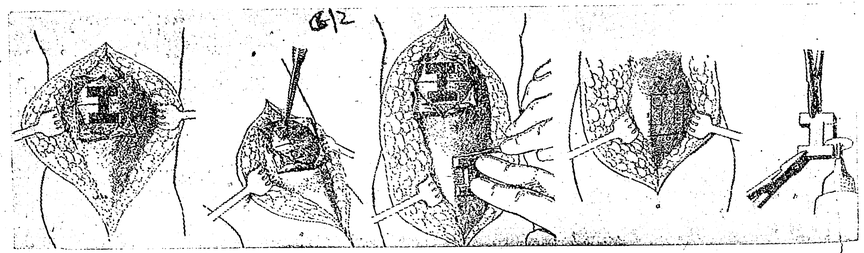

হাঁটুর হাড় জোড়বার কৌশল। (হাঁটুর হাড় ভেঙ্গে গেলে বা গুড়ো হয়ে গেলে নূতন হাড়ের চাবি তৈয়ারী করে তাকে জোড়া হচ্ছে)

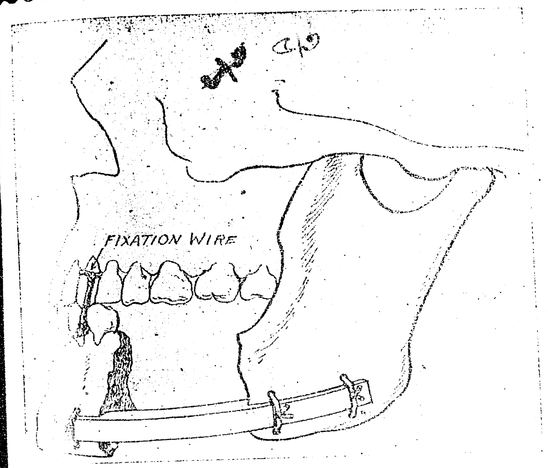

চোয়ালের হাড় জোড়বার কৌশল
(তারের হাড় কব্জা দিয়ে চোয়ালের সঙ্গে এটে ভাঙা চোয়াল জোড়া হচ্ছে)

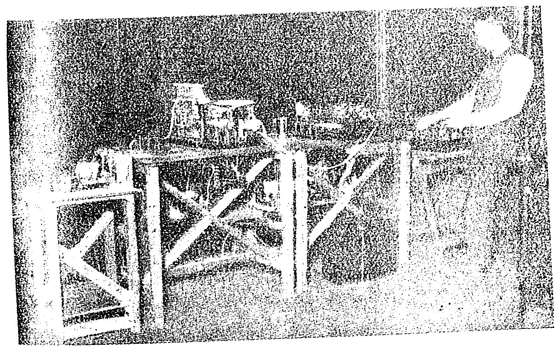

বেতারে লেখা
(ক্রীড সাহেব পরীক্ষাগারে বেতারের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ ক'রছেন)

বেতারে লেখা

বেতারে আমরা চিরকাল মোর্সের টরে-টক্কা বা অন্য কোনও লোকের উদ্ভাবিত সাঙ্কেতিক শব্দই শুনতে পেয়ে থাকি, কিন্তু সেটা যে একদিন লেখায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা কেউ কল্পনাও ক'রতে পারে নি। সম্প্রতি F. G. Creed নামে একজন সাহেব একটী সুন্দর যন্ত্র তৈরী করেছেন যার সাহায্যে যে কোনও লোকের বার্ত্তা বেতারে সাঙ্কেতিক অক্ষরে আপনা আপনিই কাগজের উপর লেখা হয়ে যাবে।

গুলি পরীক্ষা। (গুপ্ত পুলিসের নিযুক্ত একজন বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে গুলির আকার পরীক্ষা ক'রছেন)

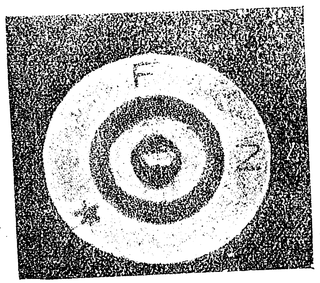

নিক্ষিপ্ত গুলি পরীক্ষা। (হত বা আহত ব্যক্তির আহত স্থান থেকে গুলি বার করে তার ছবি তোলা হয়েছে)

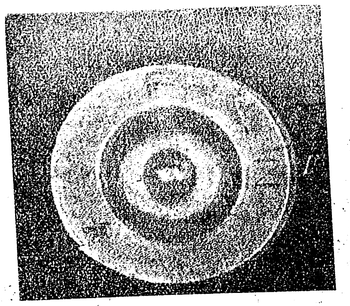

প্রাপ্ত গুলি পরীক্ষা (আততায়ী ব্যক্তি ধৃত হ'বার পর তার বন্দুকের ভেতর থেকে গুলি নিয়ে তার ছবি তোলা হয়েছে। পরীক্ষার পর দেখা যাচ্ছে যে নিক্ষিপ্ত ও পাওয়া দু গুলিই একই রকমের একই দেশের তৈয়ারী)

গুলি রহস্য

শিখের কৃপাণ, নেপালীর ভোজালী ও পাঠানের ছোরা যেমন একরকম নয়, তেমনি সকল দেশের সকল জাতের বন্দুকও এক রকম হয় না, সুতরাং বন্দুকের গুলিও বিভিন্ন বন্দুকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। সুতরাং কোনও

লোহার পিপা (দ্বিতীয় অবস্থা) (লোহার পাত গোলাকার করবার পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার একদিক্‌কার মুখ জোড়া হচ্ছে)

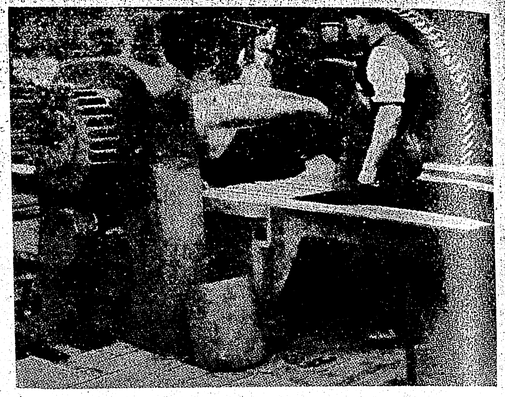

লোহার পিপা (প্রথম অবস্থা) (কারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোহা গলিয়ে তার পাত তৈয়ারী ক'রে তাকে গোলাকার করা হচ্ছে)

লোহার পিপা (তৃতীয় অবস্থা) (পিপার মাঝখানের জোড় গলিত ইস্পাত দিয়ে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে)

ব্যক্তি বন্দুকের গুলিতে হত হ'লে কোন্ দেশের লোক হত্যা ক'রেছে গুপ্ত পুলিশের নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকে সেটা সহজেই ধরে ফেল্‌তে পারেন। তাঁরা বলেন যে, প্রথমতঃ বিভিন্ন দেশের গুলির মধ্যে আকারভেদ ত' আছেই, এছাড়া, দ্বিতীয়তঃ গুলি যে ধাতু দিয়ে গড়া, সেই ধাতুর

চোখের বালি (রোগীর চোখের ভিতর থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এক টুকরা ইস্পাত বার করা হচ্ছে)

বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেও বিভিন্ন দেশের গুলির মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এজন্য এক দেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের গুলির গোলমাল হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বন্দুকের গুলি থেকেই কোন দেশের লোক হত্যাকারী বা হত্যাকাণ্ডে জড়িত আছে—তা' সহজেই ধরতে পারা যায়

লোহার পিপা

কাঠের পিপা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায় ব'লে তাদের অনেক সময়ে সব রকম কাজে লাগাতে পারা যায় না। সম্প্রতি লিড্‌স্ (Leeds) সহরের একজন বৈজ্ঞানিক ষ্টীলের পিপা তৈয়ারী কর্‌বার কৌশল উদ্ভাবন ক'রেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোহার পাত থেকে পিপা তৈয়ারী কর্‌ছেন। পিপাগুলি এত সুন্দর ও মজবুৎ হচ্ছে যে তা'দের নির্ভয়ে যে কোনও কাজে ব্যবহার কর্‌তে পারা যাবে।

চোখের বালি

হঠাৎ চোখে কিছু পড়লে চোখ জ্বালা করে, চোখ দিয়ে জল পড়ে, চোখ চুলকায়—আরও অনেক আনুষঙ্গিক উপসর্গ এসে জু'টে। ধূলো যদি চোখে পড়ে সেটা হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে যায়; কিন্তু যারা কোনও কারখানায় কাজ করে তাদের হয়ত মাঝে মাঝে লোহা, তামা বা অন্য কোনও ধাতুর গুঁড়া ঠিক্‌রে এসে চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে চোখে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয়। আর সেটা চট্ ক'রে চোখ থেকে বেরোয় না। লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর বিষ থাকে। যদি সেই ধাতু চোখ দিয়ে বেরিয়ে না যায়, তবে রক্ত দূষিত হ'য়ে যেতে পারে। তাছাড়া ধাতুর কঠিন কণার সংস্পর্শে আহত হয়ে চোখ ফুলে উঠে যন্ত্রণায় লোকের আহার নিদ্রা বন্ধ ক'রে দেয়। বিলাতের কয়েকটি হাঁসপাতালে চোখের ভিতর লোহার গুঁড়া পড়লে তা'র চিকিৎসার এক অভিনব ব্যবস্থা হয়েছে। যে চোখে লোহার গুঁড়া পড়েনি সেই চোখ বন্ধ ক'রে রোগীকে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সামনে বসিয়ে রাখা হয়। তার পর যন্ত্রটার মধ্যে তাড়িৎশক্তি চালিত কর্‌লেই যন্ত্রটী লৌহ আকর্ষণ কর্‌তে আরম্ভ করে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগীর চক্ষের অভ্যন্তরস্থ লৌহ-কণিকাচয় নিঃশেষে নিষ্কাশিত ক'রে আনে।

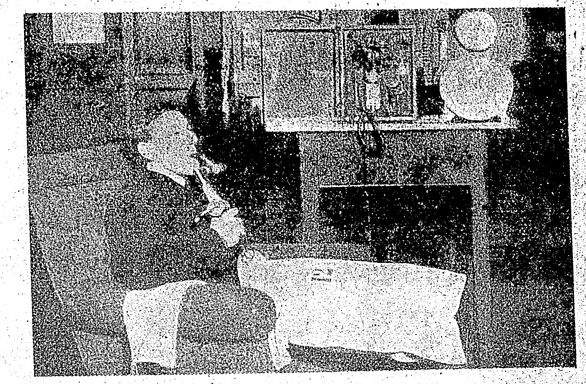

শ্রমের ওজন (কোনও ব্যক্তির শারীরিক পরিশ্রম করবার পর অঙ্গারজান বাষ্প মেপে তার শ্রমের ওজন হচ্ছে) (একই ব্যক্তির মানসিক পরিশ্রম করবার পর অঙ্গারজান বাষ্প মেপে তার শ্রমের ওজন হচ্ছে)

শ্রমের ওজন

সব কাজে যে সমান পরিশ্রম কর্‌তে হয় না তা' সকলেই জানেন। যাঁরা কারখানার কাজ করেন তাঁরা যে, যাঁরা লেখাপড়ার কাজ করেন তাঁদের চেয়ে যে অনেক বেশী পরিশ্রম করেন, সেটাও সকলেই জানেন।

বরুণপুরের প্রদীপ। (বরুণপুরের প্রদীপের শিখায় এক খণ্ড মোটা ইস্পাত ধরতেই সেটা গলে যাচ্ছে)

কোন কাজ করতে গেলে কতটা পরিশ্রমের প্রয়োজন সেটা ঠিক করবার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চিকিৎসক একটি চমৎকার যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রেছেন। তিনি বলেন যে শারীরিক পরিশ্রম করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে নিশ্বাসের চেয়ে আমাদের প্রশ্বাসটা বেশী ঘন ঘন পড়ে এবং এই প্রশ্বাস কেবল মাত্র অঙ্গারজান বাষ্পের সমষ্টি বলে' তিনি বলেন যে সকল রকম পরিশ্রম করবার সময় প্রশ্বাসের সঙ্গে যে পরিমাণ অঙ্গারজান বাষ্প বেরোয়, সেটা যদি; আমরা নিয়মিত ওজন ক'রে দেখি তা'হলেই কোন কাজে কত বেশী পরিশ্রম প্রয়োজন সেটা আমরা ক্রমে সহজেই বুঝতে পারব।

বরুণপুরের প্রদীপ

জলের ভিতর যে আগুন জ্বলেনা সেটা একেবারে অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু এই অভ্রান্ত সত্য যে বিজ্ঞানের তাড়নায় একেবারে মিথ্যা হয়ে যাবে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি; ডুবুরীদের জলের ভিতর অন্ধকারে কাজ করতে অসুবিধা হয় বলে, একজন বৈজ্ঞানিক এমন একটি দীপযন্ত্রের সৃষ্টি ক'রেছেন, যা জলের ভিতরও প্রজ্বলিত থাকে। এই যান্ত্রিক দীপশিখার এত তীব্র তেজ যে, কোনও ইস্পাত বা লোহা এই আলোকের শিখার কাছে ধরলে সেটা তৎক্ষণাৎ গলে যায়।

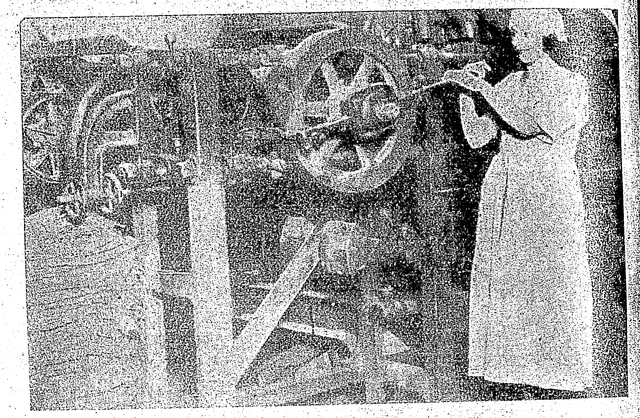

আখরোট ভাঙ্গা কল। (কলের ভিতর আস্ত আখরোট ফেলিয়া তাদের ভাঙ্গা হচ্ছে)

সুতরাং সেই প্রদীপ জলের ভিতরেও জ্বলে; কারণ, জলের শৈত্য আলোকের তীব্রতাপের অতি সামান্য ক্ষতি করতে পারলেও, সে উগ্রতেজা প্রদীপকে একেবারে নিভাতে পারে না।

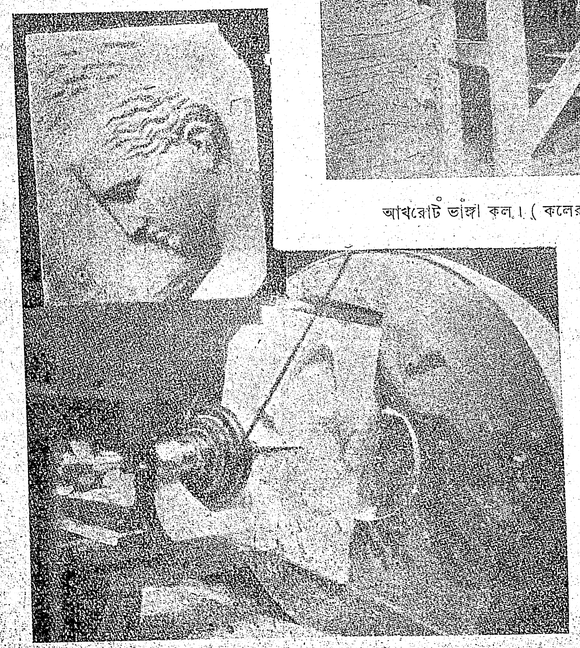

পাথরের মূর্ত্তি। (এডমণ্ড সাহেব যান্ত্রিক উপায়ে পাথরের উপর প্রতিমূর্ত্তি খোদাই ক'রছেন। (একখানি প্রাচীন চিত্রের উপর আলোক প্রতিফলিত ক'রে এডমণ্ড সাহেব পাথরের উপর তা'র প্রতিমূর্ত্তি খোদাই ক'রছেন)

আখরোটের রুটী

আখরোটের খোলা হতে যে রুটি তৈয়ারী হয় বা হতে পারে তা' আমাদের ধারণা ছিল না কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতিতে দেখা যা'চ্ছে যে, আখরোটের খোলা থেকে রুটি তৈয়ারী হয়, আর সেই রুটি লোকে খেতেও পারে। কালিফোর্ণিয়া দেশে আখরোট থেকে যে রুটি তৈয়ারী হচ্ছে, তা' সেদেশের লোকে ভক্ষণ ক'রে তাদের জীবন-ধারণ

করছে আর সে রুটিও দেশে-বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। আখরোটগুলি প্রথমতঃ গাছ থেকে নামিয়ে তাদের শুকান হয়। শুষ্ক হ'বার পর একটি কলের ভিতর ফেলে দেওয়া হয়। কলটী এমন সুন্দরভাবে তৈয়ারী যে, কলটি ঘুরাবার সময় আখরোটের খোলাগুলি ঠিক মাঝখান থেকে ভেঙে যায়। তারপর সেই কল থেকে ভাঙা আখরোটগুলি বার করে তাদের ভিতরকার শাঁসগুলি খুলে নেবার পর সেই খোলাগুলি বস্তাবন্দী ক'রে রুটী তৈয়ারী করবার কারখানায় পাঠিয়ে

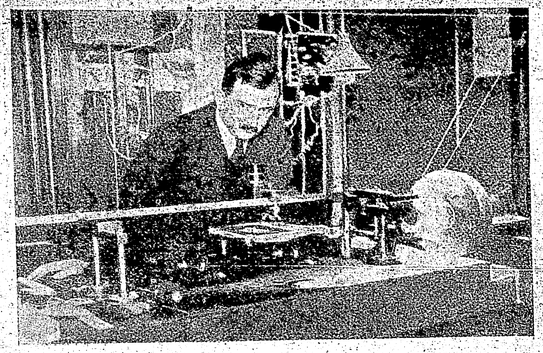

পরীক্ষাগারে এডমণ্ড সাহেব

চন্দ্রের অভ্যন্তর। (বৈজ্ঞানিক-নবাবিষ্কৃত দূরবীণ দিয়ে চন্দ্রের অভ্যন্তর পরীক্ষা ক'রছেন)

দেওয়া হয়। সেখানে খোলা-গুলিকে একেবারে ময়দার মত গুঁড়া ক'রে রুটি তৈয়ারী করা হয়।

পাথরের মূর্ত্তি

পাথরে খোদাই প্রতিমূর্ত্তি খুব কমই নিখুঁত হয়, এজন্য অনেক লোকে পাথরের প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ারী করাতে রাজী হন না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য Edmund সাহেব একটি সুন্দর যন্ত্রের সৃষ্টি ক'রেছেন যদ্দ্বারা তিনি পাথরের উপর মানুষের প্রতিমূর্ত্তি নিখুঁত ভাবে খোদাই করতে পারেন। এই যন্ত্রটী এরূপ অদ্ভুতভাবে তৈয়ারী যে, যে কোনও ব্যক্তিকে সেই যন্ত্রের সামনে বসিয়ে রেখে আলোক প্রতিফলিত করলে, পাথরের উপর তা'র প্রতিচ্ছবি গিয়ে পড়ে; সুতরাং পাথরের উপর তা'র প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করাও সহজ হয়ে যায়। এমন কি আলোক-চিত্র থেকেও

আলোকের সাহায্যে তিনি নিখুঁতভাবে প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ারী করতে পারেন। শুধু পাথরের নয়, আরও অনেক জিনিষের উপর তিনি মানুষের নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তি খোদাই করতে পারেন।

চাঁদের মানুষ

চাঁদের তুষার-শীতল আবহাওয়ার মধ্যে যে কোনও উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে, তা কাহারও ধারণা হয় না। সম্প্রতি একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বলেন যে, চন্দ্রলোকের উদ্ভিদের তিনি অনেক অভিনব তথ্য জান্‌তে পেরেছেন। তিনি না কি পরীক্ষাকালে দেখেছেন যে, চন্দ্রস্থ উদ্ভিদসমূহের কেবলমাত্র শুক্লপক্ষে বৃদ্ধিলাভ ঘটে, অন্য কোনও সময়ে নয়। মার্কিন বৈজ্ঞানিকের এই উক্তির মধ্যে যদি কোনও সত্য নিহিত থাকে,তাহ'লে চন্দ্রের মধ্যে মানুষের ও অন্যান্য জীবের স্থিতিও নিশ্চিত সম্ভব, কারণ, উদ্ভিদজীবনের প্রাণবায়ু হচ্ছে অঙ্গারজান বাষ্প, আর এই অঙ্গারজান বাষ্প কোনও প্রকার জীবের সাহায্য ব্যতীত তৈয়ারী হওয়া অসম্ভব। সুতরাং চাঁদের মধ্যে মানুষ আছে বলে মনে হয়।

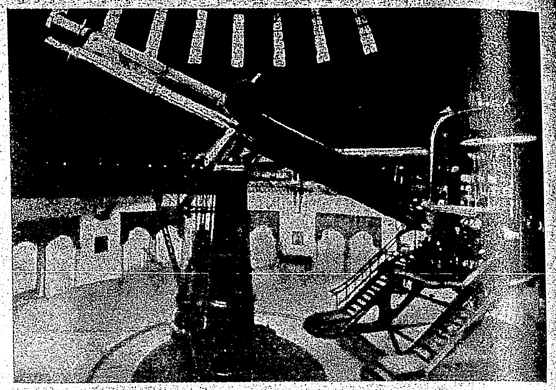

চন্দ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য। (মার্কিন বৈজ্ঞানিক চন্দ্রের এই প্রাকৃতিক দৃশ্য সাহায্যে বলেন যে চন্দ্রের মধ্যে উদ্ভিদ ও জীবে উভয়েরই নিশ্চিত স্থিতি আছে)

বিলিয়ার্ড বলের জন্মকথা

বিলিয়ার্ড খেলা আজকাল সভ্যদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু বিলিয়ার্ড বল কিরূপ ভাবে বা কোথায় তৈয়ারী হয়, বোধ হয় বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়দের মধ্যে খুব কম লোকই তাঁর খোঁজ রাখেন। ভাল বিলিয়ার্ড বল সাধারণতঃ হাতির দাঁতের তৈয়ারী। এই সব বিলিয়ার্ড বলের উৎপত্তি-স্থান একমাত্র প্যারি সহরই। প্যারি সহরের দু'তিনটি জায়গায় সর্ব্বসমেত পঞ্চাশটি কারিগর আছে, তারাই বিলিয়ার্ড বল তৈয়ারী ক'রে এবং জগৎশুদ্ধ লোককে সরবরাহ ক'রে থাকে। বলের মাপ অনুযায়ী হাতীর দাঁতকে টুকরা টুকরা ক'রে কেটে ফেলা হয়। তারপর সেই টুকরোগুলিকে আবার চৌকানো করে কাটা হয়। চৌকানো টুকরোগুলিকে আবার বলের আকারে গোল গোল করে কেটে ফেলার জন্য একটি কলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। কল থেকে যখন তারা বলের মতো গোলাকার হয়ে বেরিয়ে আসে, তখন সেগুলিকে খুব উজ্জ্বল পালিস ক'রে বাক্সভরে চালান দেওয়া হয়।

বিলিয়ার্ড বলের জন্ম
(প্যারি সহরের কারখানায় বিলিয়ার্ড বল তৈয়ারী হচ্ছে)

বিলিয়ার্ড বলের জন্ম
(বল তৈয়ারী হয়ে যাবার পর তাদের উজ্জ্বল পালিস করা হচ্ছে)

বৈজ্ঞানিক উপায়ে রৌদ্রে পোড়া

দুপুরবেলা রৌদ্রে দগ্ধ হওয়া কেহই পছন্দ করেন না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে রৌদ্র মানুষকে কার্য্যক্ষম ও সুস্থ ক'রে রাখে, সুতরাং যে সকল স্ত্রী-পুরুষ স্বাস্থ্য অনুসন্ধিৎসু তাঁরা সকলেই রৌদ্রে দগ্ধ হ'তে চা'ন। কিন্তু দুপুরবেলা রৌদ্রে দগ্ধ হওয়া বিশেষ সুবিধাজনক ও আরামদায়ক নয় বোধ ক'রে তাঁরা এখন একজন বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত Ultra Violet Ray অর্থাৎ গাঢ় নীল আলোকের রশ্মির সাহায্য নিচ্ছেন। এই আলোক-রশ্মির প্রভাবে

রোদ পোহান(বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান সাহায্যে কোনও সুন্দরীর রোদ পোহান হচ্ছে)

মানুষের দেহের রং রৌদ্রে দগ্ধের মত ক'রে দেয় ও সেই সঙ্গে মানুষকে সুস্থ বলবান ও কার্য্যক্ষম ক'রে তোলে।

'পাড়ে'র ইঙ্গিত

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তোমার ছাদের 'পরে রোদে হাওয়ায় বসন্‌টি দাও মেলে ;
ওই অঙ্গহারের তরঙ্গ তায় লীলায় যে যায় খেলে।
আমার প্রাণের কূলে পরশ তাহার যেম্‌নি এসে লাগে,
তোমার চপল চলার সুরটি যেন মন্‌টি ভ'রে জাগে।
তোমার তাঁতের শাড়ীর খয়ের-রঙা চওড়া পা'ড়ের বুকে
আমার নয়ন-তারার দৃষ্টি হারায় কোন্ মাধুরীর সুখে !

তোমার "মিলের" শাড়ীর ওই যে সাদা ছুটি কালোর মাঝে
তাহার গোপন বাণী মর্ম্মে আমার রক্ত রাগেই বাজে।
আমার মিহি পুরুর, সরু গুরুর সকল ভাষাই জানা ;
তাদের বুঝি আমি কোন্ রেখাটি কেন কখন টানা।
তাদের সকল রঙের সব ইসারাই মুখর আমার কাছে,—
কেবল তুমিই জানো কি কথা মোর লুকিয়ে সেথায় আছে।

নারী-সমস্যা

ভিক্ষু-অকিঞ্চন

এই মাতৃ-সাধকের দেশে নারী আজিকার দিনে প্রধান সমস্যায় দাঁড়াইয়াছেন! এত শিক্ষা-দীক্ষা, এত স্কুল-পাঠাগার, এত উন্নতির চরমোৎকর্ষ, সেকাল ও একালে আজ কত প্রভেদ,—তবুও নারী লইয়া সাহিত্য ও সমাজে এত মহামারী কেন? নারী আজ কি আদর্শ লইয়া চলিবেন, ইহাই হইতেছে সংস্কারকগণের প্রধান চিন্তা ও মতভেদের কারণ। আমরা কোন কিছু বলিবার অগ্রে, বিজ্ঞানসম্মত নর-নারীর সম্বন্ধ বিচার করিব।

নারী কি? Spencer বলেন, Woman is only a man paralysed and arrested in his evolution. Darwin বলেন, Man is only a woman who has finished the cycle of her evolution. Velpeau বলেন, Women are degenerate beings of a primitive masculinity.

এই সব বৈজ্ঞানিক উক্তির উপর নির্ভর করিতে হইলে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর নীচত্বই স্বীকার করিতে হয়—নারী যে পুরুষের সহধর্ম্মিণী, এই উচ্চ আদর্শটিতে ব্যাঘাত পড়ে।

জগতের প্রত্যেক কার্য্যের কারণে পুরুষ এবং স্ত্রীভাব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দেখা যায়—পুং এবং স্ত্রী শক্তি মিলিত না হইলে কর্ম্মোৎপত্তি ঘটে না। এই পুংশক্তিকে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ভাষায় Arrhens (male) ও স্ত্রীশক্তিকে Thely (female) বলা হয়।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক Weininger তাঁহার Sex and Characterএ লিখিয়াছেন—Every single organ and every single cell possesses a sexuality lying somewhere between Arrhenoplasm and Thelyplasm. এই পরস্পর অভিভাব্য অভিভাবক ভাবে প্রত্যেক বিশ্ব-ব্যাপার চালিত হইতেছে। Weininger আরও একটি মজার কথা উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছিলেন যে,—Any individual is never to be designated merely as a man or a woman, but by a formula showing that it is a composite of male and female characters in different proportions.

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষের ভিতরে নারীর ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং নারীর ভিতরে পুরুষের ভাব নিহিত আছে! শুধু মানসিক প্রবৃত্তিতেই নহে, দৈহিক যন্ত্রাদিতেও নারীর মধ্যে পুরুষের চিহ্ন ও পুরুষের মধ্যে নারীর চিহ্ন প্রাথমিক (rudimentary) অবস্থায় বর্ত্তমান। যাহা নারীতে বিকশিত, তা পুরুষে মুদিত হইয়া রহিয়াছে—যেমন নারীর স্তন পুরুষে নিষ্ক্রিয় ভাবে বিদ্যমান, যেমন পুরুষের গুম্ফ ও শ্মশ্রু নারীতে নিষ্ক্রিয়, এমন-কি উভয়ে উভয়ের জননেন্দ্রিয়কেও স্ব স্ব অঙ্গে মুকুলিত করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই বুঝি দৈত্যগুরু শুক্র নারী গ্রহ রূপে এবং শিব অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে কল্পিত হইয়াছেন।

অর্থাৎ নারীর ইন্দ্রিয় পুরুষে অস্ফুট ভাবে বিদ্যমান, এবং পুরুষের ইন্দ্রিয় নারীতেও ক্ষুদ্রাকারে রহিয়াছে! শুক্রের আর একটী নাম কাব্য। কবিদের ভিতর নারীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক। কবি-প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিতে গিয়া Charles Godfrey Leland তাঁহার The female mind in man গ্রন্থে বলিয়াছেন, Great geniuses...all had the feminine soul very strongly developed in them. There are innumerable men who do good work without any aid from the woman within. But they rarely produce any thing original or in accordance with beauty because they lack imagination.

আমাদের দেশে সাধক এবং কবিগণের ভিতর এই উক্তির প্রমাণের অভাব নাই। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের ভিতর এই সত্য পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত—স্ত্রীভাব তাহাদিগকে অভিরমিত না করিলে, বৈষ্ণব সাহিত্যের রসসৌন্দর্য্য এমন মধুর ভাবে বাংলা দেশকে কোমল করিয়া তুলিত না। বাংলার ভাবের ঠাকুরের না কি নারীর মতই রজঃপাত হইত! বাংলার রামপ্রসাদ গানে যে আজিও অদ্বিতীয় হইয়া রহিয়াছেন, এ একমাত্র তাঁহার মাতৃ-সাধনার ফলে! রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে এত কোমল সুর, কল্পনার যে এত সূক্ষ্মতা, তাহাও তাঁহার ভিতরে নারী-হৃদয়ের গুণে! Lelandএর যুক্তির মূল ভিত্তি হইতেছে এইরূপ,—Every man has female double or inner self and every woman has a male mentor or prompter—The Alternate Sex.

Mercierও তাঁহার Conduct and its Disorders নামক গ্রন্থে স্বীকার করিতেছেন যে,—We find men with the characteristic womanly qualities of passivity, of willingness to be controlled and protected rather than eagerness to control and protect, of tact rather than domination, of intuition rather than reasoning, of sympathy and pity rather than equity and justice.

এই যুক্তির সবগুলিই বাংলা দেশের দাসভাবাপন্ন হিন্দু পুরুষদের সম্বন্ধে খাটে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের এই অগণ্য নারী-হরণের অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে।

আমাদের উচ্চ শিক্ষিতা নারীদের ভিতর যে বিদ্রোহের ভাব আজকাল নজরে পড়িতেছে ও কাগজে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মূলেও নারীর পুরুষ ভাবকেই লক্ষ্য করি। Weininger বলেন, It is only the male element in emancipated women that craves for emancipation.

অভ্যাস হইতেই স্বভাবের উৎপত্তি। আদিমযুগে নারী ও পুরুষের প্রকৃতি ও আকৃতি অনেকটা একই ভাবের ছিল। আন্দামান প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের নরনারীর ভিতর প্রভেদ অল্পই বিদ্যমান,—আবার আমেরিকার উন্নত নারীরা দাঁড়াইয়াছেন যেন পুরুষের বাবা। তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়েই—কি দৈহিক, কি মানসিক ক্ষেত্রে পুরুষকে হার মানাইয়াছেন। তাহার কারণ, সংসার-ক্ষেত্রে তথায় পুরুষের জীবন-যাত্রার চিন্তা অধিক; নারীর বিড়ালের বিবাহ ব্যতীত কিম্বা কুকুরের সাজসজ্জা ব্যতীত কোন চিন্তাই নাই—স্ফূর্ত্তিতে তাহারা যেন জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই ভরপুর! আমাদের দেশে বিধবারা যত নির্য্যাতনই ভোগ করুন না কেন, পৃথিবীতে অমর বর লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন—তাহার কারণ ব্রহ্মচর্য্য জন্য স্বাস্থ্যানুকূলতা।

নারীর উদ্ধত ভাবকে লক্ষ্য করিয়া Sir Almroth Wright বলেন—"The women are insolvent; they do not pay their way; they should be grateful if they do not starve; still more if they live in ease or luxury; grateful to man who "makes" all the money." এসব দেশের অতি-শিক্ষিতাদের কথা ছাড়িয়া দিই, আমেরিকার বিদুষীগণও জীবনে কায খুঁজিয়া পান না—বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করা ব্যতীত যেন তাঁহাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্যই নাই।

William Thomas তাঁহার Sex and Society নামক গবেষণাময় পুস্তকে লিখিয়াছেন—The American woman of the better classes has superior rights and no duties and yet she is worrying herself to death, not over specific troubles,

but because she has lost her connection with reality. Many women, more intelligent and energetic than their husbands and brothers, have no more serious occupations than to play the house cat, without ornament.

উচ্চ শিক্ষার এই ত জাজ্জ্বল্যমান অবস্থা! তবুও তাহারা স্বাধীন। আর আমাদের বাবু বাঙ্গালীর অর্দ্ধাঙ্গিনীদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, অথবা দাঁড়াইয়াছে বলুন ত! অনেক উচ্চ-শিক্ষিতা হোটেল ও বিলাতী উপকরণে মত্ত আছেনই, পরন্তু ঘোড়-দৌড়ের জুয়াতেও মগ্ন শুনিতে পাই!

আমেরিকার Dr. David Starr Jordan তাঁহার Foot-notes to Evolution গ্রন্থে আপশোস্ করিতেছেন, "Woe to the land that works its women! says Laurence Gronland. But there is equal woe to the land in which women find nothing to do."

নারী পুরুষের সমধর্ম্মিণী হইতে চান—হিন্দুর শাস্ত্র তাহাতে কোন দিনও বাধা দেয় নাই; বরং নারী সহচারিণী না হইলে পুরুষ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, ইহাই উদার শাস্ত্রের মর্ম্ম! কিন্তু এ কি, সহধর্ম্মিণীর পরিবর্ত্তে ওই সব দেশে ও আমাদের হাল ফ্যাশানী আব্‌হাওয়ায় নারী ক্রমশঃই তাহার মাতৃ-স্বরূপ ভুলিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়িতেছেন।

বর বড় না কনে বড়? কনেই বড়। প্রকৃতই বড়—নারী অগ্রে, পরে পুরুষ। কারণ, পুরুষ যতই বড় হউক, তাহাকে নারীর গর্ভে প্রবেশ করিতেই হইবে। পুরুষ ত শতখণ্ডে বিভক্ত চঞ্চল-চিত্তপারা,—নারী গম্ভীরা স্থিরা সৌদামিনী—কটাক্ষে সে পুরুষকে পদতলে মুমূর্ষু করিয়া রাখিতে পারে। হিন্দু এসব তত্ত্ব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ভাবিয়া আসিতেছে। তাই নারী হিন্দুর চক্ষে কেবলি রক্ষয়িত্রী—সর্ব্ব কারণময়ী সর্ব্বমঙ্গলা।

বৈজ্ঞানিক Dr. Ward ও স্বীকার করেন—For long generations women exercised rule over man and matriarchy was the apparently natural order of things. মালাবার, বর্ম্মা এবং খাসিয়া রমণীর কর্ত্রীভাব যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা এই যুক্তি একবাক্যে স্বীকার করিবেন। উক্ত বৈজ্ঞানিক আরও বলেন,—At the outset all organisms were self fertile and there was no sex. All life was originally and essentially female. Then followed the development of male sex. তাই হিন্দু সাধকের কাছে মা এত বড় জিনিস!—নারীর পবিত্রতা এত প্রাণতুল্য উপাদান; আর এই পবিত্রতার বিরুদ্ধে যাঁহারা সংস্কারক সাজিতে চান, তাঁহারা সমধিক ঘৃণার পাত্র!

নারী সঞ্চয়-বুদ্ধিশালিনী, পুরুষ বেজায় উচ্ছৃঙ্খল, বিনাশধর্ম্মী। পুরুষের বীর্য্যকীটগুলা এই অত্যধিক ব্যয়-স্বভাবের জন্য, Rolphএর মতে ক্ষুদ্র ও দুর্ভিক্ষ্য-পীড়িত; কিন্তু নারীর রজঃকোষ গুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও গম্ভীর, আর এই গাম্ভীর্য্য-গুণের জন্যই নারী-চরিত্র ব্যয়শীল পুরুষ চরিত্রকে দমন করিয়া চলেন বা তাহা হইতে তফাতে থাকেন। নারীর এই রাসভারি ভাবের জন্যই, প্রবৃত্তি-পরায়ণ পুরুষ ভয়ে মাথা নত করিয়া চলেন।

বৃহৎ-সংহিতার স্ত্রী-প্রশংসা-অধ্যায়েও বর্ণিত হইয়াছে—

ন শতেনাপি বর্ষাণামপৈতি মদনাশয়ঃ।
তত্রাশক্ত্যা নিবর্ত্তন্তে নরা ধৈর্য্যেণ যোষিতঃ॥ ১৪

অর্থাৎ, পুরুষদিগের কামবাসনার একশত বর্ষেও নিবৃত্তি হয় না, একমাত্র শক্তিহীন হইলেই কামবাসনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু রমণীগণ ধৈর্য্য দ্বারাই কামবাসনার নিবৃত্তি করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই নারীদিগের বল অধিক।

স্ত্রী-স্বভাব হইতেছে গঠনময়ী—anabolic এবং পুরুষ ধ্বংসপ্রবৃত্ত অর্থাৎ catabolic। যেখানে গঠনের প্রভাব অধিক, সেখানে নারীর উৎপত্তি; যেখানে ধ্বংসের মাত্রা অধিক, সেখানে পুরুষ জন্মিয়া থাকে। আর এই জন্যই দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের পরই পুরুষ অধিক জন্মায়; এবং সুসময়ে স্বচ্ছন্দাবস্থায় বড় লোকের ঘরে কন্যা সন্তানই অধিক দেখা যায়। অবশ্য এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। আর এই স্থিরতার জন্যই নারীর লীলাস্থল হইতেছে গৃহ, ও কর্ত্তব্য হইতেছে সন্তানরক্ষা। আর পুরুষের দীর্য্যকীটের চঞ্চল স্বভাবের জন্য তাহার লক্ষ্য হইতেছে বহির্মুখীনতা।

Mercier বলেন—Women is by nature a monogamist; man has in him the elements of a polygamist. তাহা না হইলে সৃষ্টি রক্ষা পাইত

না। যেখানে এই ভাবের অসংযত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেখানে ধ্বংস দ্রুত অগ্রসর; ও মৃত্যু সে গৃহকে-সমাজকে—জাতিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। নারীর স্বাস্থ্য ও নির্ম্মলত্বই হইতেছে জাতীয় উন্নতির প্রধানতম উপাদান। সে অলঙ্কল্পে বাঙ্গালী আজ কি করিতেছে? শিক্ষা নারীর উপায় হইতে পারে; কিন্তু নারীর লক্ষ্য হইবে চরিত্রে। আজ শিক্ষার অভাব বড় নাই, কিন্তু অভাব জন্মিয়াছে উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও চরিত্রের! যে শিক্ষা নর-নারীর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিল না, উপরন্তু বিলাস-ব্যসনে ও অসার ব্যয়ে নিমগ্ন করিয়া আরও দুর্দ্দশা বাড়াইয়া তুলিল, সে উচ্চশিক্ষার সাধারণের উপকার কি? উচ্চশিক্ষার নামে নারীর আজ যে সব অসংযত চরিত্র দেখিতে পাইয়াছি, ইহার মূলে পুরুষের মূর্খতাই কি একমাত্র কারণ নহে? বিদ্যা বিলাসকে আনিয়াছে,—খরচ শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে—অহমিকাকে চরমে তুলিয়াছে,—ঋণ করিয়া ঘৃত পান করাইতে শিখাইয়াছে,—মিথ্যা প্রবঞ্চনা হাড়ে হাড়ে ঢুকাইয়া দিয়াছে। কিন্তু বিদ্যার যাহা ভূষণ, সেই বিনয়কে আনিতে পারে নাই—"simple living and high thinking are no more."—শিক্ষা দশের ও দেশের কোন উপকারই সাধন করিতে পারে নাই।

মাতৃত্বই হইতেছে নারীর বিধিনির্দ্দিষ্ট পরিণতি। অনেক অসংযত নারী ও সন্তানের মুখ দেখিয়া পবিত্রতার পথে ফিরিয়াছে। য়িহুদী জাতির একটি প্রবচন আছে—The Lord can not be everywhere; so He made mothers.

M. Sahatier বলেন—The active and seeking spermatozoon showing centrifugal tendencies reveals the essential qualities of man, while the passive state of the egg will predispose woman to a concentrated domestic existence.

বর্ত্তমানের এই সমান দাবীর সন্ধিক্ষণে আজ একজন প্রসিদ্ধ নারীর উক্তি এইরূপ। Dr. Gina Lomroro (ইতালীর বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদের কন্যা) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং ফরাসী দেশের Finot প্রভৃতির মতকে নিষ্প্রভ করিয়া বলিতেছেন—Woman is alterocentric and man is egocentric. Women live for others, make others the centre of their desires. Man is not like this. He makes himself and his pleasures and his activities the centre of the world in which he lives. অর্থাৎ অন্তর্মুখীনতা নারীর ধর্ম্ম; এবং পুরুষের স্বভাবধর্ম্ম হইতেছে বহির্মুখীনতা। শিব চতুর্ম্মুখ হইয়াছিলেন এই কারণেই। কথিত আছে, একদা পার্ব্বতীসহ শিব উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অপ্সরা তিলোত্তমা শিবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পাছে পার্ব্বতীর দিকে বিমুখ করিলে তিনি কুপিতা হন এই ভয়ে শিব অপর চতুর্ম্মুখ সৃষ্টি করিয়া চতুর্দ্দিকে তিলোত্তমাকে দেখিতে লাগিলেন। ইহার রহস্যই হইতেছে পুরুষের বর্হিমুখীনতা ও স্বার্থপরতা যাহাকে ইংরাজীতে centrifugal tendency কহে।

বৃহৎ সংহিতায় এতদ্ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে—

আব্রহ্মকীটান্তমিদং নিবদ্ধং পুংস্ত্রীপ্রযোগেন জগৎ সমস্তম্।
ব্রীড়াত্র কা যত্র চতুর্মুখত্বমীশোঽপি লোভাদ্যমিতো যুবত্যাঃ॥

পরার্থপরতা গুণেই নারীগণ পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। পুরুষের সঙ্গে বর্ত্তমানের আয়-ব্যয়ের সম্বন্ধ; কিন্তু সঞ্চয়শীলা নারী সন্তানকে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকে জন্ম দিয়া থাকেন। নারী হইতেছে জাতির মূলধন—সেই মূলধনের আমরা নানা দিকে হইতে সর্ব্বনাশ করিয়া জাতীয় অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত করিতেছি! বর্ত্তমানের আপাতমনোরম সুখে আমরা ভবিষ্যৎকে হারাইতে বসিয়াছি।

নারী বলিতে আমরা যেন উচ্চ শিক্ষিতা নারী কয়টিকেই বুঝি; কিম্বা যাঁহারা শিক্ষা-দীক্ষার গুণে মহা বিদ্রোহ ঘটাইতে চান, তাঁহাদের আবেদন-নিবেদনকেই বুঝি! দীনা, অধঃপতিতা নিগৃহীতা নারীর হাহাকার আমাদের কর্ণে যায় কি? কলিকাতার নারীদিগকে বাতাস আলো যোগাইবার জন্য সংস্কারকগণের বক্তৃতার আজ অভাব নাই; কিন্তু ওই যে পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিতা অসহায়া অবলাগণ আজ নারীর শেষ সম্বল সতীত্ব দুর্ব্বৃত্তদের কবলে হারাইতেছেন—তাঁহাদের জন্য আমরা কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি—তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য আজ কয়টি প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে?

দরিদ্রের ক্রন্দনের সঙ্গে আমাদের নর-নারীর শিক্ষিত

জীবনের যোগ আছে কি? দরিদ্রের রাষ্ট্রত্ব রাজ্যে আমরা নামিতে শিখিলাম কই! পল্লীগ্রামের নাম শুনিলে আমরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে শিহরিয়া উঠি, চাষা মজুরের ছায়াকেও আমরা কাছে ঘেঁসিতে দিই না—অশিক্ষিতা পল্লীবধূগণ আমাদের সহরের অতি-শিক্ষিতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কি? পল্লীগ্রামের নারী-জীবনের উন্নতির জন্য সহরের নারীগণ কতটা আয়াস স্বীকার করিয়াছেন? তাঁহারা তাঁহাদের বিলাস-ব্যসনে যে অপব্যয় করেন, তাহার শতাংশের একাংশ দিয়াও এই দুর্দ্দিনে তাঁহাদের হতভাগিনী ভগ্নীদিগকে সাহায্য করিয়াছেন কি? যাহাদের দাবী রক্ষা করিলে একটা কাযের মত কায হয়, তাহাদের জন্য আজ সংস্কারকদের ঐকান্তিকতা কই?

রুশিয়ার সংস্কারক Pisareff এই সব আপন-ভাবিনী সহরবাসিনীদিগকে Muslin Girls বলিয়াছেন—They are Muslin Girls. Their conception of the universe does not go much beyond their muslin dresses." তাহাদের শিক্ষাকেও তিনি muslin education বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন। "What good will they bring to the toiling masses?" ইহাই হইতেছে রুশিয়ার সকল প্রকার সংস্কারকের প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন। সে প্রশ্ন কতটা আমাদের মত ভাবপ্রবণ জাতি পূরণ করিতে পারিয়াছে, তাহাই আজ দেখিবার বিষয়। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে উচ্চ শিক্ষার নামে আমরা এতকাল কেবল ঘরের অর্থ ব্যয় করিয়া জলের আল্‌পনাই দিয়া আসিয়াছি; এবং জীবনে মসলীন ভাবই বাড়াইয়া তুলিয়াছি। উচ্চশিক্ষার নামে আমরা মাটির পুতুলের স্থানে চীনের পুতুল গড়িতেছি মাত্র; সত্য ও স্বাধীনতার নামে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বহিরাবরণকেই প্রশ্রয় দিতেছি মাত্র! শিক্ষার যাহা আসল বস্তু, সেই সাহচর্য্য বা সমবেদনা আমাদের নর-নারী-জীবনে ফুটিয়া উঠিল কই? Sunday school prize system যে আমরা মজিয়া রহিলাম। এত করিয়াও Doll's house-এর প্রতিক্রিয়া আসিল কই? Artএর অজুহাতে যে artfulness বাড়িয়া যাইতেই চলিল। সেকালের গোঁড়ামি ত অপছন্দের জিনিস; কিন্তু ভণ্ডামিতে যে সব উৎসন্ন হইয়া গেল। সভ্যতার একটা কুসংস্কার আছে বই কি।—যাহাকে টলষ্টয় নাম দিয়াছেন—the superstition of civilisation!

আমরা অপর দেশের মিথ্যার মুখসটার অনুকরণে বিশেষ পটু; কিন্তু তাহাদের ভাল গুণ কি আমরা একটিও গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? বিপদের মাঝ-দরিয়ায় হাল ধরিবার শক্তি বা সৎসাহস ত আমরা এত উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও অর্জ্জন করিতে পারিলাম না। তাহাদের দেশেও আজ নারী বিষয়ে ভুক্তভোগী অনেকে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, নারী পুরুষের প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে সহধর্ম্মিণী; এবং এখনও দরিদ্রের ভিতর এদেশে এই হরগৌরী ভাবই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। স্বামী যদি বাহিরের ক্ষেত্রে হল চালনা করেন, স্ত্রীও ঘরের অঙ্গনে ঢেঁকিতে পা দিয়া ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করেন, এমন কি সমকক্ষ হইয়া বিল বাছেন,—বিলেই স্বামীর জন্য আহারাদি লইয়া যান। নরনারী সমানে পরিশ্রম করেন। যত গোল বাধিয়াছে সহরের অতিভাবিনী কৃত্রিম-পণ্ডিতাদের লইয়া! এখানে স্বাভাবিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া কল্পিত অভাবের অবস্থায় সমাজ পরিচালিত হইতেছে। অর্থ ব্যতীত সহরে এক পাও চলিবার বা এক দণ্ড থাকিবার উপায় নাই। সহধর্ম্ম অর্থাৎ partnership এখানে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। নারীর এখানে মডেল পড়া ছাড়া কর্ম্ম নাই। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দায়িত্বের অপেক্ষা দাবী এইরূপ আগেই বেশী দেখা দিয়াছে। স্বভাব এসব ক্ষেত্রে আর পথ-প্রদর্শক নহে—পুরুষের স্কন্ধেই সকল অত্যাচার এই সহর-যাত্রার চালানো হইয়াছে—পুরুষের ভাবনা, নারীর ভাবনা অপেক্ষা এখানে বহুগুণ অধিক! ছেলের লেখাপড়া, কন্যার তদুপযুক্ত শিক্ষা ও ততোধিক কঠিন সমস্যা—বিবাহ পুরুষের আয়ুকে পলে পলে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। ইহার জন্য সহরের এই অবরোধময় অবাস্তব জীবন-যাত্রাই বিশেষভাবে দায়ী। এ সমস্যার মীমাংসা কোনরূপ পরিবর্ত্তনে কোন দিনও ঘটিবে না—একমাত্র নির্ব্বোধ পল্লী-জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন ছাড়া! সেই বিশ্বেশ্বর-ঘরণী অন্নপূর্ণার মুষ্টি-ভিক্ষা ছাড়া! আমার মনে হয় বিধবার সংখ্যা প্রবৃদ্ধি হইবার অন্তর্নিহিত কারণ পুরুষের এই ক্ষয়কারী সদাই বিমর্ষভাব! এই পরগাছা অবস্থার সংশোধন ব্যতীত বাবু বাঙ্গালীর অন্য

উপায় নাই। যত মিথ্যা, যত পাপ, যত মোহ, যত ব্যভিচার এইরূপ ভিত্তিহীন জীবন যাপনেই সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। এই সর্ব্বব্যাপী মড়ককে বাঙ্গালী আজ একবাক্যে যদি তাড়াইতে সক্ষম হয়, তবেই পুনরায় জীবন আসিবে। রুসিয়ার এই ভাবেই জাতীয় জীবনের জাগরণ আসিয়াছিল—রুসিয়ার মত পল্লীর চাষার কাছে, কলের মজুরের পার্শ্বে আজ কি দলে দলে শিক্ষাভিমানী আমাদের আদুরে গোপালেরা সাধারণ জীবন-যাপন করিতে পারিবে?

Prince P. Kropotkinএর Russian Literature গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—It was this very same movement "towards the people" which had inspired so many of the Russian youths to go to the villages and the factories and to live there the life of the people, which finally brought Tolstoy, also, to reconsider his position as a rich landlord. আমাদের শিক্ষাভিমানী যুবক যুবতী ও ধনাভিমানীরা এই অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজী হইতেন কি?

পরার্থে স্বার্থের বলিদানই হইতেছে সমাজ-সমস্যা পূরণের একমাত্র উপায়—এবং সেই পরার্থের মূলে দাঁড়াইয়াছেন নারী। ফরাসী জীবনের সব ক্ষেত্রেই আজ অসম্ভব পরিবর্ত্তন। ফ্রান্সদেশের পূর্ব্ব স্বেচ্ছাচারতন্ত্র এখন ক্রমশঃ আপন ধাতুতে ফিরিয়া আসিতেছে। আমরা ত নর-নারীর বিবাহ সম্বন্ধে প্রেমকে আগে টানিয়া আনি—ফরাসী এখন বুঝিতে শিখিয়াছে,—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা! বিবাহটাও জাতির উন্নতির জন্য—আত্মসুখ চরিতার্থ করিবার জন্য নয়।

M. Paul Adam বলেন—Love is not an adequate basis for marriage; the latter is a social institution existing exclusively for the benefit of society and of the race and in which the likes and dislikes of the individual count for nothing. The young girl must not marry for love a penniless youth, for the children will not receive their due, seeing that a good education is an expensive matter. The bachelor of fifty must not marry and thereby frustrate the legitimate hopes of his nephews and nieces. দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য বোধেই বিবাহে আবদ্ধ হইবে—দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য আত্মসুখকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে হইবে।

জার্ম্মাণ দার্শনিক Nietzcheও এইরূপ সুমঙ্গলের কথা বলেন—For the future of marriage larger burdens to be laid upon bachelors. Privilages of all kinds for fathers of large families. অর্থাৎ অবিবাহিত নর-নারীর উপর সমাজের বেশীর ভাগ বোঝা চাপাইতে হইবে; এবং যাহারা সন্তান-সন্ততি লইয়া বিশেষ ভাবে জড়িত, তাহাদিগকে বহু সামাজিক সুবিধা দান করিতে হইবে।

এই সব দরকারী কথা আমাদের সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ নর-নারীকে বিবাহ-বন্ধনে জড়িত করিবার অগ্রে ভাবিয়া দেখিবেন কি?

Nietzche বিবাহকে যেরূপ ধ্যান চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। তিনি বলেন,—

Marriage—by that I mean the will of two to create one who is greater than they that created him. Reverence for each other I call marriage, and reverence for him that is inspired by such a will. বিবাহে যত দিন না এই শ্রদ্ধার ভাব ও বিবাহের ফল পুত্র-কন্যার প্রতিও যতদিন না শ্রদ্ধা জাগিতেছে—তত দিন বিবাহ কেবল কথার কথাই থাকিয়া যাইবে। পুত্র হইবেন সৃষ্টিধর। কেবল বংশ বৃদ্ধি করিলেই বিবাহ সার্থক হইবে না—বংশ যাহাতে উজ্জ্বল হয়—এইরূপে সৃষ্টিধরগণের সৃষ্টি করিতে হইবে। জননীর মত জননী না হইতে পারিলে প্রবীরের মত পুত্র কখনও জন্মে না। তাহা না হইয়া কেবল লেংটী ইন্দুরের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করিয়া কোন লাভ নাই। এই Nietzcheই বলিয়াছেন—The good of humanity lies in its noblest specimens.

একমাত্র মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশই হইতেছে—জাতীয়

জীবনের উন্নতির পরিচয়। এই মাতৃ-সাধনা দেশে আজ সেই মাতৃমন্ত্রের অভাব হইবে কি? যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব পূজনম্—এই যে দেশের মর্ম্মকথা, সে দেশ আজ এমন ছাগতন্ত্রে বিমোহিত কেন? তাহার কারণ মাতৃ-জীবনের সংস্কারের আজ একান্ত অভাব!

Ibsen বলিয়াছেন—"Nearly all men who go to ruin early have had untruthful mothers." বড় খাঁটি কথা। সাধক, আজ তোমার সত্যের পুষ্পাঞ্জলি লইয়া জননী ও জন্মভূমির চরণ-কমল শুভ্র নির্ম্মাল্যে সাজাইয়া দিতে পারিবে কি? আর শঠতায় জগন্মাতা ও দেশ-জননীর চক্ষে ধূলি দিও না। থাকে চিনিতে শিখ, তবেই নর-নারী, আজ তোমার জীবন্মুক্তি! একমাত্র মাতৃত্বের নাশেই এ দেশের আজ এত অবনতি। আজ নারীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে—তুমি কেবল সামান্য নারী নও—তুমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ভাবিনী ত্রিনয়নী অসাম্প্রদায়ী মাতা। তোমার অন্বেষণেই রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন! অনন্ত প্রসবিনী, তোমার অন্বেষণে ক্ষুদ্র আমরা—আমরাও ঘুরিয়া বেড়াইব—জীবন-পাত করিব—তবুও হয় ত তোমার দুর্লভ চরণের সাক্ষাৎ পাইব না। হায় মা সতীরাণী, তোমারি জলৌকাপী সন্তানরা আজ বলিতেছে—নারীর সতীত্ববোধ একটা অসংস্কার! নারী, তুমি আজ ঘরে ঘরে জাগ্রতা হইয়া এই সব অসুর-বুদ্ধি-প্রণোদিত পুত্রকন্যাদিগকে শুভ বুদ্ধি, সুমতি দাও! মা হইয়া দাঁড়াও।

"পুষ্প-পরাগ" *

(সমালোচনা)

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কবির চিত্ত-কাননে বিকশিত নানা ভাব-পুষ্পের অনিন্দ্য আনন্দ-পরাগে এই সুন্দর কাব্য গ্রন্থখানি পরিচর্চ্চিত। কবি প্রফুল্লময়ী দেবী বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিতা ন'ন। স্বদেশীর যুগে যখন প্রথম তাঁর "বীরবালক" কাব্যখানি প্রকাশিত হ'য়েছিল, তখনই সেই তরুণী কবির শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অনেকেই বিস্মিত হ'য়েছিলেন। তার পর অনেক দিন আর তাঁর কোনও কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। শারীরিক ও মানসিক অবসাদ তাঁকে দীর্ঘকাল কল্প-লোকের ভাব-বৈজয়ন্তী হ'তে বঞ্চিত করে রেখেছিল। মাঝে মাঝে কেবল মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত দু' একটি কবিতার ভিতর দিয়ে এই অন্তঃপুর-চারিণীর প্রতিভার অম্লান প্রদীপে দেবী ভারতীর পূজারতি হ'চ্ছে দেখা যেতো। আজ সেই অন্তরালস্থ পূজারিণীর অর্চ্চিত দীর্ঘ-সঞ্চিত অর্ঘ্য-পুষ্পের পরাগ-সম্ভারে বাণী-মন্দির সুরভিত হয়ে উঠেছে।

তাঁর প্রথম রচনা "বীর বালক" কবির প্রাণের অনন্তণ্ঠিত রূপটির সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগটি উপস্থিত ক'রতে পারে নি। বীরত্ব ও মহত্বের উচ্চ শিখরাবলম্বিনী যে কবির আমরা সে দিন নাগাল ধ'রতে পারি নি, 'পুষ্প-পরাগের' মধ্যে আজ তাঁর অনাবৃত মনটিকে আমরা একেবারে আমাদের অতি নিকটতম ক'রে পেয়েছি। কবির সাধ ছিল :—

"আমি চাই অখ্যাত জীবন
নিরজন পল্লী পথপাশে
অতি ক্ষুদ্র বন-পুষ্প হ'য়ে
রব দীন তৃণাচ্ছন্ন বাসে।

* * * * *

আপনাতে সম্পূর্ণ আপনি
আপনাতে আপনি বিভোর
ভুলে গিয়ে বিশাল ধরণী
ভুলে গিয়ে কেহ আছে মোর!

* * * * *

একটি প্রদীপ্ত মেঘ-হারা
অম্লান উষার অপেক্ষায়
ধ্যান ধরি রহিব বসিয়া
কোরক জীবন যবে যায়!"

কিন্তু আজ মনে হয়, কবির সে ধ্যানধারী কোরক-ব্রত যেন ষোড়শোপচারে উদ্‌যাপিত হয়ে গেছে! আজকে তাঁর—

"প্রভাতে প্রথম সূর্য্যোদয়ে
রবি-রশ্মি যেন অকস্মাৎ
শিহরিয়া অব্যক্ত পুলকে
করি দিল জীবন প্রভাত!"

জীবন প্রভাতের এই প্রথম অরুণালোকে কবির উষাস্নাত অন্তরের যে ছবিটি আমাদের চ'খে প'ড়ে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত কল্পনার সেই অরুণ

* শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত, মূল্য ১৲ একটাকা

আভায় তাঁর মানস-মূর্ত্তিটিকে রঞ্জিত দেখতে পাই। সে রূপ কখনও অনন্তের প্রেমে আকুল, কখনও প্রকৃতির প্রেমে পাগল, কখনও দেশ-মাতৃকার প্রেমে প্রগল্‌ভা।

এক দিন এই দুর্ভাগিনীর শোকার্ত্ত জীবনে যখন দুর্যোগ নিশীথের ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল, সে গাঢ় তমসা কবির সেদিনের তরুণ মনকে কিছুমাত্র কাতর ক'রতে পারে নি। তাঁর সেই কবিজন-সুলভ চির-নবীন অন্তরটি সেই গভীর আঁধারেও আশা-আনন্দে বিগলিত হ'য়ে তাঁর অন্তর দেবতাকে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান ক'রে বলেছিল—

"নিভিয়া গিয়াছে দীপ ক্ষতি নাই তায়,
জানি এ প্রান্তর মাঝে, সুদুর্গম পথ আছে—
আঁধারে এবার যাত্রা তোমায় আমায়!

* * * * *

এত দিন আলোকেতে ক'রেছি উৎসব
দুইজনে পাশাপাশি চখে চখে হাসিরাশি
না হয় এবার হবে আঁধার সে সব!

কবির অসহায় অন্তর যে সদা-জাগ্রত অন্তর্যামীর উপর নির্ভর ক'রে এমনিই অভয় হ'য়ে উঠেছিল, এমন কি ক্ষণেক চখের আড়াল হ'লে পর কবির অস্থির চিত্ত দুহাত বাড়িয়ে যাঁর কণ্ঠ বেষ্টন করে বোলতো'—

"তুমি এম্‌নি ক'রেই মিশেছো মোর
দিবা নিশির কাজে
ক্ষণেক তুমি আড়াল হ'লে
কি লাজ লোকের মাঝে!—
তন্দ্রা অলস স্বপন সুখে
কি গান শুনি তোমার মুখে,
মধুর তোমার কণ্ঠ সদাই
আমার বুকে বাজে!"

কবির সেই 'অচেনা সুহৃদের' ডাক বরাবরই তাঁকে উতলা ক'রে তুল্‌তো। প্রথমে সেই অপরিচিতের ডাক শুনে কবি কাতর হ'য়ে জান্‌তে চাইতেন—

"কেগো আমায় ডাকে?
হাওয়ার মতন না জানি কোন্
কুঞ্জবনে থাকে!
ডাক্‌লে তো তার পাইনে সাড়া,
কে উদাসীন—এমন ধারা?
রয় না দূরে পাছে ঘুরে
জড়ায় মায়ার পাকে!
নিরালা কোন্ নিলয় থেকে
কে গো আমায় ডাকে?—"

তার পর কবি সেই অচেনার সন্ধান ক'রে ফিরতে লাগলেন, মিনতি ক'রে তাঁর উদ্দেশে ব'লতে লাগলেন,—

"সাধ মেটে না শুধু কেবল পেয়ে তোমার সাড়া,
কোথায় তুমি লুকিয়ে আছ আমার সবার বাড়া!
আমি শুধু আমায় ভুলে খুঁজতে তোমায় চাই
ভোরের বাতাস যেমন ক'রে খোঁজে সকল ঠাঁই।
খুঁজ্‌তে তোমায় চাই গো আমি একলা আপন মনে—
সাঁঝের বায়ু খোঁজে যেমন স্তব্ধ কুঞ্জবনে!"

কবির এই আকুল আকাঙ্ক্ষার, এই সাগ্রহ ব্যাকুলতার উত্তরে তাঁর 'দয়াল দেব' তাঁকে দেখা দিলেন, আকাঙ্ক্ষিত দেবতার দর্শন ও স্পর্শ লাভ ক'রে কবি ধন্য ও চরিতার্থ হ'য়ে গেলেন। তখন—

"আকুলযায়ে অলকগুলি
বাঁধন হ'তে পড়িল খুলি
শিহরি উঠে এ দেহ কার—
মধুরতর পরশে?
হৃদয় যেন ছাড়িয়া উঠে
নদীরই মত হরষে!"

বিস্ময়ে আনন্দে কবি নির্ব্বাক! শুধু তাঁর "প্রাণ চাহে অসীমের মাঝে আপনারে দিতে ডুবাইয়া!" তার পর ধীরে ধীরে তাঁর বিস্ময়ের আবরণ সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি যখন ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন "দেবতা সম কি নিরুপম" তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা ক'রলেন—

"নীরব মম বীণার তারে তুলিয়া দেহ সুর,
দাওগো তারে তোমারি গানে করিয়া ভরপুর;
সখা হে তব অতুল স্নেহে
আলোক দিয়া আঁধার গেহে
জীবন দেহ এ মৃত দেহে জড়তা করি দূর,
(যদি) পরাণে থাকে গরব কণা আঘাতে কর চুর!"

নিবিড় মিলনের মহানন্দে প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে কবি তাঁর 'সবার বাড়া' প্রিয়তমকে জানিয়ে দিলেন যে—

"যেথায় তোমার নিবাস সখে, নিত্য যেথায় রও গো তুমি,
স্বর্গ সে কোন সুদূর পুরে, সেই ত আমার স্বর্গ-ভূমি!
নিত্য যেথায় দূর্ব্বাশিরে পড়ে তোমার পায়ের ধূলো;
সেই ত আমার দেহের ভূষণ কাজ কি রতন মাণিকগুলো!
তোমার চখের প্রেমাশ্রুজল যেদিন আমার শিরে ঝরি
গৌরবেতে পরাণ ভরে, রাণীর মুকুট মাথায় পরি!"

মিলন-নিশি শেষে দেবতা যখন কবির উন্মুক্ত হৃদয়-ভাণ্ডার নিঃশেষে লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন, কবি তখন কৃত্রিম অভিমানের সুরে গাঢ় অনুরাগ-রঞ্জিত কণ্ঠে তাঁর প্রিয়কে উদ্দেশ করে বলছেন—

"ওগো দস্যু! এমনি ক'রে লুঠ ক'রতে হয়?
লুণ্ঠিত প্রাণ মুক্ত কণ্ঠে ঘোষে তোমার জয়!
এতকালের আমার যারা, তাদের মাঝেও তোমার সাড়া

সগৌরবে তারাই তোমার বিজয়-নিশান বয়, ০ ০
প্রাণের সকল দিকেই তোমার লুঠের পরিচয় !"

* * * * *

"লুঠ করেছো ভাল, দয়াল ! লুঠ করেছো ভাল,
যে মশালটি নিয়ে হাতে, এসেছিলে লুঠের রাতে
সদয় হ'য়ে বারেক আবার সেই আলোটি জ্বালো,
ক্ষণেক তোমার স্বরূপ দেখা দেখাবে সেই আলো !
না হয় তাতে হৃদয় জোড়া, বাড়বে দাহ আগুণ পোড়া
তিলেক দেখার সুখের প'রে অনল জ্বালাই ঢালো !"

কবির আলোচ্য কাব্যখানির এইটিই হ'চ্ছে প্রধান সুর। এ ছাড়া আরও যে দুটি তার কবির কমনীয় বীণায় সমান তালে বেজেছে, তার মধ্যে একটি হ'চ্ছে তাঁর সুগভীর স্বদেশ-প্রীতি ! পুরাতনকে আঁকড়ে পড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না, নূতন করে' গ'ড়তে হবে, নবীনকে বরণ করে নিতে হবে—এই হ'চ্ছে তাঁর বাণী—

দেশকে যদি জাগাতে চাও মানুষ গড় হে
জীবন রণে মরণ পণে ঝাঁপায়ে পড় হে
কিসের ডর, পিণাক রবে
ভয়েরে জয় করিতে হবে
বাঁধন হারা স্রোতের মত ঝাঁপায়ে গড় হে
ভাসায়ে দিয়ে পুরানো খেদ
গড়িতে হবে নূতন বেদ
এ নব যাগে হে পুরোহিত, নূতন গড় হে !"

এই নূতনের অভিযানে তিনি নারীকেও সঙ্গে নিতে বলেছেন। তাদের পশ্চাতে ফেলে রাখলে দেশ এক পা'ও এগুতে পারবে না। সকল নারীর পক্ষ থেকে তাই এই মহিলা-কবি তাঁর স্বদেশবাসীকে আহ্বান করে বলেছেন—

* * * * *

"অবহেলাভরে ফেলিয়া তাহারে দাঁড়াতে তোমরা চাহিছ বিশ্বে
কৌতুকে হেসে দেখিতেছে ধরা তোমাদের এই বাতুল দৃশ্যে !
শৃঙ্খলে দিয়ে চরণ দুটিরে কে পারে ছুটিতে, লভিতে মুক্তি ?
নবজাগ্রত এদেশ আজি কি বুঝিবে না এ যে প্রলাপ উক্তি !
নারীরে ফেলিয়া অন্ধকারেতে তোমরা যতই হওগো উচ্চ,
ততই পিছনে টানিয়া রাখিবে অশিক্ষিতা সে রমণী তুচ্ছ !"

তাই 'স্নেহলতার' অগ্নিবরণে কবি তাকে প্রশংসা করতে পারেন নি। বালিকার এই শোচনীয় ভুলের সমর্থন কর'তে না পেরে তিনি কাতর হয়ে বলেছেন—

"নিন্দা যাদের ঘরে পরে
মূর্চ্ছা যায়গো ফুলের ভরে,
লোহিত বরণ ওগো মরণ নিয়ে বরণডালা
তোমার বুকে ছুটেছে আজ সেই বাঙালীর বালা !
এ নয় তো ইতিহাসের পুণ্য জহর-ব্রত
মানের তরে মরণ শরণ রাজপুত্‌নীর মত !"

'কোজাগরী' 'অভাগা' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য কবিতার মধ্যেও দেশের জন্য তাঁর নারী হৃদয়ের একটা অপরিসীম মমতা ফুটে উঠেছে দেখা যায়। ষাটটি উৎকৃষ্ট কবিতায় তাঁর এই সুন্দর কাব্য গ্রন্থখানি গ্রথিত হয়েছে। তার মধ্যে 'চাঁপার পূর্ব্বকাহিনী' 'সৃষ্টি-বৈচিত্র্য' 'দেশের মাটির টান' 'প্লাবন' 'মধুপের প্রতি কেতকী' ও 'শুষ্ক কণ্ঠের আত্মকাহিনী' প্রভৃতি প্রকৃতির অপরূপ রূপ-রহস্য-জড়িত কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্র রায় এই কাব্য-গ্রন্থের এক অপূর্ব্ব প্রচ্ছদপট অঙ্কিত করে দিয়েছেন। তাঁর পুষ্পপরাগের পরিকল্পনা একখানি চমৎকার চিত্র !

বিশ্ববরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রণতির অর্ঘ্য দিয়ে কবি তাঁর কাব্যখানি শেষ করেছেন। এটি তাঁর পক্ষে খুবই সুশোভন হয়েছে। কারণ, বাংলা সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথের অনিবার্য্য প্রভাব লেখিকার বহু রচনাকে প্রভান্বিত করে তুলেছে। আমরা এই প্রতিভাশালিনী মহিলা কবির দীর্ঘায়ু কামনা করি। মাতৃভাষায় তাঁর অসাধারণ অধিকারের ফলে তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও মিলের দৈন্য নাই, ভাবের অসঙ্গতি নাই,—ভাষার জড়তা নাই, ছন্দের অস্বচ্ছন্দতা নাই, যতির পদস্খলন নাই, দিব্য সহজ সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রত্যেক কবিতাটি কল্পনার অনবদ্য লীলায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বর্ত্তমান ভারতের ক্ষাত্রশক্তি *

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সরকার

ভারতের বর্ত্তমান সেনাদল নিম্নলিখিত কয়টি বিভাগে বিভক্ত—

(অ) স্থায়ী (regular) বৃটিশ্ সৈন্য—
(আ) স্থায়ী ভারতীয় (দেশীয়) সৈন্য—
(ই) সহায়ক সৈন্য—বিলাতি ও ফিরিঙ্গি—(auxiliary force)।
(ঈ) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সৈন্য (territorial force)
(উ) পোষাকী সৈন্য (army reserve)।
(ঊ) ভারতীয় মিত্র ও করদ রাজ্যের সৈন্য (ভারত সরকারের সেবায় নিযুক্ত)।

কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। সহায়ক ও রাষ্ট্রীয় সেনাদল কেবলমাত্র ১৯১০ সালে গঠিত হয়েছে। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্যবসায় কর্‌বার ও ক্রমশঃ কুঠি সুরক্ষিত রাখবার অজুহাতে তথাকথিত কেল্লা তৈরি কর্‌বার অনুমতি মোগল বাদশাহদের কাছ থেকে পাবার পর উক্ত কুঠি ও কেল্লাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতকগুলি অশিক্ষিত ইয়োরোপীয় ও অকেজো দেশীয় পেয়াদা নিয়ে এক সৈন্যদল গঠন করেছিল।

ভারতে প্রথম কোম্পানির সেনাদল গঠিত হয়েছিল বোম্বাইয়ে। দ্বিতীয় চার্লস্ ক্যাথারিণ অফ ব্র্যাগান্‌জাকে বিবাহ করায় বোম্বাই দ্বীপটি ইংলণ্ডের অধিকারে আসে। এই সময় কতকগুলি রাজ-সৈনিক ও বহু ভিন্ন জাতীয় ইয়োরোপীয় সৈনিক নিয়ে বোম্বাই রক্ষা করবার জন্য একটি সৈন্যদল গঠিত হয়। ক্রমশঃ সুরাটে ব্যবসায় আরম্ভ হবার পর সেখানে যে কুঠি স্থাপিত হয়, তার রক্ষার জন্য আরও সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। এই ভাবে বোম্বাইয়ে সৈন্যদলের সংখ্যা ও শ্রী বৃদ্ধি হয়। পরে বোম্বাই রাজার খাস মহাল থেকে হস্তান্তরিত হয়ে কোম্পানির তাঁবে আসে। ইহার কিছুকাল পরে কোম্পানির বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি জব চার্ণকের উপর একশত ইয়োরোপীয় সৈন্য নিয়ে একটা দল গড়বার আদেশ আসে। ১৬৯৬ সালে বাংলার প্রতিনিধি চার্লস্ আয়ার নবাবের নিকট থেকে সুতানুটির কুঠি সুরক্ষিত করবার অনুমতি পান। তাহার ফলে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মিত হয়। পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর ধরে ঐ দুর্গই সরকার বাহাদুর ও সৈনিকগণের প্রধানতম ভারতীয় আবাসরূপে গণ্য হয়ে এসেছে। এইরূপে মাদ্রাজেও ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ নামে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হ'য়েছিল। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি জায়গা তখন থেকেই তিনটি বিভিন্ন প্রেসিডেন্সি নামে অভিহিত হ'য়েছিল, এবং প্রত্যেক প্রেসিডেন্সির সৈন্যদলকে পরস্পর হতে পৃথক ভাবেই রাখা হ'তো। এক একটি প্রেসিডেন্সির প্রেসিডেণ্ট্ নিজ নিজ সৈন্যদলের অধিনায়কের কাজ ক'র্‌তেন, এবং তাঁরা বিলাতের বোর্ডের কাছে দায়ী থাক্‌তেন। তখনকার আমলে এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, সৈন্যদল সম্বন্ধে এ রকম ব্যবস্থা কিছু আশ্চর্য্যজনক নয়। গোরা সৈন্যদল সচরাচর বিলাত থেকেই আমদানি হ'তো। বর্ণশঙ্কর ইয়োরোপীয় ও দেশীয় জাতি নিয়েও সৈন্যদল গঠিত হ'তো। দেশীয় সৈন্যগণ সেকালে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাক ব্যবহার ক'র্‌ত, এবং নায়কগণের দ্বারা চালিত হ'তো।

এই হ'চ্ছে ভারতে ইংরাজ শক্তির সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস। ইহা ১৬০০ খৃঃ অঃ হ'তে ১৭০৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সময়ের কথা। এইবার ১৭০৯ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত কি হ'য়েছিল, দেখা যাক্। এ সময়ে কোম্পানীর এমন অবস্থা ছিল না যে, বিশেষ রাজ্যলিপ্সা থাকা সত্ত্বেও, দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে একটা গোলমাল বাধিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন্। কিন্তু অনতিবিলম্বে এমন আশ্চর্য্যজনক ভাবে ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তন হয় যে, সামান্য একটা ব্যবসাদার কোম্পানি শনৈঃ শনৈঃ একেবারে এদেশের রাজত্ব অধিকার ক'র্‌তে সমর্থ হয়। ১৭৪১ সালে বোম্বাই সৈন্যদল সংখ্যায় ও সরঞ্জামে বেশ উন্নতি লাভ করে। কারণ, তখন ২৬ জন বৃটিশ

*The Army in India And its Evolution অবলম্বনে লিখিত।

অফিসার, ১৬৬ জন নন্‌কমিশনড্ অফিসার, ১২৭৬ জন সৈনিক, ও ২৭ জন অনুচর নিয়ে বৃহত্তর সৈন্যদল গঠিত হ'য়েছিল। এই সময়ে আবশ্যক বোধে ক্রমশঃ যুদ্ধ-জাহাজের কামান ও সৈনিক নিয়ে আর্টিলারি যুদ্ধের উপকরণও সংগ্রহ করা হ'তে থাকে। ১৭৪৮ সালে বিলাতের বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ স্থির করেন যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে একদল (company) করে' গোলন্দাজ সৈন্য রাখা হবে, এবং প্রত্যেক দলে ৫ জন বৃটিশ অফিসার ও ১১০ বৃটিশ সেনানী থাকবে। এ ছাড়া একজন প্রধান কাপ্তেন ও একজন এঞ্জিনিয়ার তিনটি আর্টিলারি কোম্পানি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে বেড়াবে। এই বৎসরেই আবার সর্ব্ব প্রথমে প্রধান সেনাপতি অর্থাৎ জঙ্গীলাটের পদের সৃষ্টি হয়, এবং তাঁর কাজ হয় সমস্ত সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধ সরঞ্জামের পর্য্যবেক্ষণ করা ও যুদ্ধের সময় নায়কতা করা। এই সময় থেকেই ইংরাজ অধিকৃত ভারতের ক্ষাত্রশক্তির যে সংস্কার কার্য্য সুরু হয়েছিল, তা ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত প্রায়ই কিছু না কিছু চলে এসেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের ভীষণ লড়াই চল্‌ছিল, এবং ১৭০৮ সালে এ-লা-শ্যাপেলের (Aix-la-chapelle) সন্ধি হবার পর যদিও ইংলণ্ডের ভারতে গোরা পল্টন্ পাঠাবার যথেষ্ট ইচ্ছা হ'য়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে ইচ্ছাটা তখন কার্য্যে পরিণত করা হ'য়ে উঠেনি। কাজেই দেশীয় পল্টনকেই ইয়োরোপীয় কায়দায় দস্তুর মত শিক্ষা দেওয়া এখন থেকে সুরু হ'ল। কারণ, এত দিন পর্য্যন্ত দেশীয় পল্টন বল্‌তে আজকালকার সশস্ত্র পুলিশের চেয়েও নিরেশ সেপাইয়ের দল বুঝতে হবে। ১৭৫৪ সালে এ্যাড্‌মিরাল ওয়াট্‌সনের অধীনে প্রথম বিলাত থেকে রাজকীয় সৈন্য আসে। এই বৎসর থেকে পরবর্ত্তী একশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পর পর্য্যন্ত "ভারতীয় সৈন্য" বল্‌তে উক্ত রাজকীয় সৈন্য, এবং কোম্পানীর দেশীয় সৈন্য এই কয়দলই বোঝাবে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে ক্লাইভ তাঁর অধীন দেশীয় সৈন্যগণকে শিক্ষিত ক'রে, তাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত ক'রে, প্রত্যেক দলকে এক একজন স্বদেশী ইংরাজ সেনাধ্যক্ষের অধীন ক'রে দিয়ে দস্তুর মত কতকগুলি ব্যাটেলিয়ান্ (battalion) গঠন ক'রে তুল্‌লেন। তারা কতকটা ইয়োরোপীয় পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হ'ল। প্রথম ব্যাটেলিয়ান গড়া হবার পর তাদেরই উপনাম হয়েছিল "লালপল্টন"। ক্লাইভের প্রবর্ত্তিত সৈন্যদল গঠন প্রথাই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আজও পর্য্যন্ত ভারতের সামরিক বিভাগে চলে আস্‌ছে। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের "জয় লাভ" হেতু কোম্পানির হাতে অধিকতর দায়িত্ব এসে পড়ায়, দেশীয় পল্টনের সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি করা হ'ল। বাংলায় দুইটি ব্যাটেলিয়ান্, মাদ্রাজে ছয়টি ও বোম্বাইয়ে যেখানে এত দিন কেবল অশিক্ষিত আরব, আবিসিনীয় এবং দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য নিয়েই কাজ চ'ল্‌ছিল, সেখানেও ১৭৬৭ সালে দেশীয় ব্যাটেলিয়ান গঠন করে' প্রথমটা দেশীয় নায়কের অধীনে তাদের রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরে ইংরাজ অধ্যক্ষের পরিচালনে ও দেশীয় নায়কের অধীনে তারা দস্তুর মত ইয়োরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত হ'য়ে উঠেছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর চল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া ভারতে চতুর্দ্দিকে কোম্পানির কেবলই রাজ্য বৃদ্ধি ঘট্‌তে লাগ্‌ল। সারা ভারতবর্ষ এই সময়ে যেন এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হ'য়েছিল। এক দিকে সুশিক্ষিত হিন্দু, মুসলমান, ও খৃষ্টান সৈনিকের মিলিত ক্ষাত্রশক্তি, অপর দিকে অশিক্ষিত, অপটু, ঐক্যহীন, বিচ্যুত-সঙ্ঘ রাজন্যবর্গের অপদার্থ সৈন্যদলের পরস্পর ভীষণ সংঘর্ষ চল্‌তে লাগ্‌ল। ভারতে কোম্পানীর প্রতিনিধিবর্গ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বিলাতে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ভীত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁদের আপত্তি ও প্রতিনিধিগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবস্থার বিপাকে, আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিগণকে ক্রমাগত যুদ্ধে যোগদান ও সৈন্যবল বৃদ্ধি কর্‌তে বাধ্য হ'তে হ'য়েছিল।

চীন ও জাপান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাকে আজ অনুরোধ করেছেন যে আমার দেশের লোকের কাছে আমি আমার চীন ও জাপান ভ্রমণের কথা কিছু বলবো। আমি ঠিক এই সভায় বক্তৃতা করবার জন্য প্রস্তুত আছি বলতে পারিনে।

তার কারণ আছে। প্রথমতঃ,—চীন এবং জাপানে আমি যে ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেম তাতে নিজে কিছু পরিমাণে নির্লিপ্ত থেকে চারিদিক দেখবার অবকাশ হয়নি। বরং আমার সঙ্গে যে বন্ধুরা গিয়েছিলেন তাঁরা অবকাশ পেয়েছিলেন। আমি আমার বিশেষ কাজে এরূপ নিরতিশয় ব্যস্ত ছিলেম যে, সেখানকার যা দর্শনীয় তা বিশেষি এবং সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশে তাদের মনের কথা জানবার অবকাশ পাইনি। আর একটী দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই, আপনারা আজ যে বিবরণ শুনতে এসেছেন, আপনাদের সেই আকাঙ্ক্ষা অন্য একটী আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে আর একটী জিনিষ জানবার জন্য উৎসুক হয়েছে। আমার চীন ভ্রমণে ও অভ্যর্থনায় আমাদের ভারতের গৌরব কিছু আছে কি না, আশা করি, তাই জানবার জন্যে এসেছেন। এসিয়ার সমস্ত শক্তি একত্র করলে আমাদের শক্তি বাড়তে পারে কি না—আপনারা হয় ত তা জানবার জন্য এসেছেন।

কিন্তু আমি একটা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি। সেই জন্য আমি যা বলবো, আপনার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে হয়তো মিলবে না।

আমি আপনাদের এই কথা বলতে চাই যে, আমি আপনার দেশের একটা গৌরব ঘোষণা করবার জন্য বা ভারতবর্ষের একটা জয়গান ঘোষণা করবার জন্য যাইনি। আমাকে যারা ডেকেছিলো তারা হয়ত আমার কাছে চেয়েছিলো, শিক্ষা ও দর্শন। কিন্তু আমি মানুষের সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাই স্বীকার করে গিয়েছি এবং তাই করেছিলেম বলেই তারা আমাকে এত সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলো। আমার মনের মধ্যে সেরূপ কোনও কার্য্যের আদর্শ নিয়ে যাইনি। সকল দেশের চেয়ে যে প্রাচীন সভ্যতা তা চীন দেশেই আছে, এই জন্য আমি তা দেখবার জন্য গিয়েছিলাম। সেই প্রাচীন সভ্যতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে এত বড় একটা বিরাট দেশ—যার উপর জাতি তার বিপুল প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছে—এ একটা দেখবার জিনিষ। শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে যে বিরাট সঞ্জীবন শক্তি—তা জানবার ও আপনাকে ধন্য করবার ইচ্ছা—এই কথাই আমার মনে ছিল।

এত বড় একটা নতুন দেশে যাওয়া—এই যে মনে করছি কি বিচিত্র ভাবে তারা কাজ করছে, চারিদিকে বিপুল দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে সে আপনাকে প্রকাশ করছে—এ সব জানি, অনুভব করছি, অথচ তাদের ছোট ছোট আচার ব্যবহার ও ভাষার যে ভিন্নতা তা অতিক্রম করে মনের গভীরতায় প্রবেশ করতে হলে যেতে হয় নীচু হয়ে—মাথা উচু করে যারা মিশনারী হয়ে যায়, তারা সে দেশবাসীর অপমান করে। এরূপ করে অন্য দেশকে অপমান করবার অধিকার কারও নেই। আমাদের জানা উচিত যে, জাতি উন্নত হয়েছে তার বিরাট শক্তি এবং তাকে দেখবার মতন ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত

এবং তাহলেই আমার দেখা সার্থক। আর যদি আমার মনে এই ধারণা থাকে যে আমি ভারতের গুণগান করবো, এসিয়ার মিলন কথা গাইবো—তাহলে কখনই আমি সফল হতাম না।

চীনে যখন আমার বন্ধুরা আমাকে অভিনন্দন করলো, তখন আমি বললাম—আমাকে কেন তোমরা ডেকেছো তা আমি জানি না; আমি কবি, Philosopher এই জন্য যদি ডেকে থাকো তবে আমার কাছে তা প্রত্যাশা করোনা। তারা বললে—তোমরা ভারতের লোক, কত অতীতের জ্ঞানের বোঝা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছো। আমরা তাই চাই। আমি বললাম,—আমি সে ভার নিয়ে আসিনি। আমি একজন নগণ্য মানুষ হিসেবেই এসেছি। ইয়োরোপীয় অনেক পণ্ডিত তোমাদের আমন্ত্রণে এসেছে তারা গুরুগিরি করে গেছে—School masterএর Chairএ বসে তারা যা ভাল মনে করে সে সব কথা বলেছে। আমি সে আসনে বসে কি দেবো? আমি দিতে চাইনে কিছু। আমার হৃদয়ে তোমরা এস, তোমাদের হৃদয়ে আমি যাই। তারা আমাকে নিলে, খুসী হলো। তাদের উপর থেকেও একটা ভাবনা চলে গেল। তারা যদি একজনকে মনে করে, এ আমাদের চেয়ে বড়, একজন কবি, philosopher, Prophet তখন তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা ভয় হয়, সকল সময় তারা তার পিছে পিছে থাকে। আমি বললেম—তোমরা যদি বল, তুমি শুধু ভারতের কবি নও, তুমি এসিয়ার কবি, জগতের কবি, তাহলে আমি সকলের চেয়ে বড় গৌরব অনুভব করবো। এই ভূমিকা সামনে রেখে আমি কাজ করেছি। চীনের যে যুবারা আমার সঙ্গে ঘুরেচে তারা খুব সহজে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে ব্যবহার করেচে; সেইটেই আমার সব চেয়ে বড় কাজ, আমার বড় লাভ।

আপনারা বলবেন, এ ত ভূমিকা,—কি কাজ হল বল।

আমি যখন দেশে ছিলেম তখন ভেবেছি—সেখানে যখন অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত গেছেন, তাঁরা বড় বড় কথা বলেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন—আমি যেন গিয়ে লজ্জায় না পড়ি! কিন্তু সেই সময় দিনের পর দিন একটা গানের নেশা আমায় পেয়ে বসেছিলো। এই গানের নেশা পেয়ে বসেছিল বলে তাদের দেবার জন্য কিছুই কর্ত্তে পারিনি।

তারপর সমুদ্র যাত্রা। আপনাদের মধ্যে যাঁরা সমুদ্র যাত্রা করেছেন, তাঁরা জানেন জাহাজে কিছু লেখা পড়া করা কি দুরূহ ব্যাপার। তবু দু একটা যা লিখে নিয়েছিলেম তাই সযত্নে বুকে করে নিয়ে চললেম।

প্রথমেই নামলেম রেঙ্গুনে। পৃথিবীর ভূগোলে রেঙ্গুন আছে কিন্তু ব্রহ্মের ইতিহাস ভূগোলে রেঙ্গুন নেই।

সেখানে অনেক চীনার বাস। বিপুল সম্বর্দ্ধনা করে তারা আমায় আমন্ত্রণ করলেন।

সেই প্রথম আমার চীনের সঙ্গে পরিচয়।

সেখানে একটী চীনা বিদ্যামন্দির আছে। আমি তার চীনা আচার্য্যের সাহচর্য্যে ও আতিথ্যে প্রীত হলেম। তিনি বললেন, কি বলবে আমাকে আগে একটু বল। আমাদের দেশী লোক অনেক ইংরাজী জানে না। আমি তোমার কথা চীনা ভাষায় তাদের বুঝিয়ে দেব। আমি বললেম,—কি বলবো তা এখনও ঠিক করে পারিনি। তবে আমি জানি আমি এখানে সত্যকার আশ্রয় পাবো। আমি তাদের হৃদয় লাভ করতে পারবো—এই বিশ্বাসেই এসেছি। আমি এই কথাটিই তাদের জানিয়ে যাব।

কিন্তু মানুষের আত্মীয়তা—যাদের সঙ্গে ভাষায়, ভাবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে পৃথক—সেইখান থেকে যে আত্মীয়তা আসে তা সমস্ত বাধা করে, সমস্ত মানুষের অন্তর্নিহিত যে স্বাভাবিক আত্মীয়তা আছে ভোগ করে ধন্য হয়। আমি এই ইচ্ছা নিয়ে যাচ্ছি—তারা পরদেশী পরভাষাভাষী, তাদের কাছে আত্মীয়তা জানাবো ও পাব।

ব্রহ্মদেশবাসী চীনবাসীদের কাছে বিদায় নিয়ে মালয়দ্বীপে উপস্থিত হলেম। সেখানে অনেকটা আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে পরিচয় হলেম। এখানে একটা আশ্চর্য্য বিষয় দেখেছিলাম, সেটা আমায় আনন্দ দিয়েছে। মালয়দ্বীপ একটা ঘাটের মত জায়গা, যেখান থেকে চীন জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ায় যাতায়াত চলে। সেখানে নানা লোকের সমাগম; কিন্তু এখানে এত লোকদের মধ্যেও কোন বিরুদ্ধভাব দলাদলি নেই, এমন কি সাহেবেরাও বেশ নম্র। কিন্তু ভাববার কথা আছে। চীনদেশ থেকে শ্রমজীবীরা এসে দেশ অধিকার করেছে সেখানকার স্থানীয় লোক অলস। এই জন্যই তাদের উন্নতি হয় না।

দুই দলে সেখানে কাজ করে, ভারতীয় ও চীনা। শ্রমজীবী ভারত থেকে যারা গেছল তারা মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবী। আর চীনা দক্ষিণ দেশীয় Cantonese। কিন্তু এমন একজনও চীনা নেই, হীনবেশ পরে লোকের সামনে আসতে হয়। তারা স্বাধীন কারবার করে। একেবারে অকিঞ্চন ভাবে এসেও বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।

কিন্তু মাদ্রাজীরা খুব নিন্দালাভ করেছে। তারা ভারতীয়ের নামে কলঙ্ক দিয়েছে। তারা কুলী, কুলী, কুলী, তাছাড়া আর কিছু নয়। আর সেই জন্যই আজ ভারতবাসী কুলী আখ্যা লাভ করেছে।

সেখানকার কুলিরা প্রতিদিন প্রায় ৭০ Cent রোজগার করে তাদের মধ্যে যারা সর্দ্দার তারা ৭০ centএর মধ্যে ৩০ নেয় সে আর ৪০ নেয় সেই কুলী যে খাটে। এই জন্যই তাদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না।—চিরকাল দাসত্ব জীবন বয়ে অবজ্ঞা ভাজন হয়ে থাকে।

এখন Andrews সাহেব সেখানে গেছেন; তিনি হয়ত ধনিকদের গাল দেবেন। কিন্তু তাতে লাভ কি? গাল দিলে হয় ত মহাত্মাদের দয়া করতেও পারে, কিন্তু তাতে লজ্জা ত কমে না। কোনও চীনা ত Andrews সাহেবকে বলে না? এর কারণ কি?

কারণ তারা একত্র হয়ে কাজ করে অথচ মাদ্রাজীরা ঠিক উল্টো তারা পরস্পরকে শোষণ করবার জন্য ব্যস্ত। এ যে কত বড় দুঃখ

ও এতে যে কত দুঃখ তার সীমা নেই। মহাজনের অমানুষিকতাকে অবজ্ঞা করতে রাজি আছি, কিন্তু এদেরও বলতে হয়—তোমরা যদি মিলিত না হয়ে পরস্পর ভালো না বাসো, তা হলে চিরকাল ভারতের নামে কলঙ্ক ও কুলী বলে পরিচয় দেবে।

আর একদল পাঞ্জাবী আছে। এরা গেছে সরকারের পেছনে পেছনে। দাস যদি প্রভুত্বের আবরণ প'রে মনে করে সে প্রভু, আর দাসত্বের লজ্জা ত্যাগ ক'রে সে প্রভুত্বের ইচ্ছা পোষণ করে তা হলে এর চেয়ে বড় লজ্জার কথা আর নেই।

যে সব পাঞ্জাবী-কনষ্টেবল চীনাদের টিকী ধরে মেরেছে—যা সাহেবরাও করতে সাহস করে নি—তারা সমগ্র চীনে ভারতের ও ভারতবাসীর নামে কালী দিয়েচে।

আমার হৃদয়ে এগুলি বিদ্ধ হয়ে আছে। এত বড় লাঞ্ছনাও আমাদের হ'ল!

গুরুদ্বার থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল, বললেম—আমাদের দেশ চিরকাল মৈত্রী প্রচার করে এসেচে। তোমরা গুরু নানকের যে মন্ত্র পেয়েছ সে ত শান্তির মন্ত্র? আর গুরুদ্বার সে কি সেই মন্ত্র অনুসারে চলচে। কিসের গুরুদ্বার।

আমি আপনাদের কাছে দুঃখ জানাচ্ছি—দুদিকে দুঃখ—দাসত্বশক্তি যেখানে অত্যন্ত হীনভাবে অন্যদেশের কাছে আপনার গৌরব লুপ্ত করে দিয়ে আছে।

মালয় উপদ্বীপে এই দুই দল আছে। Hongkong প্রভৃতিতে এরূপ হবার উপায় নেই। সেখানকার চীনা শ্রমিকদের সঙ্গে পরিশ্রম ও কর্ম্মকুশলতায় ভারতীয়দের পারবার জো নেই।

চিনের মত কর্ম্মিষ্ঠ জাত আর কোথাও নেই। এই জন্য অন্যজাত তাদের ভয় করে। এইজন্য আমেরিকা তাদের যেতে দিতে চায় না। তারা এত অল্পব্যয়ে অসামান্য কাজ করে, তা আমাদের একেবারে আশ্চর্য্য।

প্রথমে মনে হয় এ একটা সম্পদ—তারপরই কিন্তু সন্দেহ হয়। যে কোনও জাতি একটা গুণের অতিমাত্রায় বিশেষত্ব লাভ ক'রে—তার অন্য অঙ্গগুলির তেমনি হানি হয়।

চীনেতে সব ধনিকেরা গিয়ে পড়চে (capitalist)—কেন? দুটো কারণ আছে—raw material ভোগ করবার লোভ, আর একটা শ্রমিকের সুলভতা।

চীনেতে একটা মানুষ একটা বিশেষ শক্তির রূপে প্রকট হয়েচে। এটা ধনদের কাছে লোভনীয় জিনিষ—যেমন ভারতবর্ষের গুর্খা—তারা মানুষ মারবার কার্য্যে দক্ষতা লাভ করেছে।

যারা সমগ্র মনুষ্যত্বকে বলি দিয়ে এক অংশকে বৃদ্ধি করে তারা এই ক্ষতি করে যে অপরের পক্ষে তারা লোভনীয় হয়ে পড়ে, যেমন মধুমক্ষিকারা যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী সঞ্চয় করে, এইজন্য মানুষ তা চুরি করে।

আমি তাই বলে মালয় দ্বীপবাসীদের ন্যায় অলস হতে বলচি নে।

তারা নিজের জমীতে থাকে, অল্পে সন্তুষ্ট থাকে। এতে দোষ আছে—মালয়বাসীরা ধনী হতে চেষ্টা করে না, ফলে বিদেশী এসে তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য অধিকার করে।

এ একটা ভাববার কথা।

হংকং এ আমার চীনদেশের কোনও বন্ধু আসেন নি। কারণ রেঙ্গুনের মতন হংকঙও চীনে নেই। সেখানে আমি দু একদিন ছিলুম। একদিন সান-ইয়েৎ সেনের এক দূত এসে বল্লেন,—আপনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন—চীনাদের মধ্যে যার সঙ্গে আলাপ করা উচিত তিনি সান-ইয়েৎ-সেন। জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে সান-ইয়েৎ সেনের সঙ্গে দেখা করা উচিত। কিন্তু আমার সময় অল্প বলে' বলে এলেম,—ফেরবার সময় পথে দেখা করব।

সেখানে চীনবাসীদের কাছে যিনি আমার বক্তৃতার অনুবাদের ভার নিয়েছেন তিনি দেখা কর্লেন। তাঁর সৌম্য মূর্ত্তি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম।

চীনে আমি কিরূপ অভ্যর্থনা পেয়েছি তা আমার বন্ধুরা বলবেন। কিন্তু হৃদ্যতার যে কি প্রাচুর্য্য তারা দান করেচে তার তুলনা আমি করেচি যদিও তা ঠিক নয়। আতিথ্যের যে হৃদ্যতা এ আমি ব্যক্তিবিশেষের কাছে পাই নি—তা বলি না।

আমেরিকার বক্তৃতায় আমি অনেক টাকা পেয়েছি সত্য, কিন্তু অন্যান্য সব কাজ আমি নিজেই করেছি—হোটেল খোঁজা গাড়ী করা ইত্যাদি। সেখানে দেনা পাওনার সম্পর্ক। এমন কি সম্মান পাওয়াটাও দেনা পাওনার মধ্যে গণ্য হয়েছে। তাঁরা মনে করেন—হাঁ, এ Nobel prize পেয়েছে Europeএও সম্মান পেয়েছে—তার অনুরূপ সম্মান আমরাও দিয়েছি।

কিন্তু চীনের লোক আমার সাহিত্য খুব কমই পড়েছেন—তাঁরা অনেকে ইংরেজী জানেন না। কিন্তু তবু তাঁদের কাছে—আমরা বরযাত্রীর আদর পেয়েছি।

সেখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আশু পাছু সৈন্য গিয়েছে, Governor খবর নিয়েছে—বুড়ো ভারতীয়দের কোনও অসুবিধে হচ্চে কি না।

যা আমি লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম দেখলাম তার কোনও দরকার নেই। কিন্তু তা ব'লে মনে করবেন না যে তারা কেউই বিপক্ষ আচরণ করে নি। এক দল লোক ছিল তারা বল্লে—এ লোকটা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে আমাদের মাথা খারাপ কর্ত্তে। ভারত থেকে যে বৌদ্ধধর্ম্ম এসেছে তা আমাদের দুর্ব্বল করে দিয়েছে। এও কবি, তার উপর ভারতীয়—এও আমাদের খারাপ কর্ত্তেই এসেছে।

শুনেছি এঁরা Communist দলের লোক—তাঁদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে এঁরা চীনে Bolshevic মতবাদ প্রচার করে। আমি চীনে যে যে স্থানে গিয়েছি এবং যে যে সভায় বক্তৃতা করেছি—প্রত্যেক স্থানে এবং সভায় তারা ছোট ছোট কাগজ বিলি করে আমার বিরুদ্ধে পাঁচটি প্রশ্ন করেছে কেন তারা আমার কথা শুনবে না।

প্রশ্নগুলি এই—

১। উনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন।

২। ওঁর Materialismএ অশ্রদ্ধা।

৩। ওঁর প্রাচীন সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা আছে।

আরও দুইটী প্রশ্ন ছিল তা মনে নেই। শেষে ছিল এই জন্য তাঁর বক্তৃতা শোনা উচিত নয়।

কিন্তু সুখের কথা তারা কেউ আমার personal অসম্মান করে নি। তারা ভদ্রতা রক্ষা করে শুধু মত প্রকাশ করেছে। কেউ আমাকে কোনো কটু কথা বলেনি। এটা আমাকে অনভ্যাস বশতঃ অত্যন্ত বিস্মিত করেছে।

একেই আমি সভ্যতা বলি। উন্নতি মানে রেলগাড়ী, ব্যোমযান, সত্য, কিন্তু সভ্যতা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ—সত্য ও সুন্দর করবার জন্য সাধনা।

প্রাচীন এই জাতির মধ্যে যা এরূপ দেখা যায় তা অতি মনোরম।

আমার একজন স্থানীয় Governorএর সঙ্গে আলোচনা হয়। তাঁকে আমি বলি—পরস্পর বিভিন্ন দেশের শিক্ষার আদান প্রদানের প্রয়োজন আছে। আমি সেই আদান প্রদান করবার চেষ্টা করে সকল দেশের জ্ঞানীদের আহ্বান কচ্ছি ও বিভিন্ন দেশে ছাত্র পাঠাচ্ছি।

তিনি বল্লেন এ বেশ ভাল কথা। তিনি একটি নদীর তীরের একটী সুন্দর স্থান দেখিয়ে বল্লেন—এই জায়গা আমি আপনাকে দেব আপনার আদর্শ অনুযায়ী বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে।

এ খুব আনন্দের কথা। এই সত্যিকার মিলন। আমি Pan-Asiatic কথাটা ভয় করি। চীন ও জাপান ত অভেদ আত্মা, কিন্তু দুদশকে যে অভেদ দেহ কর্ত্তে চায় সে চায় imperialism। আমার এ চেষ্টা নেই—তা' আমি স্পষ্ট করে বলছি। তাঁরাও বলেছেন, দেখুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে আত্মার মিলন চাই—political মিলন চাই না।

এর মধ্যে ভাল কথাই এই যে ফল পেয়েছি তা' আমি এখনে বাধ্য হলুম। তারা যে আমাদের কত কাছে এসেছে তা আপনারা পরে টের পাবেন। তারা সৈনিক হ'য়ে আসবে না—missionary হয়ে আসবে।

আমাদের অনেক দেবার আছে, তাঁদের অনেক দেবার আছে। এই আদান প্রদানের প্রীতি মিলন—যাকে বলে interdependence তাই হ'বে। আমি Siam, Persia প্রভৃতি দেশ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। আমার আশা ও বিশ্বাস—সেখানেও মিলন হবে।

জাপান আমাকে অনেক ভাবিয়েছে তা আমি পরে বলব। অন্তরে যে আনন্দ পেয়েছি—তা ভুলবো না। আমার বিশ্বাস আমার প্রাণের জায়গার সন্ধান পেয়েছি।

ভারতবর্ষ এসিয়ার একটি বড় বাণী প্রকাশ ক'রেছে, সে হচ্ছে মৈত্রী। এ বাণী প্রচারের পথ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে পূর্ব্ব পুরুষের সাধনায়—কিছু কিছু লুপ্ত হলেও তা' একেবারে লুপ্ত হয় নি।

আমাদেরও সুমহান কর্ত্তব্য সেই বাণী প্রচার করা। এই কর্ত্তব্য যে বড় কর্ত্তব্য, এ যে অন্যান্য শক্তির চেয়ে বড় শক্তি, তা' যেন ভুলে না যাই।

জাপানও স্বীকার করেছে যে তারা যা কিছু কীর্ত্তি সবই বৌদ্ধ ধর্ম্মের কাছ থেকে পেয়েছে। জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শুধু সংস্কারে পর্য্যবসিত নয়।

আমরা যদি কিছু লাভ কর্ত্তে চাই তা শুধু প্রেমের দ্বারাই সম্ভব। যাকে Exploit করি তার কাছ থেকে মনে করি পেলুম, কিন্তু তা ভুল—পুরোপুরি পাই আমরা শুধু মৈত্রীর দ্বারা। (আত্মশক্তি)

পৃথিবী-ভ্রমণ

(কাপ্তেন ওয়াণ্ডারওয়েল ও তাঁহার ভগিনীর মোটরে ভ্রমণ)

শ্রীতারকনাথ মল্লিক

কাপ্তেন ওয়াণ্ডারওয়েল ও তাঁহার ভগিনী মিস্ ওয়াণ্ডারওয়েল আমেরিকার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রকন্যা। কাপ্তেন ওয়াণ্ডার-ওয়েল ভূতপূর্ব্ব পুলিস কর্ম্মচারী ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ভ্রমণের পূর্ব্বে তিনি কাপ্তেন Pieczynski ও তাঁহার ভগিনী মিস Aloha নামে অভিহিত ছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা কাপ্তেন ওয়াণ্ডারওয়েল ও মিস ওয়াণ্ডারওয়েল নামে পরিচিত। কাপ্তেন ওয়াণ্ডারওয়েল ইহার পূর্ব্বে একবার মোটরে করিয়া চারি বৎসর আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা পৃথিবী পর্য্যটন করিবার কল্পনা করেন। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট G. Harding ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ও ধনবান ব্যক্তির নিকট এই সম্বন্ধে আবেদন করিলে, তাঁহারা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন এবং তাঁহাদিগকে অর্থ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদির দ্বারা সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করেন। কিন্তু ভ্রাতা ভগিনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ভ্রমণের খরচ তাঁহারা নিজেরা উপার্জ্জন করিবেন। সেইজন্য তাঁহারা ভ্রমণের পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত খরচের টাকা নিজেরাই উপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহারা গৃহ হইতে একটী মুদ্রাও সঙ্গে না লইয়া পৃথিবী ভ্রমণের জন্য যাত্রা করেন।

কাপ্তেন ওয়াণ্ডারওয়েল তাঁহার অল্পবয়স্কা ভগিনী মিস্ ওয়াণ্ডার-

ওয়েলকে সঙ্গে লইয়া ১৯১৯ সালে ২২শে সেপ্টেম্বর জর্জ্জিয়ার অন্তঃপাতী আটলান্টা ষ্টেট হইতে পৃথিবী ভ্রমণে যাত্রা করেন। তাঁহারা ভ্রমণের সুবিধার জন্য একখানি ফোর্ড মটর সঙ্গে লইয়াছিলেন। গাড়ীটী পঁচাত্তর অশ্বশক্তিসম্পন্ন ও ছয়টী সিলেণ্ডারে চালিত হয়। তাঁহারা যন্ত্রপাতি, তেল, যন্ত্রাদি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়াছিলেন। গাড়ী আমেরিকার নিশান দ্বারা সুসজ্জিত এবং উহাতে পৃথিবী ভ্রমণকারী ওয়াণ্ডারওয়েলের নাম লিখিত আছে। আটলান্টা ষ্টেট হইতে যাত্রা করিবার সময়, আটলান্টা নিবাসীরা তাঁহাদিগকে উৎসাহের সহিত বিদায় দিয়াছিলেন।

আটলান্টা ষ্টেট অতিক্রম করিয়া তাঁহারা নানা দেশ, পর্ব্বত, নদ, নদী, জঙ্গল ও বন অতিক্রম পূর্ব্বক মিচিগানের অন্তপাতী ডিট্রিওয়ট

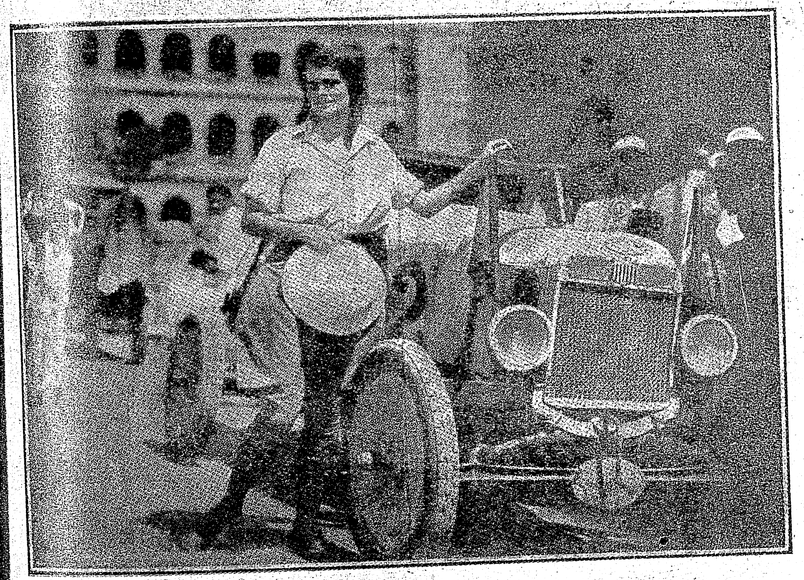

মোটরে ভূপ্রদক্ষিণকারিণী মিস ওয়াণ্ডারওয়েল

সহরে উপস্থিত হন। সেখানে শুনিলেন "যিনি সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে নিউ ওরলিএনস্ ও নিউ ইয়র্কদের চলচিত্রে-প্রদর্শকগণ দশ লক্ষ ডলার পুরস্কার দিবেন।" এই পুরস্কারের লোভে মিচিগান হইতে আরও সাতজন পৃথিবী ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজন ভ্রমণকারী, একজন ক্যামেরামেন ও আর একজন সেক্রেটারি ছিলেন। কাপ্তেন ও মিস্ ওয়াণ্ডারওয়েল ডিট্রিওট হইতে ১৯২১ সালের ২৭এ নভেম্বর যাত্রা করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মিচিগান হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারা নানা দেশ অতিক্রম করিয়া ক্যানেডা রাজ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটী Camera ছিল। পথের মধ্যে যেখানে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাইতেন তাহার ছবি তুলিয়া লইতেন। তাহারা ক্যানেডা অতিক্রম করিয়া মেকসিকো দেশে উপস্থিত হন; পথে Monument of Chicago দেখিতে পান ও সেইখানে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম করেন। এইরূপে কালিফোর-নিয়ার অন্তঃপাতী সানফ্রানসিসকোয় তাঁহাদিগের গাড়ী উপস্থিত হয়। এইখানে তাঁহারা জগৎবিখ্যাত তেলকুল সমূহ দেখিতে পান। এই কলের লোকেরা তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। সানফ্রান-সিসকো হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারা সেণ্ট্রাল আমেরিকায়, সমুদ্রের সমতল ভূমির নিম্ন দিয়া ৩০মাইল পথ যাইতে হইয়াছিল; পথে তাঁহারা একটী Spongeএর কারখানা দেখিতে পান। এই কার-খানার লোকেরা তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ভ্রমণ-কারীরা তাহাদিগকে "ওয়াণ্ডার-ওয়েল কার্ড" দিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রচুর Sponge গ্রহণ করেন ও তাহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পান। ১৯২২ সালে ৫ই জুলাই উত্তর আমেরিকা ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা Steam Ship Co ও Co-operativeSociety of Americaর সাহায্যে, তাঁহাদের জাহাজে আটলান্টিক মহা সমুদ্র পার হন।

পরে আগষ্ট মাসে এই ভ্রমণকারী লণ্ডনে পৌঁছিয়া Guild Hall এর সম্মুখে উপস্থিত হন। এইখানে তাঁহাদিগকে ভদ্রমহোদয়গণ অভ্যর্থনা করেন ও প্রিন্স অফ ওয়েলসের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা লণ্ডনে থাকিয়া Parliament, Thames নদীর সুড়ঙ্গ ও অন্যান্য আশ্চর্য্য বস্তু দেখিবার পর প্যটল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে উপস্থিত হন। এইখানে তাঁহারা পৃথিবীর একটী সর্ব্বোচ্চ Efels Tower দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন।

ফ্রান্স হইতে বহির্গত হইয়া তাহারা সেণ্ট মেরিনোর মধ্য দিয়া

ইটালির রাজধানী রোম সহরে প্রবেশ করেন। রোম হইতে যাত্রা করিয়া স্পেনের মধ্য দিয়া তাঁহারা পোর্টুগালে উপস্থিত হন। এখানে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া ও অল্প অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা আফ্রিকা মহাদেশে যাত্রা করেন। তাঁহারা আফ্রিকায় একটী গরম জলের ঝরণা দেখিতে পান। তথায় তাঁহাদের সহিত অপর একজন আমেরিকান ভ্রমণকারীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি মোটর বাইকে ভ্রমণ করিতেছেন। এখান হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা জার্ম্মানিতে পৌঁছান এবং তথায় কয়েকটী যুবক তাঁহাদের দেশীয় নিশান ছিন্ন ও নিক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহাদের নিজেদের দেশের নিশান গাড়ীতে লাগাইয়া দেয়। জার্ম্মানি হইতে রাসিয়া যাইবার জন্য তাঁহারা রাসিয়ার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন।

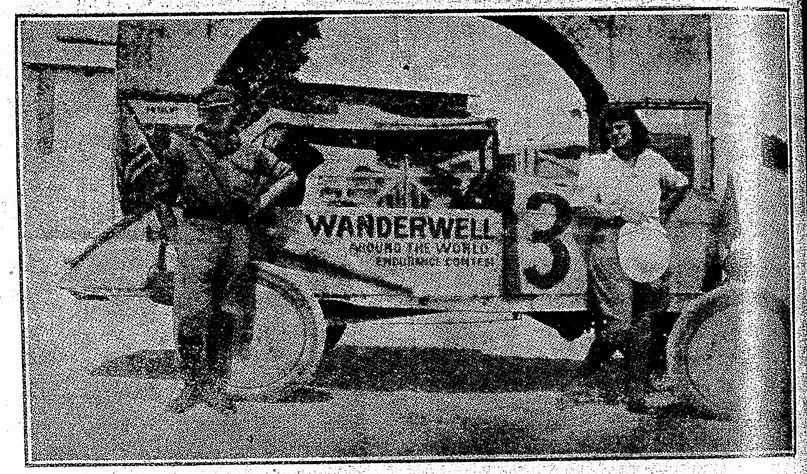

ওয়াণ্ডারওয়েল ভ্রাতৃ-ভগিনী

জার্ম্মানি হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারা শীতকালে পোল্যাণ্ডে উপস্থিত হন। পোল্যাণ্ড হইতে যাত্রা করিবার সময় কয়েকজন পোল্যাণ্ডবাসী তাঁহাদিগের সহিত মোটরে করিয়া কিছু দূর গিয়াছিলেন। এইখানে তাঁহাদিগকে গাড়ী মেরামত ও ঠিক করিতে হইয়াছিল। পোল্যাণ্ড হইতে ববোটিসিনায় উপস্থিত হইয়া, রুমানিয়ার রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর তাঁহারা গ্রীসে পৌঁছেন। গ্রীস হইতে ১৯২৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি কনষ্টাণ্টিনোপোলে আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর তাঁহারা প্যালেস্টাইন হইতে মিশরে যাইয়া তথাকার অদ্ভুত পিরামিড দেখিয়াছিলেন। তথা হইতে মেসোপটেমিয়ার ভিতর দিয়া ও মরুভূমির উপর দিয়া তাঁহারা সুডানে যাইবার জন্য অগ্রসর হন। সুডান সাহারা মরুভূমি হইতে ২২০ মাইল দূরে। এই বিশাল মরুভূমির উপর দিয়া মোটরে যাওয়ার অসুবিধা হওয়াতে তাঁহারা বেলুন টায়ার (Baloon tyre) লাগাইয়া সুডানে পৌঁছান। পথে তাঁহাদিগকে মরুভূমিবাসিদিগের গৃহে আতিথ্য ও জল গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সুডান হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারা সোমালিল্যাণ্ডে পৌঁছেন। এখান হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা আরবদেশে মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান মক্কায় যান। এইখানে তাঁহারা নগ্নপদে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করেন ও বহু আরববাসীদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। আরব দেশে তাঁহাদিগকে ভয়ানক গরম সহ্য করিতে হইয়াছিল। আরব হইতে যাত্রা করিয়া করাচির মধ্য দিয়া ৩৯টী দেশ অতিক্রম করিবার পর ২৮শে মে তাঁহারা বোম্বাই সহরে উপস্থিত হন। বোম্বাই হইতে বাহির হইয়া আগ্রার তাজমহল দেখিয়া ও ১৭ই জুন এলাহাবাদের ভিতর দিয়া কাশীতে উপস্থিত হন। কাশী হইতে যাত্রা করিয়া পথে তাঁহাদিগকে বহু কষ্টে শোন নদী ও আরও দুই তিনটী নদী পার হইতে হইয়াছিল। এইরূপ বাধাবিঘ্ন ও বিপদাপদ অতিক্রম করিয়া ২২শে জুন মাসে রবিবার দিন রাত্রে তাঁহারা কলিকাতায় আসেন।

কলিকাতায় আসিয়াই তাঁহারা হোটেলে ১৫ দিবস থাকিয়া চীন দেশে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা "ওয়াণ্ডারওয়েল কার্ড" বিক্রয় করিয়া, বক্তৃতা দিয়া ও নানা দৃশ্য দেখাইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আসিবার সময় কয়েকটী কোম্পানির পরিচয় পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন ওয়াণ্ডারওয়েল ও তাঁহার ভগিনী সেই সকল পত্র দেখাইয়া কলিকাতায় অনেক কোম্পানির নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

তাঁহারা কয়েক দিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ৭ই জুলাই Rangoon যাইবার জন্য যাত্রা করেন। তাহারা Rangoon হইতে চীন দেশের ও আরও কয়টী দেশ অতিক্রম করিয়া Australiaয় যাইবেন। Australia ভ্রমণের পর তাঁহারা প্রশান্ত মহাসমুদ্র পার হইয়া দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করিবেন স্থির আছে।

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৬]

কিছুকাল সহজে সহজে কাটিয়া গেল। প্রমথ কখন কলিকাতায় থাকে, কখন অন্যত্র যায়। কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার সময়ে সে ক্যাশবাক্সর চাবী অমলার হাতে দিয়া যায়, এবং প্রয়োজন হইলে বাক্স হইতে টাকা লইয়া যথাবশ্যক এবং যথেচ্ছ ব্যয় করিবার অধিকার যে তাহার আছে সে কথা প্রতিবারেই তাহাকে স্পষ্টভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। অমলা প্রথম প্রথম ইহাতে আপত্তি করিত; কিন্তু, পরে যখন ক্রমশঃ সে দেখিল যে কখনও কখনও মাণিকলালের কিস্তির টাকা দেওয়া ভিন্ন অধিকার প্রয়োগের আর কোনও হেতু উপস্থিত হয় না, তখন হইতে সে আর আপত্তি করিত না; ভাবিত, যে-ব্যাপারে তাহার দিক হইতে লাভ-লোকসানের কোনও কথা নাই, সে বিষয়ে প্রমথর অনুরোধ লঙ্ঘন করিলে অনর্থক তাহার মনে কষ্ট দেওয়া হইবে। প্রমথ কিন্তু অমলার মনে এই শুষ্ক প্রয়োগবিহীন অধিকার স্বত্বের কথা জাগাইয়া রাখাও আবশ্যক ও উপকারী বলিয়া মনে করিত। মৃত্তিকা-গর্ভে বীজ নিহিত থাকিলে একদিন অঙ্কুর বাহির হইবে, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস।

বন-বিহঙ্গমী ব্যাধের গৃহে আসিয়া সেবা-যত্ন পাইয়া নিজেকে যেরূপ নিরাপদ মনে করে, অমলার অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইয়াছিল। সে ক্রমশঃ মনে করিতে লাগিল যে, প্রমথর ব্যবহার চিরদিনই এমনি সরল এবং সহজ থাকিবে; তলতলে ফলের মধ্যে শক্ত আঁটির মত তাহার এই নির্দ্দোষ আচরণের মধ্যে দুষ্ট উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, সে আশঙ্কা তাহার মন হইতে ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু একেবারে অপসৃত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল, এইবার সে কথা বলিব।

সমস্ত রাত্রি টিপ্-টিপ্ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িয়াছে। সকাল বেলা কিছুক্ষণ হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশ ধূসর-বর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন। একটা কৃষ্ণ-চূড়া ফুলের গাছ ফুট-পাথ হইতে উঠিয়া দ্বিতলের জানালা ছাড়াইয়া গিয়াছে, তাহার শাখায় বসিয়া বর্ষণ-সিক্ত দুইটা কাক দুর্দ্দিনের দুঃখে ত্রস্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছিল। প্রমথ তাহার শয়ন-কক্ষে বসিয়া আর্দ্র উদাস প্রকৃতির দিকে চাহিয়া নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তায় মগ্ন ছিল, এমন সময়ে চা ও খাবার লইয়া অমলা কক্ষে প্রবেশ করিল।

অমলার হস্ত হইতে চা ও খাবার লইয়া প্রমথ বলিল, "অমলা, তোমাকে একটা কথা বলবার ছিল; একটু বসতে পারবে?"

অমলা প্রমথর দিকে চাহিয়া কহিল, "কি কথা? বেশী সময় লাগবার মত কিছু কি?"

"হ্যাঁ, একটু সময় লাগতে পারে।"

"তা হলে আধঘণ্টা-টাক্ পরে এলে যদি কোন ক্ষতি না হয় ত' মার রান্নার যোগাড়টা করে দিয়ে আসি।"

প্রমথ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, আধঘণ্টা পরে এলে কোনো ক্ষতি হবে না; তোমার কাজ-কর্ম্ম সেরে তার পর এসো।"

আর কোনও কথা না বলিয়া অমলা প্রস্থান করিল, এবং নীচে গিয়া মাতার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যতক্ষণ সে গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল, প্রমথ কি বলিবে সেই চিন্তা তাহাকে আক্রমণ করিয়া রহিল। কথাটা আর সাহাই হউক, একেবারে যে সহজ এবং সাধারণ নহে, তাহা প্রমথর কথা কহিবার ভঙ্গী হইতেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তথাপি সে কৌতূহলের বশে ব্যস্ত না হইয়া ধীরে ধীরে কার্য্যগুলি শেষ করিল। এবং অবসর পাওয়ার পরও আরও কিছু সময় অন্য কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া আধঘণ্টার অনেক পরে প্রমথর নিকট উপস্থিত হইল।

"কি কথা বলবে বলছিলে প্রমথদাদা?"

প্রমথ তখন তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখিতেছিল; অমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "দু মিনিট বোসো, বলছি।"

অদূরবর্ত্তী একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া অমলা বাহিরে বৃষ্টি-ধারার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন পুনরায় আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া প্রমথ অমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "কথাটা কাল সন্ধ্যা থেকে বলব বলব মনে করছি, কিন্তু তোমাকে বলব কি মেসো মশায় মাসিমাকে বলব ঠিক করতে পারছিলাম না। ভেবে দেখলাম কথাটার সঙ্গে তুমিই যখন প্রধানতঃ জড়িত, তখন প্রথমে তোমাকেই বলা ভাল। তার পর যদি দরকার মনে হয় তখন তাঁদের বললেই হবে।"

"আচ্ছা, তা হলে আমাকেই বল" বলিয়া অমলা প্রমথর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

কি ভাবে কথাটার অবতারণা করিবে তাহা প্রমথ মনে মনে একবার চিন্তা করিল; তাহার পর কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া বলিল, "কাল বৈকালে আমি বিজয়-নাথের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।"

শুনিয়া অমলার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। অন্য-দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "এ সব কথা বোধ হয় মার সঙ্গে হলেই ভাল হয়; তাঁর সঙ্গেই তোমার"—কথাটা শেষ না করিয়াই অমলা থামিয়া গেল; বোধ হয় যে কথা বলিবার ছিল—যথোপযুক্ত ভাষার পরিচ্ছদে সহসা তাহা দেখা ছিল না।

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া প্রমথ বলিল, "তাঁর সঙ্গেই আমার কথা হওয়া উচিত ছিল তা ঠিক, কিন্তু তাই বলে তোমার পক্ষেও ত' কথাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। তা ছাড়া তোমাকে শোনাবার আমার যে কথা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী তোমার কাছ থেকে শোনবার আছে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া অল্প হাসিয়া অমলা বলিল, "তবেই হয়েছে! আমার কিন্তু এ বিষয়ে কিছুই বলবার নেই।"

অমলার দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "বলবার আছে কি নেই তা কথাটা না শুনে আগেই এমন করে বলে কোন্ লাভ নেই ত! আমার যা বলবার আছে তা একটু ধৈর্য্য ধরে শোন; তার পর সে বিষয়ে তোমার যদি কিছু বলতে ইচ্ছে হয় ত' বোলো।"

প্রসঙ্গটা জানিতে পারিয়াই অমলার সমস্ত আগ্রহ অন্তর্হিত হইয়াছিল; ব্যাধের মুখে অহিংসা-তত্ত্ব শুনিবার কোনও প্রবৃত্তি তাহার মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু প্রমথর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা তাহাকে বলিতে হইল, "আচ্ছা, তা হলে কি বলবার আছে বল।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "কাল বিজয়ের কাছে তোমার কথাটা একটু একটু করে তুলে-ছিলাম, কিন্তু সে একেবারেই কোন কথা কইতে চাইলে না, বললে বাপ থাকতে এ বিষয়ে কোনো কথা বলবার তার অধিকার নেই। যদি কিছু বলবার থাকে ত' তার বাপকে বলতে বললে। আমি ত' তার আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! এ রকম আমি একেবারেই মনে করিনি! স্ত্রীর বিষয়ে কথা শুনতে স্বামীর যে কোনও অবস্থায় অধিকার না থাকতে পারে, এ একেবারে আমার ধারণার অতীত! তার পর ভাবলাম, একবার না হয় গোবিন্দ বাবুকেই কথাটা বলে দেখি; কিন্তু ওদের বাড়ীর একজন কর্ম্মচারীর মুখে যে কথা শুনলাম, তা'তে আমার আর কোনও কথা বলতে প্রবৃত্তি হল না!" বলিয়া প্রমথ উত্তরের অপেক্ষায় অমলার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

প্রমথর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া অমলা মৃদুস্বরে বলিল, "সে কথাটাও কি আমার শোনা দরকার?"

"একান্ত দরকার! তার পর তুমি আমাকে যা করতে বলবে তা' করতে আমি প্রস্তুত আছি।"

অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অমলা বলিল, "তা হলে সে কথাটাও বল।"

একটু কাসিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া প্রমথ বলিল, "গোবিন্দবাবু বিজয়ের বিয়ের সব ঠিক করেছেন, অঘ্রাণ মাসের প্রথমেই তার বিয়ে।"

মস্তিষ্কে সহসা প্রচণ্ড আঘাত লাগিলে মাথাটা যেমন ঘুরিয়া যায়, দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসে, অমলার অবস্থা প্রথমটা তেমনি হইল। মনের কোন্ গুপ্ত প্রদেশে আশাহীনতার মধ্যেও আশার একটি কণিকা অগোচরে জীবিত ছিল, যাহা এই দুঃসংবাদে আহত হইল, তাহা বলা কঠিন! কিন্তু জীবিত যে ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না। তথাপি তাহার মানসিক অবস্থা যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সহজভাবে সে কহিল, "তা আমি আর কি

প্রমথদাদা? আমার এ বিষয়ে কিছুই বলবার করবার নেই!"

আগ্রহভরে প্রমথ বলিল, "তুমি কেন করবে? যা করতে হয় বল, আমি করতে প্রস্তুত আছি।"

সহসা অমলার মনে একটা গভীর সন্দেহের ছায়াপাত হইল। কিছু পূর্ব্বে যে ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, বিজয়নাথের বিবাহের কথা শুনিয়া গোবিন্দনাথের সহিত কথা কহিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই, সে এখন বারম্বার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইতেছে, ইহা কি শুধু নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তি? না অন্য কিছু?

প্রমথর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া অমলা বলিল, "আমি তোমাকে কিছুই করতে বলব না প্রমথ-দাদা। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ, তুমি এ বিষয়ে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করো না। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাইতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব, তুমি আর কেন তার মধ্যে পড়ে কষ্ট পাও!"

এই কতকটা-অকারণ ভৎর্সনায় মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমথ বলিল, "আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও অমলা, আমার কষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না; কিন্তু তুমি চিরদিন এমনি কাটাতে পারবে ত?"

অমলা দৃঢ়ভাবে বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব! এত দিন ত' কাটালাম; চিরদিন আর কত দিন? দুশো বছরও নয়, তিনশো' বছরও নয়! তা ছাড়া, তুমি কি বিশ্বাস কর প্রমথদাদা, তিনি আবার বিয়ে করবেন? আমার ত' দৃঢ়বিশ্বাস, এ কাজ তিনি কখনও করবেন না!"

প্রমথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "না করুন তা-ই ভাল! কিন্তু তোমার এ দৃঢ়বিশ্বাসের ভিত্তি কি শুনি?"

"বিশ্বাসের আবার ভিত্তি কি প্রমথদাদা? বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাস! বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ তীক্ষ্ণভাবে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর রুক্ষস্বরে বলিল, "তা নয় অমলা, এ তা নয়! বিজয়ের বিয়ে করার চেয়েও আশ্চর্য্য ঘটনা সংসারে নিত্য হাজার হাজার ঘটছে। এ তা নয়। এ হচ্ছে তোমাদের সেই পুরোনো পচা স্বামীভক্তি, যার, অন্ততঃ তোমার ক্ষেত্রে, কোনো অর্থ, কোনো মূল্য নেই! এ একেবারে বাজে! একেবারে ফাঁকা!"

শুনিয়া অমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "তা হতে পারে প্রমথদা, কিন্তু স্বামীভক্তির মূল্যের বিচারও কি তুমি করবে? স্বামীভক্তির সঙ্গে তোমার ত' কোনো দিক থেকেই কোন সম্পর্ক নেই!" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এই সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ আঘাতে আহত হইয়া প্রমথ পুনরায় রুষ্ট হইয়া উঠিল; সে উত্তেজিত হইয়া বলিল; "তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে কি আর তর্ক করব, কিন্তু এইটে জেনে রাখ যে নিঃসম্পর্ক লোকেই ঠিক মত বিচার করতে পারে। একজন স্বামী, বা একজন স্ত্রী স্বামীভক্তির যে মূল্য ধার্য্য করবে, তা যথার্থ মূল্যের চেয়ে হয় বেশী, নয় কম হবেই! স্বামীর কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত ভালবাসা অথবা কর্ত্তব্যের কোনো পরিচয় না পেয়ে স্বামীর প্রতি তোমার যে এই ভক্তি অথবা বিশ্বাস, আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি অমলা, এর কোন অর্থ কোন মূল্য নেই! একে যদি তুমি খুব জমকালো করে সতীত্ব নাম দাও, তা হলেও নেই!"

এত দিন এবং এতক্ষণ অমলা প্রমথর বিষয়ে যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ছিল, সতীত্বের প্রতি এরূপ মন্তব্য প্রকাশে তাহা একেবারে লোপ পাইল। রাজ্যচ্যুত হইয়াও রাজা যেমন রাজ-সম্মানের অপমান সহ্য করিতে পারে না, স্বামীপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াও অমলা তেমনি সতীত্বের প্রতি এই অমর্য্যাদা সহ্য করিতে পারিল না। দলিতা সর্পীর মত সে তীব্র রোষে আস্ফালন করিয়া উঠিল—

"আমার এ সতীত্বের যদি কোনও মূল্য না থাকে প্রমথদাদা, তা হলে, আমার কাছ থেকে কিছুমাত্র সাড়া না পেয়েও, আমার প্রতি তোমার যে নানাপ্রকার জুলুম-জবরদস্তী, নানা রকম ছল-ছুতো করে আমাদের বাড়ীতে এসে বাস করা, কথায় কথায় আমাদের জন্যে জলের মত পয়সা খরচ করা, এ সবের মূল্য কি তা' আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার?" বলিয়া অমলা শুষ্ক দীপ্ত নেত্রে প্রমথর প্রতি কঠোর ভাবে চাহিয়া রহিল।

এমন গুরুতর কথাগুলা অমলা যে এরূপ স্পষ্টরূপে বলিতে পারে, সেই বিস্ময়ের আঘাতে প্রথমটা প্রমথর মুখ

পাংশু হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন তাহার মনে হইল যে, যে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার জন্য সে আজ অমলাকে আহ্বান করিয়াছিল, তাহা অমলা নিজেই উত্থাপিত করিয়াছে, তখন তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুর্দ্ধর্ষ দুরন্ত ব্যাঘ্রীকে সহসা সম্মুখে পাইয়া পরাক্রান্ত শিকারী যেমন মনের মধ্যে একটা বিশেষ প্রকারের উল্লাস এবং উত্তেজনা অনুভব করে, প্রমথ মনের মধ্যে সেইরূপ উল্লাস ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল। মুখে সবিস্ময় পরাভবের ভাব আনিয়া বলিল, "এ সব তুমি বুঝতে পেরেছিলে?"

বিজয়দৃপ্ত-কণ্ঠে অমলা বলিল, "প্রথম দিন থেকেই!"

প্রমথর অধরৌষ্ঠে একটা নিষ্ঠুর বদ্ধ হাস্য ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল; বলিল, "বেশ! বেশ! প্রথম দিন থেকেই সমস্ত বুঝতে পেরেও তোমরা আজ পর্য্যন্ত আমার প্রতি যে সদয় ব্যবহার করে এসেছ, তার জন্যে প্রথমে তোমাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি! তার পরে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে এমন একটা দুর্ব্বৃত্ত জেনেও আমার প্রতি তোমাদের এই যে সদয় ব্যবহার, তার অর্থ আর মূল্য কি? এ কি শুধু তোমাদের নিছক সহৃদয়তা, না, তা ছাড়া আরও অন্য কিছু?"

এত বড় কঠিন কথায় অমলার মুখ শিশার মত ফিকা হইয়া গেল, এবং উত্তরে কেমন করিয়া কি বলিবে তাহা সত্বর স্থির করিতে না পারিয়া বিব্রত বিহ্বল দৃষ্টিতে সে প্রমথর দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রমথ অমলার এই দুস্থ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ব্যথিত হইয়া শান্ত স্বরে বলিল, "মিছামিছি পরস্পরে এমন খোঁচাখুচি করে ব্যথা দিয়ে আর ব্যথা পেয়ে কোন লাভ নেই অমলা! আমার মনে হয়, আমাদের পরস্পরের ব্যবহার ততটা হীন নয়, যতটা আমরা দাঁড় করাচ্ছি! হীরাকে কাঁচ বলে গাল দিলেই হীরা কাঁচ হয়ে যাবে না।"

তাহার পর তাহার চিরাভ্যস্ত কৌশলের দ্বারা কণ্ঠস্বর প্রগাঢ় করিয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে কহিল, "কথাটাকে তুমি যখন আজ এমন সোজাসুজি টেনে বার করলে, তখন আমিও অকপটে তার যথাযথ উত্তর দিই। তোমার অনুমান একটুও ভুল হয় নি; এতদিন ধরে তোমাদের সঙ্গে যে ছল-চাতুরী করেছি, তোমাদের জন্যে যে নানা প্রকার শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেছি, পয়সা খরচ করেছি, কত রকম কৌশল করে তোমাদের বাড়ীতে এসে যে বাস করছি, তা' একমাত্র তোমারই জন্যে! কিন্তু জুলুম-জবরদস্তীর কথাটা তুমি অন্যায় বলছ অমলা! জুলুম-জবরদস্তীর ওপর আমার একটুও আস্থা নেই। জুলুম-জবরদস্তী যদি করতাম, তা হলে কখনই তোমার পাশের ঘরে এসে বাস করতে পারতাম না; তার অনেক আগেই তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে!"

প্রমথ নীরব হইয়া ক্ষণকাল অমলার প্রতি আগ্রহভরে চাহিয়া রহিল; কিন্তু এবারও যখন অমলা কোনও কথা না বলিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তখন সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—

"তোমার প্রতি আমার এই আসক্তির মূল্য কি তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে। তুমি রাগ করো না অমলা, আর কিছু না হোক, তোমার প্রতি বিজয়নাথের নির্ম্মম উপেক্ষার চেয়ে এ অনেক মূল্যবান! এর প্রাণ আছে, অস্তিত্ব আছে, তাই এ'কে তুমি এমন করে অপমান করতে পারছ; কিন্তু বিজয়নাথ আর তোমার মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই, যাকে তুমি কোনও দিক দিয়ে স্পর্শ করতে পার! একজন, তার ধন-সম্পদ মান-ইজ্জৎ সমস্তর বিনিময়ে, তোমার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠেছে, তোমার জীবনের এ একটা সার্থকতা! এ এমন একটা সামান্য জিনিস নয়, যা তুমি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পার!"

এবার অমলা কথা কহিল। প্রমথর প্রতি অকুণ্ঠ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তা পারি; শুধু অনায়াসে নয়, অবহেলার সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারি! তুমি যে আমার প্রতি আসক্ত হয়েছ, এতে আমার জীবন একটুও সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি নে!"

উত্তেজনায় অমলার সমস্ত দেহ—আপাদমস্তক—কাঁপিতে লাগিল।

অমলা সহসা যে এমন রূঢ় অপমানসূচক কথা বলিতে পারে, সে আশঙ্কা প্রমথ একবারও করে নাই। তাই প্রথমটা সে বিস্ময়ের বিহ্বলতায় মূক হইয়া গেল; তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার অধরৌষ্ঠ ক্রূর হাস্যের কঠিন রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সবিদ্রূপ তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "এ একরকম মন্দ অভিনয় হচ্ছে না অমলা! ষ্টেজে দাঁড়িয়ে এমনি করে এ জমকালো কথাটা বললে খুব বড় রকম একটা হাততালি লাভ করতে! আর সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে পারলে একজন মস্ত সতী বলে তোমার নাম রটে যেত! কিন্তু তোমাদের এই দুর্গন্ধ পচা সতীত্বের ওপর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। এই বহুদিনের অর্জ্জিত কুসংস্কারের আর একটা নাম পাগলামী! কেন, তা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। যে তোমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে না, যার কাছ থেকে তুমি স্বামীর কোনো ব্যবহার পাচ্ছ না, তার স্মৃতির সম্মানে তুমি আমার, অর্থাৎ যে তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তার ভালবাসার প্রমাণে অপমানিত হচ্ছ. তোমার সতীত্বে আঘাত পড়ছে! বিশ্লেষণ করে দেখ এ সতীত্ব কি! এ হচ্ছে, যে জিনিস নেই তা স্বীকার করে, যা আছে তা অস্বীকার করা! এ পাগলামী নয় ত অন্য আর কি তা' ত জানি নে!"

প্রমথর কথা শুনিয়া অমলা ক্ষণকাল সুগভীর ঘৃণা এবং বিরক্তিতে নির্ব্বাক হইয়া রহিল; তাহার পর সুস্পষ্ট অবজ্ঞার সহিত বলিল, "এই রকম বোধ হয় তুমি আরও অনেক জিনিস জান না প্রমথদাদা! তুমি বোধ হয় ঈশ্বর জান না, ধর্ম্মাধর্ম্ম জান না। পাপ-পুণ্য জান না, কিছুই জান না!" জ্বলন্ত নেত্রে অমলা প্রমথর দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রমথ কিন্তু বিচলিত না হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার পর মাথা নাড়িয়া সে গভীর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না, জানিনে; কিন্তু তুমিই কি জান অমলা? ঈশ্বরকে দেখেছ কখনো? ধর্ম্ম কোন্‌টা, অধর্ম্ম কোন্‌টা, তা বুঝতে পার? পাপ-পুণ্য সত্য-মিথ্যার ভেদ নির্ণয় করতে পার?"

এতগুলা প্রশ্নের মধ্যে একটারও উত্তর না দিয়া অমলা তেমনি বিরক্তি-বিরূপ মুখে অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তখন প্রমথ নিজেই পুনরায় বলিতে লাগিল—

"কখনই অসঙ্কোচে বলতে পারবে না যে পার! কিন্তু আমার কথা শোন অমলা, আমি তোমাকে বলছি,—

ঈশ্বর নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই! ও-সব শুধু সমাজ-রক্ষার জন্যে কৌশল! একেবারে ফাঁকিবাজী; যে তোমাকে একেবারেই চায় না, তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকায় কি সতীত্ব আছে আর কি পুণ্য আছে, সহজ বুদ্ধিতে তা বোঝা কঠিন। কত ভাল লোক দুঃখ পাচ্ছে, কত মন্দ লোক সুখে আছে। মৃত্যুর পরে কি হয় তা আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না, অথচ পৃথিবী এত পুরানো হয়ে গেল! পরলোকের কল্পনা শুধু ইহলোকের চালাকী, ভয় দেখান! স্বর্গ হচ্ছে পুরস্কার, আর নরক হচ্ছে দণ্ড। কিন্তু মৃত্যুর পরে কোন লোক এ পর্য্যন্ত এ দণ্ড-পুরস্কার পেয়েছে কি না, তার কোন প্রমাণ নেই। এই সব কল্পিত ব্যাপারগুলো দিয়ে জীবন চালানো, আর যা প্রত্যক্ষ, যা রক্ত-মাংসের মধ্যে সত্য, সেগুলাকে উপেক্ষা করা যে কত বড় আত্ম-প্রবঞ্চনা, তা তোমাকে আমি বলতে পারি নে অমলা! ধর্ম্ম আর সমাজের দোহাই দিয়ে আমাদের জীবন ক্রমশঃ একটা বিরাট আত্ম-প্রবঞ্চনা হয়ে দাঁড়িয়েছে! মন্ত্র দিয়ে আমাদের মন অভিভূত, আর বিধি দিয়ে আমাদের দেহ বাঁধা! পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের ফলে যে সব ব্যাপারগুলো আমরা মানি বলে মনে করি, মনের মধ্যে তলিয়ে দেখে বল ত' অমলা, বাস্তবিকই সে গুলা আমরা মানি কি না? অকপটে বল দেখি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ নরক—এ সব নিঃসন্দেহে মনের মধ্যে তুমি মান কি না?"

প্রমথ তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করিয়া বিজয়-দৃপ্ত নেত্রে অমলার দিকে চাহিয়া রহিল; এবং অমলাকে নিশ্চল, নির্ব্বাক দেখিয়া মনে করিল যে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ও যুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার কোন কথাই অমলা খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অমলা কিন্তু এক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রমথর মুখের উপর পরিপূর্ণ সহজ দৃষ্টিপাত করিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "সে সব আমি মানি কি মানিনে, সে কথা তোমাকে বলবার কোন দরকার নেই। তবে তোমার কথা যে আমি ভুলে ভ্রান্তিতেও মানিনে, সে কথা আমি স্পষ্ট করে তোমাকে বলে যাচ্ছি! তুমি যে-সব ব্যাপারকে কুসংস্কার বলছিলে, সে-গুলো কুসংস্কার কি না,

তা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমার প্রবৃত্তি নেই; কিন্তু তুমি যে নীতি এখন প্রচার করছিলে, কোন দিন যে আমার জীবনে তা' সংস্কার হবে সে প্রত্যাশা কোরো না। আর বোধ হয় তোমার কোন কথা নেই, এখন আমি চল্লাম।" বলিয়া অমলা প্রস্থানোদ্যত হইল; তাহার অব্যবহিত পরেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল; "তুমি আমাদের বাড়ীর অতিথি—তোমাকে আমি যাও বল্‌তে পারি নে, তুমি থাক; কিন্তু যে ভাবে থাকা উচিত, সেই ভাবেই থেকো।"

অমলার উত্তর শুনিয়া বিস্ময়ে ও নৈরাশ্যে প্রমথ ব্যথিত হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী কথায় অপমানের আঘাতে সে সহসা কঠোর হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আর তা যদি না থাকি তা হলে তুমি আমাকে তাড়াতে পার না কি?"

চৌকাঠের দুই দিকে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া অমলা স্থির ভাবে বলিল, "পারি। দেহের মধ্যে অসুখ হ'লে তাড়াবার ওষুধ আছে, আর একজন মানুষকে বাড়ী থেকে তাড়ান যায় না? কিন্তু তুমি কি তোমার টাকার জোরে এ কথা বলতে সাহস করছ?"

প্রমথর মুখ এবার সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল; বলিল, "আমাকে অনেকে অনেক দোষ দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ কথা কেউ বলে নি অমলা! আমি দুশ্চরিত্র, দুর্ব্বৃত্ত হতে পারি, কিন্তু ছোটলোক নই! তুমি বিজয়নাথের মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজো কোরো, কারণ সে তোমার স্বামী; কিন্তু তাই বলে আমাকে অতটা অপমান কোরো না; আমার একমাত্র অপরাধ আমি তোমাকে ভালবাসি!"

অমলার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না, এমন কি স্থান ত্যাগ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার রহিল না। সে নতনেত্রে চিত্রার্পিতের মত তথায় দাঁড়াইয়া রহিল!

অমলা কোনও কথা বলিল না দেখিয়া প্রমথ বলিতে লাগিল, "আমি আজ তোমার কাছে সম্পূর্ণ হার স্বীকার করছি অমলা, আর সে জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ! এতদিন পেয়ে-পেয়ে আমার মনে একটা দুঃসাহস জন্মেছিল যে, সব জিনিসই পাওয়া যায়; কিন্তু দুর্লভ জিনিসও যে সংসারে আছে, সে জ্ঞান আজ আমি তোমার কাছ থেকে পেলাম! সে যাই হ'ক, আজকের এ ঘটনার পর এ বাড়ীতে আমার আর বাস করা চলে না, তা' তুমিও স্বীকার করবে। আজ বোধ হয় হয়ে উঠবে না, আজ একটা বাসা স্থির করে কাল আমি চলে যাব।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "চলে যাবার আগে মাণিকলাল-ঘটিত সব গোলযোগ আমি শেষ করে দিয়ে যাব। হাণ্ডনোটের টাকার সঙ্গে মাণিকলালের কোনও সম্পর্ক নেই; সে আমার সাজান মহাজন। তোমাদের বাড়ীতে প্রতিপত্তি লাভের জন্যে প্রিয়নাথবাবুর কাছ থেকে মাণিকের নামে হাণ্ডনোট কিনে নিয়ে এ ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। কিন্তু আর যখন তার কোনও প্রয়োজন রইল না, তখন মাণিকলালের হাণ্ডনোটে পুরো উশুলী লিখিয়ে দিয়ে, আমি মেসোমশাইকে সেখানা ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তার পর যখন সুবিধা হবে, মেসোমশাই আমার টাকা শোধ করবেন।"

কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে অমলা তাহার নতদৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রমথর প্রতি উত্থিত করিল, কিন্তু মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না, পুনরায় সে দৃষ্টি নত করিল। বোধ হয় তাহার মনের মধ্যে পাপ হইতে পাপী পৃথক হইয়া আসিয়া করুণা এবং সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যথোপযুক্ত ভাষার অভাবে তাহা ব্যক্ত হইতে পারিল না।

প্রমথর নিকট কিন্তু অমলার অন্তরের সে অব্যক্ত বাক্য অজ্ঞাত রহিল না। সে ব্যথিত আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার শেষ কথা অমলা, তোমার কাছ থেকে যত দূরেই আমি থাকি না কেন, তোমার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ রইল যে যদি কখনও কোনও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এই অধম ব্যক্তিকে দরকার হয়, একবার স্মরণ করলেই সে তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবে। তোমাকে হাতের মধ্যে না পেয়ে আমার মনের মধ্যে তুমি যে কত বড় হয়ে রইলে, তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। আচ্ছা, তা হলে এস; আর এখন আমার কোনও কথা বলবার নেই।"

নানাবিধ বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ ভাবের উত্তেজনায় অমলার চক্ষু-প্রান্ত সজল হইয়া আসিয়াছিল। সে নতনেত্রে গাঢ়স্বরে বলিল, "আমি যদি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হলে আমাকে ক্ষমা কোরো প্রমথদাদা; কিন্তু আমার মনে এ সান্ত্বনা আছে যে, আমি কোনও অপরাধ করিনি!"

"না, তা' করনি।" উৎপীড়িত অবসন্ন হৃদয় সহসা দুর্ব্বলতায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া প্রমথ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিল।

এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। আকাশ তখন প্রগাঢ় ধারায় বর্ষিত হইতেছিল।

(ক্রমশঃ)

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে—প্রেম

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী বি, এসসি

বাংলাদেশের নাট্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই বোধ করি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্যের সহিত বিশেষ করিয়াই পরিচিত। বাংলার ঐতিহাসিক নাট্যে তিনি যে একটা নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—তাঁহার রচিত নাটকাবলী ও তাহার অদ্ভুত সুন্দর অভিনয় যে তখনকার এবং এখনকারও বাঙালী মাত্রেরই প্রাণে একটা নূতন সুরের অণুরণনের সৃষ্টি করিয়াছে, এ কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার নাট্য-সাহিত্য একেবারে নিখুঁত না হইলেও তাঁহার নাটকে অঙ্কিত চরিত্র ও ঐ চরিত্রের ভিতর দিয়া তাঁহার বক্তব্য কয়েকটি সমস্যার বিষয় এমন সুন্দর ও সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা হইতে আমরা তাঁহার লেখনীর অপূর্ব্ব শক্তির বেশ সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি। সে সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই আজ আমার এ ঔদ্ধত্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রতি নাটকে এক একটি বিশেষ চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, এক একটি সমস্যার মীমাংসা করিতে। তাহার মধ্যে প্রেমের যে গূঢ়তর সমস্যা,—বাস্তবিক প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে, এবং সাধারণে যাহাকে প্রেম বলিয়া ভুল করে, তাহা হইতে ইহা কতদূর বিভিন্ন, তাহারই সরল মীমাংসা করিবার জন্য তিনি প্রায় প্রতি নাটকেই এক একটি করিয়া বিশেষ রমণী-চরিত্রের অঙ্কন করিয়াছেন, এবং সেই চরিত্রের ভিতর দিয়া বার বার একই কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের ছায়া, রাণাপ্রতাপের মেহেরউন্নেসা, সিংহল-বিজয়ের লীলা, সাজাহানের মহামায়া, দুর্গাদাসের সরস্বতী, মেবার-পতনের মানসী প্রভৃতি চরিত্রগুলি পাশাপাশি পড়িলে বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এই বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে হাজার পার্থক্য থাকিলেও, এমন একটা মধুর সুর তাহাদের সকলেরই মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইতেছে—যাহা প্রত্যেক মনোযোগী পাঠকেরই চক্ষে ধরা না পড়িয়া যাইতে পারে না।

সর্ব্বপ্রথম ধরুন চন্দ্রগুপ্তের 'ছায়া' ও রাণাপ্রতাপের 'মেহেরউন্নেসা'। এই দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়া যেন দুইটি একই সুরের নদী আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে; এবং পরিণামেও তাহারা পূর্ণ বিকাশের পর এমন একটা সাধারণ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহাতে সেই চরিত্রাঙ্কনের জন্য নাট্যকারকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ছায়া প্রথমে ভালবাসিল চন্দ্রগুপ্তকে, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে পায় নাই। ইহার কয়েকটি কারণের মধ্যে বিশিষ্ট একটি কারণ এই যে, চন্দ্রগুপ্ত সুন্দর, ছায়া কাল। মানুষ যে প্রথমে কোনও রমণীকে ভালবাসে-সেটা অবশ্য কখনও তাহার গুণ দেখিয়া নহে, সেটা তাহার রূপ ও সৌন্দর্য্যেই অভিভূত হইয়া,—এবং সে ভালবাসাকে প্রেম বলে না—তাহাকে বলে রূপজ মোহ। বাদলার পূর্ণিমায় মেঘে-ঢাকা আকাশের চাঁদ যেমন ধীরে ধীরে মেঘমুক্ত হইয়া পরে ধরণীকে তাহার উজ্জ্বল কিরণে অভিসিঞ্চিত করিয়া তোলে, প্রেম তেমনি প্রথমে ঐ রূপজ মোহেরই আবরণের তলে নীরবে লুক্কায়িত থাকে,—প্রেমিক প্রেমিকার প্রথম আলাপনে বা প্রথম দর্শনে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। সে প্রেম আত্মপ্রকাশ করে তখন, যখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হইয়া উঠে। ছায়া ও চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল।

প্রথম যখন ছায়া চন্দ্রগুপ্তকে দেখিলেন—তখনই তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ছায়ার প্রতি বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট হন নাই; কারণ, পুরুষের মনকে বিহ্বল করিবার মত এককণা রূপও সে পার্ব্বত্য রাজকুমারীর শ্যামদেহে ছিল না। আর এই যে রূপের অভাবে তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রেম লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ইহারই জন্য তাঁহার মনে যে অভিমানের প্রদীপ্ত অনল জ্বলিয়াছিল, তাহা নাটকের প্রায় প্রতি অঙ্কেই প্রকাশিত হইয়াছে। যথা,

[৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য]

চন্দ্র। তবু মনে হয় যে তোমাদের 'ঘনশ্যাম' আবরণের নীচে একটা হৃদয় আছে।.....

ছায়া। মহারাজের সৌজন্য যে 'কৃষ্ণদেহ' না ব'লে ঘনশ্যাম আবরণ ব'লেছেন!.....যদি জানতেন যে সে হৃদয় কতখানি, তাতে কি তরঙ্গ খেলছে।—

তাহার পর ছায়ার অভিমানভরা বাক্য হইতে যখন চন্দ্রগুপ্ত বুঝিলেন যে, ছায়া তাঁহার অনুরাগিনী, এবং তাঁহার এই অভাবনীয় ব্যবহারের বিষয়ে তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, তখন ছায়া অভিমানে আরও অধিক জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "না মহারাজ, আমি আপনাকে ঘৃণা করি।".....

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে ফিরিয়া আসিয়া নিজেই চন্দ্রগুপ্তের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

এই যে অদম্য অভিমানের মধ্য দিয়া প্রেমের সুস্পষ্ট প্রকাশ,—দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকে এটি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

নারী যাহাকে আন্তরিক ভালবাসে, তাহারই নিকট হইতে সে যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং সে প্রত্যাখ্যান যদি বিশেষ করিয়া তাহার দৈহিক রূপ ও সৌন্দর্য্যের অভাবেই হয়, তখন তাহার অবস্থা ঠিক এম্‌নিই হয়;—অভিমানে সে যেন একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে।

আর এক স্থানে খোঁচা দিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গিনীদের নিকট বলিয়াছেন—"পুরুষ তা' (হৃদয়) চায় না, পুরুষ চায় নারীর রূপ!.....

বাস্তবিক এটা খুবই সত্য কথা। পুরুষ নারীর প্রেমে পড়ে তাহার রূপ দেখিয়াই—তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ গুণাবলীতে সে প্রথমে কখনই মুগ্ধ হয় না।.....

বারংবার আশান্বিতা ও বঞ্চিতা হইয়া অবশেষে ছায়া স্থির করিলেন যে, তিনি চন্দ্রগুপ্তকে না পাইয়াও ভালবাসিবেন, এবং সেই ভালবাসাই পবিত্র ত্যাগের প্রেম। (৪র্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য) ছায়া তাঁহার সখিদের সহিত কথোপকথনে নিজেই বলিয়াছেন—"যখন বসন্ত আসে মারুত-হিল্লোলে প্রকৃতি পত্র-পুষ্পে আপনিই শিহরিত হ'য়ে ওঠে। কেউ দেখে কি না দেখে তাতে তার কিছু যায় আসে না। কুঞ্জে কোকিল আপনিই গেয়ে ওঠে, কেউ শোনে কি না শোনে, তাতে তার কিছু যায় আসে না। তারা নিজের সুখে নিজেই পূর্ণ।.....আমার প্রেম আমার সম্পত্তি। আমার প্রেম নিজেই পূর্ণ।"

৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যে ছায়া নিজেকে বলিতেছেন "নির্ম্মম ভাবে তুমি তোমার প্রবৃত্তির কণ্ঠ রোধ কর।" তাহার পর তিনি গাহিলেন—

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই,
তুমি হও সব সুখের ভাগী। ইত্যাদি

এ গানটিতে ছায়ার হৃদয়ে ত্যাগের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব প্রতি ছত্রে প্রতি বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছায়া চান্, তিনি দূরে থাকিয়া শুধু চন্দ্রগুপ্তকে ভালবাসিয়াই সুখী হইবেন—তাহার প্রতিদান তিনি চান্ না! শুধু তিনি অহরহ ঈশ্বরের কাছে তাঁহার চিরপ্রিয়ের কল্যাণ কামনাতেই তাঁর এ নারী-জীবন উৎসর্গ করিবেন, এই তাঁহার ব্রত, এই তাঁহার সাধনা।

এমনি করিয়াই তাঁহার প্রেমের মরা সোণা পুনঃ পুনঃ দুঃখ ও বঞ্চনার পরীক্ষাগ্নির সংস্পর্শে খাঁটি হইয়াছিল।

রাণাপ্রতাপের মেহেরউন্নেসারও চরিত্র ঠিক এইরূপ। এখানেও যেমন ছায়া ভিন্ন চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় অনুরাগিনী ছিলেন হেলেন, ওখানেও তেম্‌নি মেহের ভিন্ন শক্ত সিংহের আর এক অনুরাগিনী ছিলেন দৌলৎউন্নেসা। এবং সে কথা জানিয়াই মেহের দৌলতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া শক্ত সিংহকে স্বহস্তে দৌলতের হাতে তুলিয়া দিলেন। এতটা স্বার্থত্যাগ নারীর পক্ষে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে।

মেহের।...দৌলৎ জানে না, যে দৌলৎউন্নেসা যার অনুরাগিনী, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও তা'র অনুরাগিনী..... ভগবান্! এই বর দাও, যেন দৌলৎউন্নেসার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রতে পারি। তাহ'লেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। নিজের জন্য অন্য বর চাই না। কেবল এই বর চাই যে, এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে যেন দমন ক'রতে পারি।..... আমার উন্মুখ প্রেমকে পরের শুভেচ্ছায় পরিণত কর।

—ইহার প্রতি বাক্য হইতে মহান্ ত্যাগের সুস্পষ্ট পরিচয় ঝরিয়া পড়িতেছে।

তৃতীয় অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্যে মেহের উন্নেসার অপূর্ব্ব ত্যাগের আর একটা দৃষ্টান্ত পাই তখন, যখন সেলিমের বিনা অনুমতিতেই তিনি শক্তসিংহকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন স্বেচ্ছায় বিপদের পসরা নিজের মস্তকে

ভারতবর্ষ

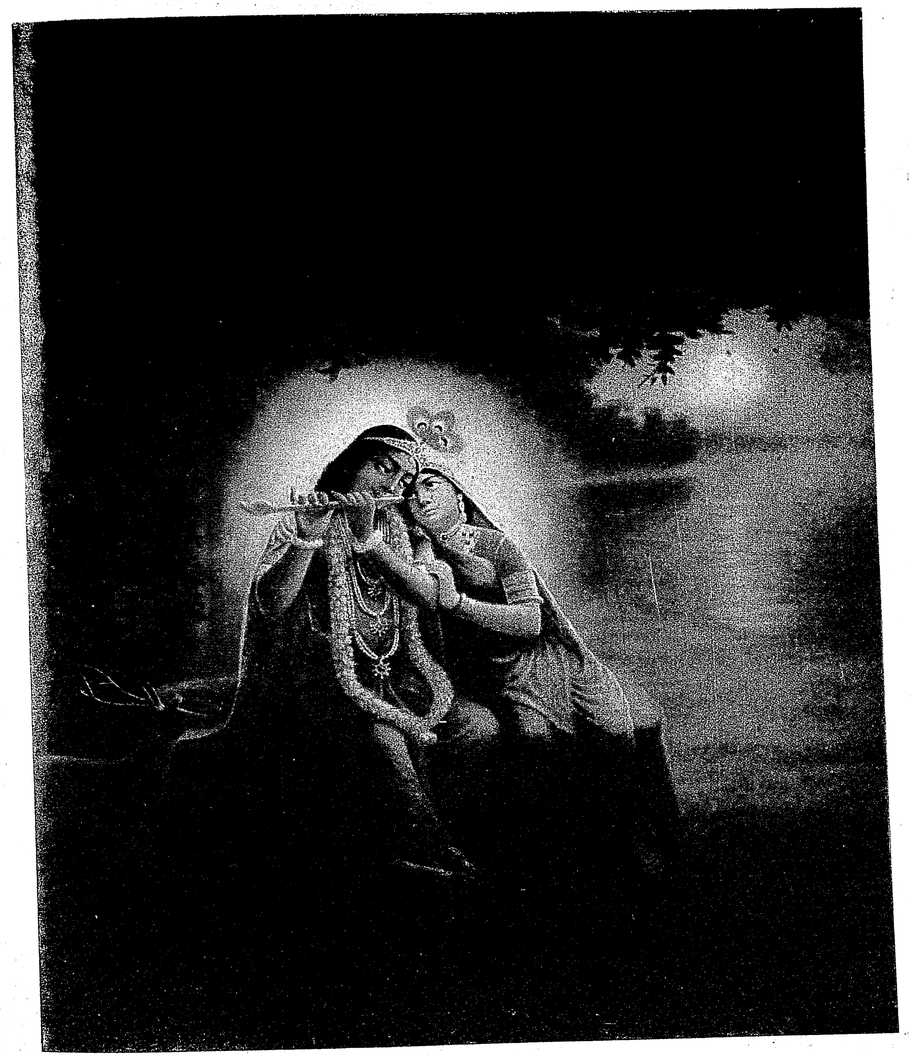

রাধিকারমণ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগচী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

তুলিয়া লইয়া—এবং সে বিপদকে আবার বরিয়া লইলেন নিজের জন্যও নহে, দৌলতের সুখ ও শান্তির জন্য—দৌলত উন্নেসার বিরহ-বিক্ষুব্ধ জীবনকে শক্তসিংহের সরস মধুর স্পর্শ দানে সতেজ সরস আনন্দোজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য। তাই তিনি নিজেই শক্তসিংহকে বলিলেন,—"শক্তসিংহ! আমার অমূল্য হার আমার হৃদয় ছিঁড়ে আমার গলা থেকে উন্মোচন ক'রে তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি।...

তাহার পর পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে শক্ত সিংহের প্রতি মেহের উন্নেসার গাঢ় প্রেমের আর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।—এখনও তাঁহার মাঝে মাঝে পাপ ঝঞ্ঝা মনে মনে জাগিয়া উঠে; এবং তিনি এইবার তাহাকেও দমন করিয়া একেবারে মনে-প্রাণে ব্রহ্মচারিণী হইয়া কালাতিপাত করিতে চান্। তাই তিনি গাহিলেন,...

"মোহের মদিরা ঘোর, ভেঙেছে ভেঙেছে মোর;
কেন রহে পিছে পড়ি পাপ বাঞ্ছা পরশনে।

তাহার পর তাঁহার মনকে তিনি রাণা প্রতাপসিংহ ও সম্রাট আকবর সাহের ভিতর সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিলেন, এবং পরিশেষে কৃতকার্য্যও হইলেন।

এমনি করিয়া ছায়া ও মেহেরউন্নেসা উভয়েই উভয়ের প্রিয়তমকে অপরের জন্য পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের অনন্ত করুণার ছায়া আবার তাঁহার প্রিয়ের পার্শ্বে স্থান পাইলেন; কিন্তু মেহের পান নাই। ত্যাগের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে সারা জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

মেবার-পতনের মানসীকেও এমনি করিয়া তাঁহার প্রিয়তম অজয় সিংহকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তবে সেটা ছিল একটু বিভিন্ন ধরণের। কেন না, অজয় পর-রক্ষার্থ মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ায়, তিনি আর তাঁহাকে পান নাই।

মানসী যখন দেখিলেন যে, অজয়ের প্রতি তাঁহার সমস্ত প্রেমই একটা চরম ব্যর্থতায় পরিণত হইল, তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি সমগ্র জগতের হিত-সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করিবেন; এবং এমনি সারা বিশ্বের কর্ম্মের মধ্য দিয়াই নিজের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। এমনি করিয়া তাঁহার তরুণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র প্রেম পরিশেষে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হইয়া সমগ্র বিশ্বের অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল।

মানসী।...এসো আমরা দুইজনে মনুষ্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করি।...এ ব্রত যার তার কিসের দুঃখ?

আবার তিনি কল্যাণীকে উপদেশ দেওয়ার জন্য বলিতেছেন—তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর। সান্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না—যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না—সে সেবা ক'রেই সুখী।...

মানসীর চরিত্রেও ঐ একই সুর যেন গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে, আমরা শুনিতে পাই।—

দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা-চরিত্রেও এমনি আত্ম-বলিদানের জলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের নয়নপথে আসিয়া পড়ে। রামকে সীতা একান্ত আন্তরিক ভাবেই ভালবাসিতেন; এবং তাই তিনি অমন করিয়া স্বামীর যশ ও কল্যাণের জন্য রাজ্য ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া বনবাসে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—তাই তিনি তুচ্ছ জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইতে অতটা সাহসী হইয়াছিলেন। ভবভূতির উত্তররামচরিতের সীতা-চরিত্রেও এমনি আত্মবলিদানের জলন্ত দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। সীতার প্রেমের বিশেষত্বই এই—রামের ও জগতের হিতে আত্ম-বলিদান।

দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নাটকের পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রেমের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা আছে, তাহা অভূতপূর্ব্ব।... এমন সরল সুন্দর ব্যাখ্যা বোধ করি আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কেহ দিতে পারেন নাই। সেটুকু তুলিয়া দেওয়ার লোভ আমি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বাল্মীকি।...প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর।
প্রেম পথ দেখায়, কর্ত্তব্য চলে সেই পথ বাহি;
প্রেম দেয় বিধি, নিত্য কর্ত্তব্য পালন করে তাহে।
...প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু মিথ্যা নাহি কহে।
যেথা ধর্ম্ম সেথা প্রেম; যেথা পাপ, প্রেম নাহি রহে।
প্রেম প্রভু, কর্ত্তব্য তাহার ভৃত্য।.....

কর্ত্তব্যের চেয়ে যে প্রেম কত বড়, প্রেমের কাছে কর্ত্তব্য যে কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—কর্ত্তব্যের জন্য প্রেমের অবমাননা করা যে কত বড় মূর্খতা, দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে তাহারই একটি সুন্দর সরস ও সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সিংহল-বিজয়ের লীল-চরিত্রেও প্রেমের জন্য আত্ম-বলিদানের একটি চরম দৃষ্টান্ত। লীলার সহিত বিজয়সিংহের

বাল্যে বিবাহ হয়; এবং তাঁহার সহিত পরে তাঁহার সত্য নারী বেশে আর কখনও দেখা না হইলেও, লীলা যে তাঁহাকে সেই সামান্য কয়দিনের মধ্যেই একান্ত আন্তরিক ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন—তাঁহার চরিত্র হইতে আমরা খুব সুন্দর ভাবে তাহা বুঝিতে পারি।

বিজয়সিংহ কুবেনীকে ভালবাসিতেন। সেজন্য লীলা তাঁহাদের সে ভালবাসায় পাছে বাধা উৎপাদন করেন, এই ভয়ে প্রাণান্তেও একদিনও আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন নাই—চিরদিন ঐ ছদ্মবেশ দিয়া তাঁহার সত্য পরিচয়কে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এও একটা মহৎ ত্যাগের জলন্ত পরিচয়।

বিজয়সিংহকে ভালবাসিয়া শুধু তাঁহার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়াই লীলা একান্ত সুখী—তাহা তাঁহার তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্যের একটী বাক্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজেই বিজয়সিংহের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—"আমার কোনও বাসনা নাই।"

আর একবার চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে তিনি কুবেনীর সহিত কথোপকথনে যাহা বলিয়াছেন,—তাহাতেও তিনি তাঁহার অন্তরস্থ প্রেমের একটা সুন্দর ও সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

লীলা। এক ভালবাসা আছে, যা সর্ব্বদা প্রিয়জনকে আপনার ক'রে নিতে চায়—যে সাহচর্য্য প্রতিপক্ষ-প্রণয় সহ্য ক'রতে পারে না; যে প্রেম, তার পুষ্পকোমল ক্ষীণ বাহুর বন্ধনে একটা জগৎকে আঁকড়ে ধ'রতে চায়—বক্ষের মধ্যে একটা অগাধ অস্থির সমুদ্রকে বেঁধে রাখ্‌তে চায়।... কিন্তু আর এক ভালবাসা আছে জেনো মহারাণী! যা নিত্য বিশ্বের কল্যাণে আপনাকে জাগিয়ে তোলে, যা আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়; সুখী ক'রে সুখী হয়! সেই ভালবাসার এক কণা পাই ত' আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি। কিন্তু যদি না পাই, ক্ষতি নাই—কারণ সে ভালবাসার আশা করি না।...শুধু কামনাহীন প্রেম জপ কর।

এই কামনাহীন প্রেমই লীলার নারী-জীবনের একমাত্র ব্রত ও সাধনা হইয়া উঠিয়াছিল।

চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে আবার লীলা কুবেনীকে বলিতেছেন,—তোমায় ভালবাসি।...আমার বিজয় যে তোমায় ভালবাসেন, আমি ভাল না বেসে থাকতে পারি!—

লীলা কুবেনীর হাতে তার বিজয়সিংহকে একেবারে ছাড়িয়া দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, এক কণাও ক্ষুব্ধ বা বিষণ্ণ হন নাই—শুদ্ধ তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারিতেন। এতটা স্বার্থ ত্যাগে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন—শুদ্ধ বিজয়সিংহ কুবেনীকে ভালবাসিতেন বলিয়া।—

লীলা তাঁর স্বামীকে এতটা ভালবাসিতেন যে, তাঁহার জন্য কুবেনীর আদেশে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতেও প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিলেন।—এত বড় আত্মবলিদানের কথা আমরা শুধু সাধ্বী সীতা চরিত্রেই প্রথম শুনিয়াছিলাম। আর দ্বিজেন্দ্রলাল পুনরায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে আজ আঁকিয়া ধরিয়াছেন।

চতুর্থ অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্যে তাঁহার শেষ উক্তির পর তিনি তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।—প্রেমের জন্য আত্ম-বলিদানের এই জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতের সমক্ষে ধরিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্ট এই লীলা আজ সাহিত্য-জগতে একটা অভিনব সুরের ঢেউ বহাইয়া গিয়াছেন।—

লীলার শেষ কথা—"আমার প্রেমের মোহ কেটে গিয়েছে।—অগ্নি-পরীক্ষায় আমার মালিন্য পুড়ে গিয়েছে! এখন আমার যা আছে, তা শিশিরের মত পবিত্র—ঐ নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল।"

কুবেনী। তুমি কি বলছ বালিকা?

লীলা। এত দিন আমার প্রেমে প্রতিদানেচ্ছা ছিল, রূপের গর্ব্ব ছিল, সুখে অতৃপ্তি ছিল। আর নাই। বিজয়সিংহ আমার অন্তরে। বাহিরের বিজয়কে তোমায় দিলাম।...

দুর্গাদাসের মধ্যেও সরস্বতীর মুখ দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল আর একটা প্রকৃত প্রেমের ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"প্রেমের গতি নির্ঝরিণীর মত স্থির, স্বচ্ছ, মন্থর। বারি-প্রপাতের মত উচ্ছ্বসিত ফেনিল দ্রুত নয়। আসল প্রেম চকিত বিদ্যুতের মত তীব্র নয়। জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ মধুর।"

বাস্তবিক মানুষ যখন প্রথম তার হৃদয়ে কোনও এক নারীর প্রতি প্রেমের পরশ অনুভব করে, তখন সে প্রেম উগ্র, কামের পঙ্কিলতায় তাহা মলিন। কিন্তু ধীরে ধীরে

যখন তাহা পরিণামে একটা শান্ত স্বচ্ছ ভাব ধারণ করে, তখনই তাহা প্রকৃত প্রেমে পরিণত হয়।—

সাজাহানের মহামায়ার মুখ দিয়াও প্রকৃত প্রেমের ঐ একই ব্যাখ্যা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশ করিয়াছেন।—তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে রাণাকে তিরস্কার করিয়া মহামায়া বলিতেছেন—"...যে ভালবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তর করে, যে ভালবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তার দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, যে ভালবাসা প্রভাত সূর্য্যরশ্মির মত যা'র উপর পড়ে তাকেই স্বর্ণবর্ণ ক'রে দেয়, ভাগীরথীর বারিরাশির মত যা'র উপর পড়ে তাকেই পবিত্র ক'রে দেয়, দেবতার বরের মত যা'র উপর পড়ে তাকেই ভাগ্যবান করে—এ সেই ভালবাসা; অচঞ্চল, অনুদ্বিগ্ন আনন্দময়—কারণ উৎসর্গময়।"

এই যে প্রেমের ব্যাখ্যা, ইহা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রতি নাট্যগ্রন্থেই বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; এবং এই সকল স্থলেই তাঁহার নাট্যশিল্পীর অপূর্ব্ব কলাকৌশলের সুস্পষ্ট প্রকাশ। শিল্পী তাহার সৃষ্টিতে হাতদেয় কোন একটা উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে জাগ্রত রাখিয়া। দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে একটা উদ্দেশ্য লইয়াই এই প্রেমিকা চরিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন; এবং সে উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তাহাদের সাধারণ প্রেমকে একটু মার্জ্জিত করিয়া সামান্য উন্নত করিবার চেষ্টা করিবে। নাটক সৃষ্টির একটা সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এই যে, সেই নাটকের অভিনয় দেখিয়া মানুষ কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারে; এবং ঐ নাটকীয় চরিত্রের কিছু কিছু সারাংশ লইয়া নিজের চরিত্রে সেটাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহাকে উন্নত করিতে পারে। যে নাটকের চরিত্রাভিনয় দেখিয়া মানুষের মন বিহ্বল হইতে পারে, মানুষের মন গলিত বশীভূত হইতে পারে, সেই নাটকই নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, বলিদান—বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ইত্যাদির মধ্যেও এমনি অনেক কিছু নাট্যশিল্পের সুন্দর সুস্পষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার আয়েষা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রেমের জন্য এই প্রকারের আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

অবশ্য ইহার মধ্যেও একটা কথা আছে। এই সমস্ত নাট্যকারগণ এই শ্রেণীর যে সকল চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা প্রায়ই ভাবতান্ত্রিক; বস্তুতান্ত্রিকতার ধার দিয়াও ইহারা যায় নাই। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকতা যে ঐতিহাসিক নাটকের উপযোগী নহে, এ কথা বোধ করি সকলেই অবগত আছেন। বাস্তব জগতে হয় ত এরূপ কামনাহীন, ত্যাগশীল প্রেম কখনই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু, বাস্তব জগতে যাহা ঘটে, তাহাকে কিছু মার্জ্জিত করিয়া, জগতের যাহাতে শুভ ঘটে এইরূপ চরিত্র অঙ্কিত করাই নাটকীয় সাহিত্যের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য এবং সেই-খানেই নাট্যশিল্পের চরম বিকাশ।

নাট্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য নাটকীয় বিষয় ও তাঁহার চরিত্র-গুলিকে মহৎ করিয়া অঙ্কিত করা; এবং এই জন্যই অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম আছে যে, নাটকের নায়ক বা নায়িকার চরিত্রকে অত্যন্ত মহৎ ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন করিয়া গড়িতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল এ নিয়মটি অত্যন্ত সতর্ক ভাবে মানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক নাট্যকারগণ এ নিয়ম বড় একটা মানিয়া চলেন না।—সামাজিক নাটকে অবশ্য এ নিয়মটি না মানিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু সেরূপে অঙ্কিত চরিত্রপূর্ণ নাটককে প্রথম শ্রেণীর নাটক বলা যায় না। আর এই সমস্ত নিয়মের বশীভূত বলিয়াই নাটককে আজ পর্য্যন্ত ললিতকলার (Fine art) একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়।

নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় তখন, যখন নাটক পড়িতে পড়িতে নাট্যকারের কথা ভুলিয়া যাই;—শুধু যে চরিত্র পড়িতেছি,—মনে হইবে, যেন ঠিক সেই ব্যক্তিকেই আমি সম্মুখে পাইয়াছি, এবং পড়িতে পড়িতে একেবারে তন্ময় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। উচ্চ শ্রেণীর নাটক পড়িবার সময় পাঠক কিছুতেই নাট্যকারের লেখার গুণের বিষয় চিন্তা করিয়া অবসর পাইবেন না—তাঁহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত মনোযোগ ঐ চরিত্র পাঠে নিয়োজিত থাকিবে।

অতএব ভাবতান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে দ্বিজেন্দ্র-নাট্যের এই সমস্ত চরিত্র পরীক্ষা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার এ নাট্য রচনা সাহিত্যের একটা অঙ্গকে অমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের যে বিরাট অভাব ছিল—দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল ও সুনিপুণ শিল্প-প্রতিভার বলে তাহার বিমোচন করিয়াছেন।

মাতৃবাণী

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

সেদিনো বিশ্বে জাগেনি প্রভাত—সুপ্তি-মগন ধরা,
ঊষার প্রথম তপ্ত-পরশ লভিতে করিনু ত্বরা,
গৃহ-বাতায়ন রেখেছিনু খুলে নিভায়ে প্রদীপ মোর—
পূর্ব্ব-অচল-অরুণ-রশ্মি ঘুচাবে আঁধার ঘোর।
রাত্রি-শেষের তন্দ্রা ভাঙিনু—মুছায়ে তামস গ্লানি
শুনানু তোদের কর্ণ-কুহরে দিব্য-পুরুষ বাণী—
অমৃতের বরপুত্র তোরা যে পুণ্যধামের বাসী—
কণ্ঠে তোদের ভাতিল সেদিন অযুত শাস্ত্ররাশি।
হিমানীর তলে, ঘন অরণ্যে, বিহগ কাকলি সনে
সামরব মিশি' জাগায়ে তুলিল সুষুপ্ত তপোবনে,
চিত্ত-আকাশে উদিল মন্ত্র জ্যোতির ঝলকে মিশি'—
সম্ভ্রমে শির আনত করিল মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি।

* * *

বেশী দিন নয়—জাগিয়া দেখিনু—তোদেরি ধর্ম্মরাজ
যা-কিছু পুণ্য ঢালিছে তাহার যজ্ঞ-অনল মাঝ,—
স্বর্গ সঁপিয়া দিতেছে তোদের অলস হস্ত'পর—
দুর্ব্বল ভীরু নিরীহ প্রাণীর বুকেতে হানিয়া শর ;
ক্ষমতা-বিলাসী যাজ্ঞিক যত সংযম পায়ে দলি'
স্বার্থের যূপ-কাষ্ঠে তোদের ধর্ম্ম দিতেছে বলি ;
বেদিকার তলে জ্ঞানের প্রদীপ—স্তিমিত শিখাটী তার—
মোক্ষ বিকিছে অর্থ-পণ্যে—মন্ত্র রসনা-সার!

* * *

সেদিন তোদের নিঠুর হাতের কাড়িয়া রক্ত-ঝারি
সর্ব্ব-লোকের পুণ্য ছাঁচিয়া ঢালিনু আশীস-বারি ;
আবাহন মা'র তুলি নিয়া শিরে—ছাড়িয়া রাজ্য আশ—
সন্তান মোর আসিল ঘুচাতে তোদেরি করম-পাশ ;
ফেলি দিল দূরে বাসর-ভোরের শুষ্ক মালিকা মত
জগৎ যা-কিছু ছিল আপনার—বন্ধন ছিল যত ;
তোদেরি সে দেওয়া দুঃখ-পশরা লইল আপন শিরে—
বিশ্ব সেদিন দেখিল চমকি' মানব-ধর্ম্ম-বীরে।
তারি তপোক্লেশ, দুঃখ সে কত—তীক্ষ্ণ অশনি সম—
জানিস্ কি তোরা—বিঁধে আছে আজো মাতৃ-হৃদয়ে মম!

আপন হিয়ার রক্তে তোদের ধুয়ে দিল পাপ-ক্ষত—
তোরা কি করিলি? ধর্ম্মের নামে ধরিলি পিশাচ-ব্রত!

* * *

দেখিনু তোদের বুদ্ধ-বিহারে হিংসা-বিষের জ্বালা,
সংঘারামের স্থবিরে দেখিনু পরিতে মুণ্ডমালা ;
বুদ্ধের নামে ঢেলে দিলি তোরা পাপের পঙ্কস্রোতে—
অতীতের যত কীর্ত্তি মহান্ উপাড়ি' পৃথ্বী হতে' ;
ধর্ম্মের নামে জায়া ভগিনীর বিনাশি' ধর্ম্ম বলে
নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ খসালি' মোক্ষ-সাধন ছলে ;
সংঘের নামে সন্ধি করিলি শত্রু-চরণ চুমি'—
আপন ভায়ের রক্তে ডোবালি পুণ্য জনম-ভূমি!

* * *

সন্তান-শিরে তখনো ঢেলেছি কত না পুণ্যধারা
হিয়াটী আমার শূন্য করিয়া—তোদেরি ভাঙ্গিতে কারা;
স্নেহ প্রেমতৃষা, মমতার ক্ষুধা চরণে গিয়েছি দলি'—
দিয়েছি তোদের কর্ম্ম-কঠোর সংগ্রাম মাঝে বলি ;
শিয়রে তোদের জেগেছিনু আমি সে ঘোর আঁধার রাতে,
বিভীষিকাময়ী স্বপ্ন এঁকেছি তোদেরি আঁখির পাতে;
কত না এমন অ-ঘুম রজনী কাটিয়া গেল যে মোর—
জানিনে কোন্ সে দুঃখে মহান্ কাটিবে তন্দ্রা ঘোর!
মা হ'য়ে তোদের তপ্ত শোণিতে পরেছি রক্ত-টীকা,
মা হ'য়ে আমার হৃদয়ে জ্বেলেছি প্রলয়-বহ্নি-শিখা!
তবুও তোদের তন্দ্রা ভাঙ্গেনি, রহিলি স্বপন ঘোরে,—
ব্যর্থ করিলি জননীর ব্রত কত শতাব্দী ধরে'।

* * *

সে কাল-নিদ্রা ভাঙ্গিল না তবু—শাণিত খড়্গ করে
বিশ্ব-বিজয়ী তুর্ক যখন দাঁড়াল শিয়রোপরে ;
দেখালি বিশ্বে—নিলাজ ঘৃণ্য তোরা যে কতই দীন—
দুর্ব্বল কত অসিহীন বাহু শুধিতে মাতৃঋণ!
শ্মশানে তোদের শবের সাধনা, মন্ত্রণা গৃহকোণে,
যুদ্ধ-বীরের পদরেণু দেখি' দেবতা-সিংহাসনে!

ম্লেচ্ছ কি তারা? বীর্য্য তাদের মহান্ সাম্যনীতি
শিখিলি না কভু ;—ধর্ম্ম তোদের শুধুই শমন-ভীতি!

* * *

সেদিনো তোদের স্নেহের বাঁধনে মুছিয়া অশ্রুবারি—
বক্ষ নিঙাড়ি' ভরিনু যতনে শান্তি-জলের ঝারি ;
করপুট মোর রেখেছিনু ঢেকে তোদেরি সাধনা-ভাতি,
অপলক আঁখি জেগেছিনু—কবে কাটিবে তামস-রাতি ;
দেখেছিনু বসে'—ভাগ্য-অচলে ঊষার রশ্মিসম
জ্যোতির তনয় নেমে এল হেথা তৃষিত বক্ষে মম ;—
ভিখারী-দুয়ারে দাঁড়াল আসিয়া ভিখারীর বেশে ধীরে,
কবীর, নানক, গোরা নদীয়ার প্রেমের পশরা শিরে।
ঘৃণার আহুতি জাতীয়-যজ্ঞে রচিল যে হলাহল—
প্রেমের অমৃত বারিতে তাহারা নিভাইল সে অনল।
তবুও তোদের কুটিল নেত্রে না জাগিল প্রেমতৃষা—
আপনা ছাড়িয়া বিশ্ব মাঝারে না পেলি কাহারো দিশা!

* * *

দেখিনু তোদের পণ্ডিত যত বিদ্যা-গরবে ভরা—
গণ্ডী মাঝারে রচিছে যতনে আপন ক্ষুদ্র ধরা ;
জ্ঞানের শিখাটী উজলি' তাদের গ্রহ-পঞ্জিকা-মাঝ
শুভক্ষণ আর অশুভ লগন কোথায় দেখাবে আজ!
সাগর-বারির স্পর্শে তোদের ধর্ম্ম মরিবে ভবে—
বাঁচিবে সে শুধু বাল-বিধবার আর্ত্ত কণ্ঠরবে!
বিধি ও নিষেধ, তিথি, মূলমাস, এই নিয়ে হলি' সারা,
আপন চরণে নিগড় পরালি—রচিলি আপন কারা!

* * *

যে ঘৃণা-পঙ্ক ঢেলেছিস্ তোরা মানব-দেবতা-শিরে—
বুঝিলি না আজো ধুতে হবে সে যে তোদেরি অশ্রুনীরে ;
কত যুগ ধ'রে রহিবি এমন ঘৃণার সাধনা রত,
জানি না কবে যে মুছাইয়া দিবি মাতৃহিয়ার ক্ষত ;
জানি না কবে যে রাষ্ট্র-বীণায় উঠিবে প্রেমের গীতি,
ঘুচিবে তোদের দৈন্য, লজ্জা, কুটিল ধরম-নীতি ;
ভাতিবে আবার ভাগ্য-গগনে—বিকরি' দীপ্ত প্রভা—
কর্ম্ম-উজল জ্ঞানের গরিমা আলোকি' বিশ্বসভা।
সেই সাধনার কি বীজমন্ত্র—হোমের আহুতি কিবা—
কে বলিয়া দিবে? দ্রষ্টা সে কোন্—জাগিছে রাত্রিদিবা
কেবা সে ঋত্বিক?...সন্তান মোর, আমার আশীস্ নিও,
বলি দিবে যবে—পূর্ণ আহুতি—প্রাণের চেয়ে যা' প্রিয়!

অজানার ডাক

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(১)

সমস্ত সকাল ধরে সেই যে বর্ষণের গান আরম্ভ হয়েছিল, সারা দিন তার একটুও বিরাম ছিল না। বিকালের দিকে তার উদ্দামতা আরও বেড়ে গেল। ঝরে ঝরে আজ বর্ষার বারিধারা ধরার বুকটা ধুইয়ে নিভিয়ে ভাসিয়ে দেবে, এইটেই ছিল যেন তাদের প্রতিজ্ঞা।

এই বর্ষার বেদনা আজ একজনের মনে একটু আরাম এনে দিচ্ছিল—সে শান্তি।

জন্মাবধি শান্তি কোন কুলবধূর মনের খবর রাখে না; কোন শান্তিভরা কুটীরের রাণীর আরাধনা সে শুনে নি; ব্যস্ত গৃহিণীর ছেলে বা স্বামীর পরিচর্য্যা তার কাছে একটা কল্পনার জিনিস ছিল।

এ পথে তার কোন্ মা কবে বের হয়েছিল, তা সে জানে না। শুধু জানে, রূপ ও যৌবনের খেলা দেখাতেই সে সৃষ্টিপতির কাছ থেকে পৃথিবীর বুকে এতটুকু জায়গা চেয়ে নিয়েছে। ব্যর্থ নারী-জীবনটা তার খাঁ খাঁ করত শূন্য মরুভূর মত। তাই সে তার জীবনে কোন দিন শান্তি পেত না।

নিষ্ঠুর পরিহাসের মত কোন এক মা এক দিন তাকে

'শান্তি' নাম দিয়েছিল, হয় ত এই অশান্তির নরকে এতটুকু শান্তি পাবার আশায়।

শান্তির বেদনাতুর মনটী তাই সেই মাতাল হাসির হর্‌রা-তোলা বাড়ীটা ছেড়ে চলে যেতে চাইত কোন দীনের কুটীরে—যেখানে স্বামীর হাস্যটুকুতে হাসিই ঝরে পড়ে, লালসা থাকে না—বন্ধুর পরিহাসে পরিহাসই থাকে, কদর্য্যতার আভাস পাওয়া যায় না।

তার সেই বিশ্রী পল্লীর দ্বিতল বাড়ীটার সাম্‌নে দিয়ে যখন জননীরা তাদের ঘুমন্ত ছেলেগুলিকে বুকে নিয়ে স্বামীর পাশে ছোট গাড়ীতে বসে চলে যায়, তখন সে একটা মরুর পিপাসা বুকে নিয়ে, ভিখারীর রাজ-ঐশ্বর্য্য দেখার মত তীব্রতা চোখে মাখিয়ে চেয়ে থাকত তাদের দিকে। তার ছোট্ট বুকটুকু ভরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আস্‌ত—আয়ত চোখ দুটো জলে ভরে যেত। পিপাসী হিয়া সমস্ত শিরা-উপশিরায় আগুনের উত্তাপ জ্বালিয়ে দিয়ে ব্যাকুল হয়ে কাকে বল্‌তে চাইত—তুমি আমার, তুমি আমার,—রোগে, দুঃখে, দৈন্যে, দারিদ্র্যে—সহচর তুমি আমার।

আজ এই বর্ষার বিকালে কেউ তার বাড়ী আস্‌বে না এইটে ভেবে সে আরামের নিশ্বাস ফেলেছিল। আজ আর এই দেহটাকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে, তার আশ্চর্য্য রূপ রঙের তুলিতে দ্বিগুণ ফুটিয়া তুলে, তাকে বিভ্রম কর্‌তে হবে না কাউকে।

(২)

সূর্য্য একেবারে অস্ত গিয়েছিল কি না, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না—আকাশে বড় বেশী কালো মেঘ জমেছিল বলে। বৃষ্টি তখনও বেশ জোরে হচ্ছিল। সহরতলীর বুকটা আঁধারে ভরে আস্‌ছিল। রাস্তার গ্যাসগুলো জ্বালি জ্বালি করেও তখনও জ্বালা হয়ে উঠ্‌ছিল না। তার বাড়ীর একতলার একটা ঘরে বিছানাটার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে হাতের উপর চিবুকটা রেখে শান্তি এক মনে পথিকহীন রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল। রাস্তাটা ভরে গিয়েছিল জলে। একটা গাড়ী চলে গেল ছড়্ ছড়্ করে সেই বৃষ্টিতে।

একটী পথিক শুধু সেই বৃষ্টিতে চলেছিল—সেই পথিক-হীন পথে বড় ক্লান্ত ভাবে। তার ছাতিটায় বৃষ্টির জলের বেগ থাম্‌ছিল না। তাই তার সমস্ত শরীর জলে ভিজে গিয়েছিল। আকুল নয়নে সে শুধু চারিধারে দেখ্‌ছিল একটু আশ্রয় পাবার জন্য। এই পথটায় স্বভাবতঃই লোক-চলাচল কম। তাই পথিকটী সহজেই শান্তির উৎসুক দৃষ্টির পথে এসে পড়্‌ল। শান্তির বাড়ীর সাম্‌নে ছিল একটুখানি রক। পথিক যেন সেইটী দেখ্‌তে পেয়ে অকূলে কূল পেলে। আস্তে আস্তে তার ক্লান্ত দেহটা টেনে এনে বস্‌ল সেখানে। শান্তি একটু অস্বস্তি বোধ করলে। তার পর কিছুক্ষণ পরে তার দিকে চোখ্ পড়্‌তে দেখ্‌লে, পথিকটী সেই ভিজে রকটারই উপর শুয়ে কাঁপছে। তার কোমল নারী-হৃদয় তাকে যেন চাবুক মারলে, সে বাইরে এসে বল্‌লে—"যদি কিছু না মনে করেন ত ভেতরে এসে বসুন।" পথিক তখন তার মাথার উপর হাত দুটো টিপে চোখ বুজে শুয়ে ছিল—কথা বল্‌তে পার্‌লে না।

শান্তি বুঝ্‌লে লোকটী অসুস্থ। কোন রকমে ধরে সে যখন লোকটীকে উপরে তার শোবার ঘরে এনে শুইয়ে দিলে, তখন লোকটী জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।

মোক্ষদা মাসী ঘরে ঢুকেই খুব চীৎকার জুড়ে দিলে। শেষে লোকটীর হাতের হীরের আংটীটা ও সার্টের সোণার বোতামগুলো সাবধানে আঁচলে বেঁধে বক্‌তে বক্‌তে নীচে নেমে গেল।

(৩)

ডাক্তার এসে বল্‌লে টাইফয়েড। শান্তির বুকটা ভরে কেন যে একটা বিপুল ক্রন্দন হাহা করে উঠ্‌ল, তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পারলে না। মোক্ষদা মাসীর বিরক্তি ও চেঁচামেঁচি দ্বিগুণ বেড়ে চল্‌ল। সাত দিন পরে পথিক যখন চোখ চাইলে, তখন তার চোখ দুটো অস্ত-সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকুর মত লাল হয়ে উঠেছে। দৃষ্টিটুকু উদাস, অর্থহীন ও অস্বাভাবিক,—মস্তিষ্ক বিকৃত।

শান্তি মাথায় "আইস্-ব্যাগ" টা ধরে বসে ছিল। পথিক ডাক্‌লে—"বীণা! একটু জল দাও রাণী।"

এই তার প্রথম কথা, এই তার প্রথম সম্ভাষণ! সাতটা সেতার যদি একসঙ্গে এক সুরে বেজে উঠ্‌ত, তাহলেও শান্তির প্রাণে এতটা চমক্ আনতে বা এতটা মধু ঢালতে পার্‌ত না। তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠ্‌ল।

"তোমার কি বড় দুঃখ হচ্ছে বীণা! কাঁদছ কেন? আমি ভাল হয়ে উঠ্‌ব। ও কি, তবু কাঁদছ, কথা বলবে না বীণা!"

তার বুকের উপর উচ্ছলিতভাবে একদে উঠে শান্তি বল্‌লে—"ওগো, তুমি সেরে ওঠ। তোমার পায়ে পড়ি।" কেমন করে বোঝাবে সে এই তরুণ বিকারের রোগীকে, যে, সে তার বীণা নয়। সে সমাজের একটা ঘৃণ্য জীব—যেয়ো কুকুরের মত একপাশে পড়ে থাকে—সমাজের একটা দারুণ ব্যাধির মত।

যুবক আবার মা-তা ভুল বকে নিস্তেজ হয়ে পড়্‌ল। শান্তি আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে এই তরুণটীর সেবায় মেতে উঠ্‌ল। কলকাতার যত বড় বড় ডাক্তার জড় করে ফেল্‌লে। অজস্র টাকা জলের মত ব্যয় করে মেতে লাগ্‌ল। তার দয়িত আজ দেখা দিয়ে চলে যেতে চায় যে!

শেষ রাত্তিরে সে আবার চোখ চাইলে। শিয়রে ছিল শান্তি—আর নিবু নিবু দীপটুকু।

যুবক ডাক্‌লে—"বীণা"—

শান্তি বল্‌লে—"এই যে"—

"আমার হাতটা চেপে ধর বীণা; আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমায় ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে রাণী। আমরা যে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকি নি। তোমার জন্যে আমি কিন্তু অপেক্ষা করে থাক্‌ব—তুমি শীগ্‌গির আস্‌বে ত? আমায় ছেড়ে কি বেশী দিন থাক্‌তে পারবে তুমি?" বলে সে হেসে উঠ্‌ল।

"ওগো, না গো, না—তুমি ভাল হয়ে উঠ্‌বে, মা কালী মুখ তুল্‌বেন।"

"কেঁদ না বীণ্ আমি ভাল হয়ে উঠ্‌ব"—বলে যুবক আবার একটা বিকট হাস্য করে, তার শীর্ণ হাত দুটো দিয়ে শান্তিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, তার দীর্ঘ রুক্ষ কেশ-গুলো নিয়ে খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল।

(৪)

কিন্তু মা কালী মুখ তুল্‌লেন না। দীর্ঘ একতিরিশ দিন-রাত্তির-ব্যাপী যুদ্ধের ফলে যমরাজ জয়ী হয়ে বিজয়-গর্ব্বে যুবকের আর্ত্ত প্রাণটী হরণ করে চলে গেলেন স্বর্গে। শুধু তার অস্থিচর্ম্মসার দেহটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মর্ত্যের মানুষ শান্তি সেই মর-দেহটার উপরই মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল।

পরিচিত পাঁচজনের সাহায্যে যথারীতি সৎকার করে শান্তি যখন ঘরে ফিরে এল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মোক্ষদা মাসী রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে বল্‌লে—"বলি হালা শান্তি, তোর দিনে দিনে হোল কি? তোর কি বিয়ে করা সোয়ামী মরেছে না কি, যে, তুই চুড়িগুলো খুলে, সিঁথের সিঁদুর তুলে— থান পরে এসে দাঁড়ালি। দূর্‌হ, দূর্‌হ।"

শান্তি কিন্তু সেদিকে না চেয়েই বরাবর উপরে গিয়ে রোগীর পরিত্যক্ত জায়গাটার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

কতক্ষণ শুয়ে ছিল সে জানে না—উঠে দেখে, সারা বিশ্ব-প্রকৃতিতে একটা উদ্দাম ঝঞ্ঝা আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টি ও ঝড়ে সমস্ত সৃষ্টি যেন তাণ্ডব উল্লাসে মেতে উঠেছে। শান্তির মনে হল, আজ সারা সৃষ্টিতে ভেসে বেড়াচ্ছে সেই আর্ত্তস্বর আকুল হয়ে, যা তাকে সেদিন বলেছিল—"আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব—আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারবে কি বীণা?"

শান্তি থাক্‌তে পার্‌লে না। একটা দারুণ হতাশা তাকে যেন পাগল করে তুল্‌লে। একতিরিশ দিন ধরে সে অমৃতের স্বাদ পেয়েছিল। যাকে বরণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে সে এত দিন ধরে তার যৌবন-ডালা সাজিয়ে রেখেছিল, সে এসেছিল এক বর্ষা-সন্ধ্যায় আর্ত্তের মত,—শুধু সেই তাকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌লে না।

তবু সেই আপন-ভোলা, বিকৃত-মস্তিষ্ক, বিকারগ্রস্ত তরুণটী যখন তাকে বীণা বলে বুকে জড়িয়ে ধরত, তখন সে মনে কর্‌ত, এই মোহন তরুণটীর কত জন্মজন্মান্তরের বীণা সে! শান্তির অস্তিত্বই তাকে পাগল করে তুলত। আজ একটা তুমুল দ্বন্দ্ব বেধে গেল এই ভেতরের বীণা আর বাইরের শান্তির সঙ্গে। তার অন্তরের বীণাকে, শান্তির জিনিসপত্র, টাকাকড়ি, বাড়ীঘর যেন গুড়িয়ে দিতে চাইলে। শুধু এই শান্তির অস্তিত্বটাই তাকে উল্কার মত বার করে দিলে সেই নরকপুরীর বাইরে। সে বীণা, তাই সেই বীণাকেই সে চায়, এই শান্তিকে নয়।

সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি তোলপাড় হয়ে উঠ্‌ছিল ঝড়ের বেগে। বর্ষার ভরা গঙ্গা যেন তাকে দু'হাত তুলে ডাক্‌ছিল "আয়, আয়, আয়।"

সেই অন্ধকারে সে বেরিয়ে পড়্‌ল একাকী পথে,—সেই তার একতিরিশ দিনের দেবতা অজানা পথিকের উদ্দেশে, না, বীণার খোঁজে—কে জানে।

ফিলিপাইন

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আইগোরোটদের সামরিক নৃত্য

মানচিত্রে চীন-সমুদ্রের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-বিন্দুমাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তারই নাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জের সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র। এত রকমের বিভিন্ন জাতীয় লোক এখানে বাস করে—যে, তাদের একটা সঠিক হিসাব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, দীর্ঘকাল ধ'রে নানা দেশের নানা জাতের নানা বর্ণের—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরস্পর সংমিশ্রণে এখানে এত বেশী সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হ'য়েছে যে, পৃথিবীর কোথাও আর এমন দেখতে পাওয়া যায় না।

এই দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই অন্ততঃ আশীটি বিভিন্ন শাখার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে গৌরবর্ণ, পীতবর্ণ, শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ এই পঞ্চ বর্ণেরই লোক আছে। মাঝের বড় বড় দ্বীপগুলিতে যারা বাস করে, তারা অধিকাংশই নিগ্রো-বংশধর। তারা এখনও সেই প্রাচীন জীবনযাত্রার পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেই দিন যাপন ক'রছে।

এই দ্বীপের মধ্যে সকলের আগে এসে উপস্থিত হ'য়েছিল ইণ্ডোনেশীয়ানরা। তারা এসে প্রথমটা ঐ নিগ্রো কাফ্রীদের পাহাড়ে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়েছিল; কিন্তু পরে আবার তাদের সঙ্গে মেলা মেশা ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিল।

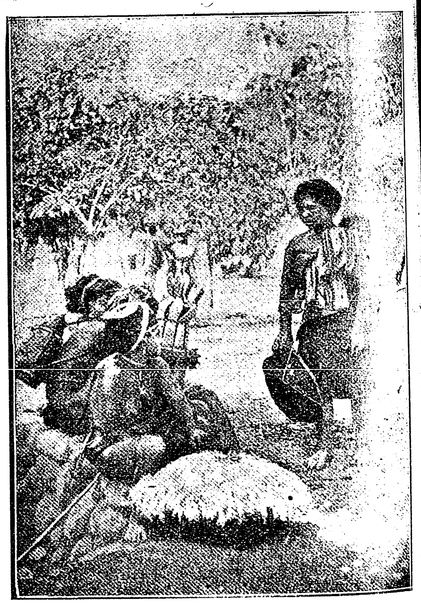

আইগোরোট কুলি রমণীগণ (আমাদের ভুটানী মেয়েদের মতো এখানকার আইগোরোট মেয়েদের নানা পুরুষোচিত কাজ ক'রতে হয়। তার মধ্যে মোট বওয়া প্রধান।)

ফিলিপাইনের সুসজ্জিতা তরুণী!

এই মেলা মেশার ফলে তাদের মধ্যে যে কয়টি—মিশ্র জাতির উদ্ভব হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে আইগোরোট্, তিঙ্গুইয়ান্, বাগোবো আর মান্দায়ারা। ইণ্ডোনেশীয়ানরা অধিকাংশই এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে এসেছিল। বরণীয়, সুমাত্রা ও মলয় উপদ্বীপের অধিবাসীরাও অনেকে এখানে শুভাগমন করে স্থায়ী ভাবে আড্ডা গেড়েছিলেন। মলয় উপদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে জনকতক 'মোরো' বা মালয়ী মুসলমানও ছিল। তাদের বংশধরেরা সদলে এখনও পলাবন ও মিন্দানাও দ্বীপে বসবাস ক'রছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের জনকতক লোক এবং একদল চীনে ভাগ্যান্বেষী এসে এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফিলিপাইনের বর্ণসঙ্করতাকে আরও জটিল ক'রে তুলেছিল। সুতরাং এদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণনা করা দু'একটি প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। কয়েকটি প্রধান

আইলোঙ্‌গোট কুলি-রমণী

(এরা চুরুট খায় এবং ভুটানীদের মতই মাথায় ঝুলিয়ে পিঠের উপর মোট বয়।)

জাতির বিষয় সম্পূর্ণ জানা থাকলেই ফিলিপাইন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নেওয়া সহজ হবে।

ফিলিপাইনের আদিম অধিবাসী নিগ্রোদের সম্বন্ধেই সর্ব্ব প্রথমে আলোচনা করা দরকার। এরা নিগ্রো বটে কিন্তু ঠিক কাফ্রী নয়। পাপুঁয়া ও আন্দামানী নিগ্রোরাই হ'চ্ছে এদের পূর্ব্বপুরুষ। এই নিগ্রোর দল কবে কেমন করে

ফলওয়ালী (বাগান থেকে টাট্‌কা তাজা ফল পেড়ে নিয়ে বেচ্‌তে যাচ্ছে)

এই দ্বীপপুঞ্জে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, এরা এখানে আসেনি, এই খানেই বরাবর ছিল; কারণ, প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপপুঞ্জই এশিয়া মহাদেশেরই অঙ্গ-সংলগ্ন একটা অংশ ছিল; কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের দুর্দ্দান্ত আলিঙ্গনে সে ভূখণ্ড ক্রমে অতলগর্ভে বিলীন হয়েছে, কেবল স্থানে-স্থানে

সুবুয়ানো মেয়ে। (এরা বনে থাকে বটে, কিন্তু সাজ-পো ভারি সৌখীন। এদের মেয়ে পুরুষ দুইই গণ্ডা গণ্ডা পো আঁট টাইট্ জামা প'রতে ভালবাসে)

জঙ্‌লি আইলোঙ্গোট্

(এ মেয়েটির চোখে মুখে নিগ্রো ছাপ দেখা যাচ্ছে। এরা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, কিন্তু সাজ-সজ্জায় প্রায় সহরে।)

উৎসব সাজে সজ্জিতা কলিঙ্‌গা মেয়ে

গৃহ কর্ম্মরতা (দুটি ফিলিপিনো মেয়ে গম ঝাড়চে ও শিলে বেটে আটা তৈরি করছে)

এই ত গেল ভূতত্ত্ববিদদের কথা;—কিন্তু আর এক দল নৃ-তত্ত্ববিদের মত হচ্ছে যে, না, সেটা কোনও কাজের কথা নয়। এই বেঁটে বর্ব্বর নিগ্রোর দল পাপুঁয়া ও আন্দামান থেকে ক্রমে ক্রমে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্ ও ভূতত্ত্ববিদের এই সব বিবাদ তাদের মধ্যেই ফেলে রেখে, আমরা এখন লোকগুলোকে নিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দেখি।

লোকগুলো সাড়ে চার ফুটের বেশী দীর্ঘ নয়। মাথায় কোঁকড়া চুল, ছোট চেপ্টা নাক, ভাঁটার মতো চোখ, কালো বা শ্যামবর্ণ গায়ের

মোরো চৌকীদার (কটিদেশে রিভল্‌ভার বাঁধা, হাতে একগাছা অশ্ব-তাড়নী)

রং, হাত দু'খানা শরীরের তুলনায় অত্যন্ত দীর্ঘ। আকৃতি যাই হোক, তাদের শরীরের গঠন কিন্তু ভারি

এশিয়ার সেই লুপ্ত প্রদেশের উচ্চ পার্ব্বত্য অংশগুলোই দ্বীপের আকারে এখনও জলের উপর মাথা তুলে ভাস্‌ছে।

সুন্দর। প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু, দৃঢ় মাংসপেশী, সুপরিমিত অবয়ব তাদের চেহারাগুলোর মধ্যে বেশ একটা শ্রী ফুটিয়ে রেখেছে।

শরীরের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য তারা দাঁত ঘষে রাখে, আর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ক'রে উল্কীর দ্বারা চিত্রিত করে। তাদের মধ্যে আলাদা একদল লোকই আছে—যাদের পেশা বা উপজীবিকাই হ'চ্ছে, স্ত্রীলোক বা পুরুষের দাঁত ঘষে দেওয়া ও উল্কী তুলে অঙ্গ-চিত্রণ করা! পুরুষেরা সাধারণতঃ কৌপিন পরিধান করে; আর স্ত্রীলোকেরা একটুক্‌রো ট্যানা বা টুক্‌নী প'রে। এই প্রায় উলঙ্গিনী সুন্দরীরা আবার বিবিধ অলঙ্কারও ব্যবহার করেন। ফল-ফুলের বীজ-মালার কণ্ঠহার তো তাদের একটা বারো-মেসে অলঙ্কার। এছাড়া পুঁতির কি কাঁচকড়ার মালা, খোঁপায় গোঁজা হরেক রকমের চিরুণী,

বাগোলো সুন্দরী

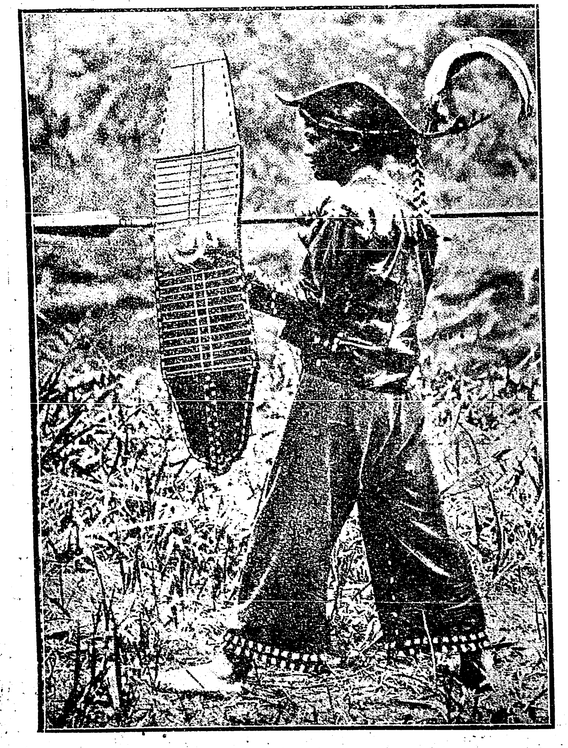

মান্দায়া শিকারী যুবক

তিঙ্‌গীয়ান্ সর্দ্দারনী

কোঁকড়া চুলের ফাঁকে আঁটা নানা রং-বেরংয়ের পাখীর পালক, কাণে ফুলের কুঁড়ির দুল, হাতে ফুলের তাবিজ, ফুলের বালা, এসবও আছে। আবার পালা-পার্ব্বণে উৎসব উপলক্ষে, বা আমোদ প্রমোদে এরা যে বিশেষ বেশভূষা করে, সে পোষাক

পসারিণী (একখানি ডালায় ফল-ফুলুরী সাজিয়ে নিয়ে ফেরি করতে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু পোষাক পরেছে কোনও সম্ভ্রান্ত ঘরণীদের মতো)

ভূর্জ্জ-পত্র বা গাছের ছালের তৈরি,—তাতে আবার নানা রকম রঙীন নক্সা আঁকা থাকে। সেদিন তারা তাদের মাথার কেশে বেশে চারিদিকে সুগন্ধ ও সুবর্ণ বিশিষ্ট ফুল ও লতাপাতা জড়িয়ে রাখে।

থাকবার জন্য তারা যে ঘর তৈরি করে, সে একেবারে

ফিলিপাইনের ফুলস্ন যোদ্ধা!

নিতান্ত গেলো রকমের। কারণ, তারা বেশী দিন এক জায়গায় বাস ক'রে না, খেয়াল মতো ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। কেউ কেউ হয় ত' আশে পাশের জঙ্গল খানিকটা কেটে কুটে সাফ্ করে ধানটান বা আলু প্রভৃতির চাষ আবাদ দেয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তার কোন আত্মীয় সে বাড়ীতে মারা পড়ে, তাহ'লে অবিলম্বে সে ঘর বাড়ী জায়গা জমি ক্ষেত খামার ফেলে অন্য জায়গায় তার বাস স্থানান্তরিত ক'রে। বন্য পশু পক্ষী শিকার ক'রে, মাছ ধ'রে ও জঙ্গলী ফল মূল খেয়েই তারা বৎসরের অধিকাংশ মাস কাটিয়ে দেয়।

পশুপক্ষীর মধ্যে তারা বেশীর ভাগ

মানোবোদের বৃক্ষবাটিকা

রজকিনী (কাপড় জামা কেচে শুকোতে দিচ্ছে ; কিন্তু, রজকিনীর পোষাক ও তার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্য তাকে এক একটা মোহিনী সৌন্দর্য্য দান করেছে)

আগুশান দৈরিন্ধ্রী (পুরুষের চিত্ত হরণ করবার জন্য সুসজ্জিত হয়ে বসে তাম্বুল চর্ব্বণ করছে)

বন্য হরিণ, শূকর এবং শশক প্রভৃতি ও পায়রা, বক, সারস ইত্যাদি মেরে খায়। জাল পেতে বা ফাঁদ দিয়েও তারা মাঝে মাঝে জীবন্ত অবস্থায় শিকার ধরে। মেয়েরাও অনেক সময় পুরুষদের সঙ্গে শিকারে যোগ দেয়।

ফিলিপাইনের এই নিগ্রো অধিবাসীদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানা যায় না। পুত্র কন্যার জন্ম উপলক্ষে তাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উৎসব আয়োজন হয় না। শিশুর নাম করণ প্রায় জন্মদিনেই হয়, কখনও কখনও জন্মের অল্পদিন পরেও শিশুর নাম করণ করে। নাম নির্ব্বাচনের ভারটা সাধারণত বয়োবৃদ্ধদের উপরই ন্যস্ত করা হয়। যদিও শিশুর পিতা মাতার এ অধিকার আছে—কিন্তু তারা বড় একটা এ কাজ করে না। ছেলের নামে বা মেয়ের নামে তারা বিশেষ কোনও পার্থক্য রাখে না। একই নাম ছেলেরও হ'তে পারে মেয়েরও হ'তে পারে। কারণ, ছেলে মেয়েদের নাম রাখা হয় প্রায়ই তাদের জন্মস্থানের কোনও

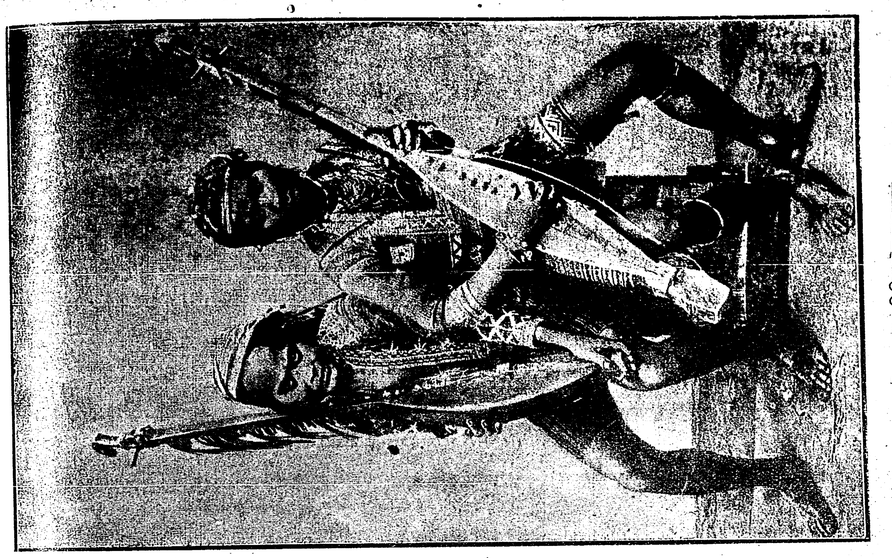

উৎসব বেশে ফিলিপাইন বাসিনী

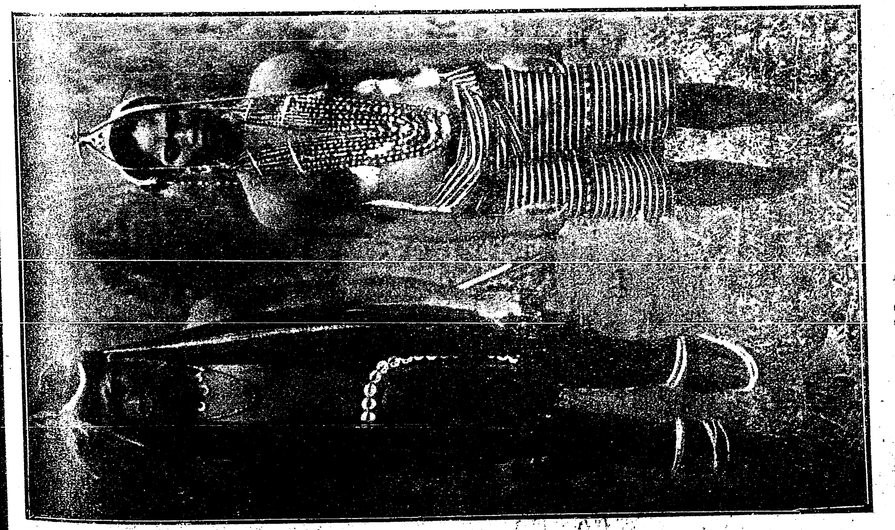

ফিলিপাইনের বর-কন্যা
(এদের বিবাহের সাজ নিতান্ত সাদাসিধে)

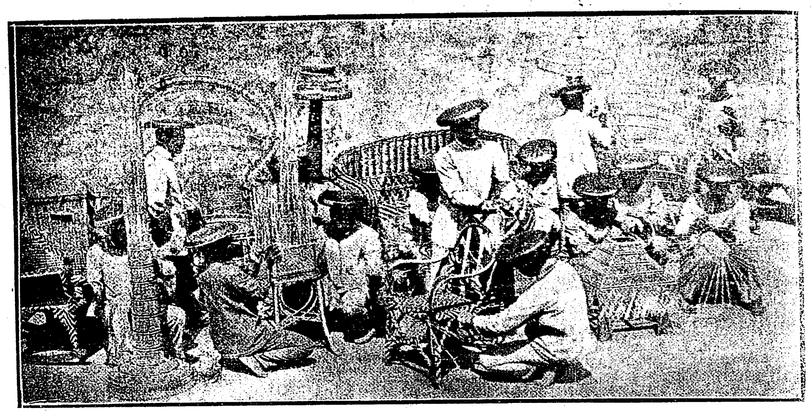

ঝুড়ি চিয়াড়ীর কাজ (বাঁশের ও বেতের শিল্প কার্য্যে এরা অদ্বিতীয়)

কুম্ভবাহিনী (ফিলিপাইনেরা যে জল কুম্ভ-ব্যবহার করে, তার গঠন অনেকটা আমাদের দেশের হাঁড়ির মতো। মেয়েরা জল আনতে যাবার সময় রৌদ্র-তাপ নিবারণের জন্য মাথায় একটি টোকা পরে)

আইগোরোট যোদ্ধা

পাপীর অনুতাপ (প্রতি বৎসর একটি ক'রে দিন নির্দ্দিষ্ট আছে—যেদিন ফিলিপাইনোরা বারো মাসের পাপ স্খালনের জন্য অনুতাপ করে ও নিজেদের স্বেচ্ছায় শাস্তি দেয়। এক ঘণ্টা প্রচণ্ড কশাঘাতে নিজের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত ক'রে, মস্তকে কাঁটার মুকুট পরে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে ও নতজানু হয়ে তারা মাঠের মাঝখানে গিয়ে বসে। তখন তার একজন সহচর এসে পিছন থেকে তাকে সজোরে এক পদাঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। মাটিতে প'ড়ে সে অনেকক্ষণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করে—তারপর প্রায়শ্চিত্ত অন্তে স্নান ক'রে গৃহে ফিরে যায়)

একটা বিশেষ জায়গার নাম ধ'রে, কিম্বা ছেলের কোনও একটা গুণ দেখে।

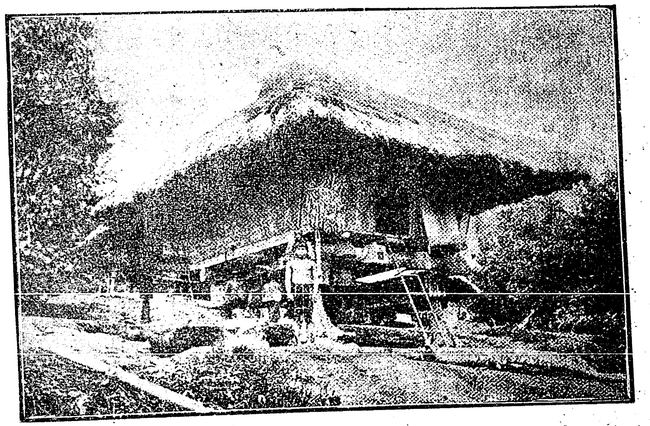

আইগোরোটের কুটীর

ছেলের বিবাহের সম্বন্ধ প্রায়ই পাত্রের পিতার আর্থিক অবস্থা হিসাবে স্থির হয়। কারণ, তাদের কন্যাপণ দিয়ে বিবাহ ক'রতে হয়। শারীরিক সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য যদি মেয়ের ভাল হয়, তাহলে সে মেয়ের বিবাহ খুব চড়াদরেই হয়ে থাকে। মেয়ের বিবাহের কথাবার্ত্তা যদিও মেয়ের পিতা মাতাই স্থির করেন, তবু তার মনমতো পতি নির্ব্বাচন করবার জন্য কন্যাদের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে পরিবর্ত্ত বিবাহও প্রচলিত আছে, এবং একই পরিবারের মধ্যে ভাই বোন উভয়ের বিবাহ হয়।

বিবাহ প্রথাটা তাদের খুবই সাদাসিধে রকমের। বিশেষ কোনও হাঙ্গামা নেই। মন্ত্র তন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। পুরুত পাদ্রীর উৎপাত নেই এবং সাক্ষী সাবুদের সহী করা বিয়ের কবুলাও রেজেষ্টারি করাতে হয় না। কোনও একটি শুভদিনে বর কনে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবদের মাঝখানে বসে একই ভোজন পাত্র থেকে আহার্য্য গ্রহণ করলেই তাদের বিবাহ

হ'য়ে যায়। বিবাহ-যাত্রীরা সকলে অমনি নবদম্পতীর মিলনে আনন্দ-ধ্বনি ক'রে ওঠে। ভোজনের পর বরবধূ উঠে একত্র মিলে প্রকাশ্য ভাবে একটা কোনও সাধারণের হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠান করে, যেমন অতিথিদের সেবা ও পরিচর্য্যা করা বা রোগীর শুশ্রূষা করা এমনি তর কিছু। তার পরই এক বিরাট ভোজের অনুষ্ঠান হয়। ভোজের পর নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ চলে।

বিবাহের পর বর কনে কিছুদিন কন্যাপক্ষের নিকটই বাস করে; পরে একত্র বরপক্ষের নিকট ফিরে আসে। এ নিয়মটা আমাদের সঙ্গে অনেকখানি মেলে, কেবল বর আমাদের কন্যার গৃহে মাত্র দু'একদিনের বেশী থাকে না। বর কনেকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলে বরের বাড়ীতে একটা মহা উৎসবের ধুম লেগে যায়। নব বধূকে আত্মীয়েরা নানা উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা করে। পান-ভোজন ও নৃত্য-গীতের প্রচুর আয়োজন হয়। তবে বরের আর্থিক অবস্থা বুঝে এই সব খরচের তারতম্যও হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বহু-বিবাহ খুব প্রচলিত আছে; কিন্তু বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা বড় একটা দেখা যায় না। তবে, যদি দেখা যায় যে, স্ত্রী পুরুষে কিছুতেই

মান্দায়া যুবতী (এরা আজকাল য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান ক'রছে; কিন্তু পুঁতির মালার রাশি এখনও ছাড়তে পারে নি।)

আইলোঙ্গোট্ মেয়ে (গলায় এক ঝুড়ি পুঁতি ও কাঁচকড়ার মালা। চোখে মুখে মোঙ্গোলিয়ান্ সংমিশ্রণ স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে)

কলিঙ্গা মেয়েদের সাজ-সজ্জা (এদের পোষাক পরিচ্ছদের ধরণে অনেকটা স্পেনের প্রভাব বিদ্যমান্ দেখা যায়।)

বনিবনাও হ'চ্ছে না, তখন তাদের পরস্পরের আত্মীয়-বন্ধুরা তাদের পৃথক্ ক'রে দেওয়াটাই উপযুক্ত ব'লে মনে করেন এই অবস্থায় যার কোনও স্বামী-স্ত্রীকে তফাৎ হ'তে হয়, তবে বিষয় সম্পত্তি যা কিছু উভয়কে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। কেবল ছেলে মেয়ে থাকলে সেগুলো মায়ের ভাগেই পড়ে।

ব্যভিচার সে দেশে সবচেয়ে বড় অপরাধ। এবং তার শাস্তিও একেবারে চরম! এই অপরাধে তাদের প্রাণদণ্ড হয়! তবে যারা অবস্থাপন্ন লোক, তারা প্রচুর অর্থদণ্ড দিয়ে প্রাণদণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করে। এই নিগ্রো-দের মধ্যে যেসব নৈতিক আচার প্রচলিত আছে, সে সব বর্ত্তমান সভ্যতারও খুব উচ্চ অঙ্গের নিয়ম। কপটতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা, চুরি করা ও নেশা করা প্রভৃতি নীচ কার্য্যকে তারা

টুপি-বোনা (মা ও মেয়ে পাশাপাশি বসে গাছের আঁশ দিয়ে বুনে একরকম টুপি তৈরি করছে)

বীরবেশী বাগোলো যুবক

বাগোলো সর্দ্দার

অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোনও ধর্ম্মবাদ প্রচলিত নেই। তারা জলে স্থলে আকাশে বাতাসে নিখিল চরাচরে সর্ব্বত্রই দেবাত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে বলে বিশ্বাস করে। যা কিছু দুর্ঘটনা ব্যাধি বা বিপদ—সে

সমস্তই ওই কোনও দেবাত্মার রোষ-দৃষ্টির ফলে ঘটেছে বলে তারা বিশ্বাস করে। রোগ যতক্ষণ না কঠিন হ'য়ে ওঠে, ততক্ষণ তারা রোঝা কি আত্মারাম ওস্তাদ ডেকে এনে মন্ত্রতন্ত্রের জোরে বা ঝাড়ফুঁক ক'রে তাকে আরোগ্য করবার চেষ্টা করে। অনেক সময় রোগীর মৃত্যু হ'লে তারা সেই রোঝা বা ওস্তাদ চিকিৎসককে ধ'রে টানাটানি করে। তাকেই সে মৃত্যুর জন্য দায়ী করে।

কলিঙ্গা সর্দ্দার ও তাহার পত্নী

পীড়া উপশম হবে বলে তারা মাদুলী, কবচ, ধুকধুকি বা পদক ইত্যাদিও রোগীকে পরায় এবং রুষ্ট দেবাত্মার সন্তোষের জন্য পূজা উপাসনা ও বলিদান প্রভৃতির ব্যবস্থাও করে। এই বর্ব্বর নিগ্রোদের মতো আমরাও ব্যাধির প্রতিকার করবার জন্য কবচ মাদুলি প্রভৃতি ধারণ করি, এবং দেবতাকে প্রসন্ন করবার জন্য তাদের পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থাও ক'রে থাকি, এটা কি আমাদের সেই অসভ্য যুগের আদিম অভ্যাসের জের?

দেবাত্মার প্রভাবের উপর গভীর বিশ্বাসী হলেও তারা মৃত্যুর পর সেই মৃত-আত্মার কল্যাণের জন্য কোনও প্রকার উৎসব অনুষ্ঠান করে না। মৃতদেহ কবর দেবার সময়ও তারা বিশেষ কোনও সমারোহ ব্যাপার করে না। শব-দেহটি একখানি চ্যাটাই বা মাদুরে জড়িয়ে কিম্বা একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত খোলের মধ্যে পুরে মাটিতে পুঁতে ফেলে। কেবল বন্য জন্তুরা যাতে মাটি খুঁড়ে শবদেহটা টেনে বার করে ফেলতে না পারে, তার জন্য একটু ব্যবস্থা ক'রে রাখে।

কলিঙ্গা ছেলে (গলায় স্পেনীয় ধাতুমুদ্রার হার এবং পরিধানে বহু কারুকার্য্য খচিত আঙরাখা)

ফিলিপাইনের এই নিগ্রো দলটি নৃত্যগীতের একান্ত অনুরাগী। অবশ্য এদের বাদ্য-যন্ত্র যা কিছু সবই সেই সৃষ্টির প্রথম যুগের। সেই বাঁশের বাঁশী, কাঁসার কাঁসি, তাঁতের সারঙ, তামার ঘণ্টা, চামড়ার ঢাক, ইত্যাদি। আর একটা তাদের মনের মতো বাজনা হ'চ্ছে 'বাঁশতরঙ্গ'। বাঁশতরঙ্গ নাম দিলুম বটে, কিন্তু জিনিসটা ঠিক বাঁশতরঙ্গ

নয়। একটা প্রকাণ্ড মোটা লম্বা বাঁশ কিম্বা শাল কি গরাণের গুঁড়ি নিয়েও তারা এইবাজনাটা তৈরি ক'রে ফেলে। এই বাঁশ বা গাছের গুঁড়িটাকে চেঁচে ছুলে ফাটিয়ে ফাঁপিয়ে তাতে সুরের ঘাট বেঁধে বা পর্দ্দা লাগিয়ে, দু'পাশে

বেংগুয়েত বালিকা (এরা উত্তর ফিলিপাইনের পার্ব্বত্য সুন্দরী)

দুটো মাচা বেঁধে সেই মাচা সংলগ্ন দড়ীর উপর দৌল্না বা ঝাল্নার মত সেটাকে ঝুলিয়ে দেয়। তার পর একদল মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'হাতে দুটো ক'রে ডাণ্ডা নিয়ে তালে তালে সেটাকে পিটে বাজায়, সঙ্গে সঙ্গে তারা নাচেরও পা দেয় এবং গানেরও সুর ভাঁজে! সময়ে সময়ে রসিক পুরুষ দু'চার জন তাদের ঢাক ঢোল ঘণ্টা বাঁশী নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

নাচই হ'চ্ছে এদের জীবনের প্রধান আমোদ। এই নাচের অবকাশে নিগ্রোজাতির স্ফূর্ত্তিবান প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অসভ্য বর্ব্বর জাতির নাচের মধ্যে উচ্চ ভাব ও কল্পনার বিচিত্র বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ভ্রমর ফুলের মধু লুটে ফিরছে, কৃষক বধূরা শস্যক্ষেত্র হ'তে নবীন ধানের মঞ্জরী সংগ্রহ ক'রছে, যুবক-যুবতীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রেমাভিনয় ক'রছে, বীর যোদ্ধা রণক্ষেত্রে যাবার আগে প্রণয়িনীর নিকট বিদায় নিতে এসেছে—এই রকমের সব কবির স্বপ্ন তাদের নৃত্যকলার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ ক'রে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে!

ইণ্ডোনেশীয়ানরা প্রথম এই দ্বীপপুঞ্জে এসে এই নিগ্রোদের সঙ্গে মেশাতে, যে ক'টি মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দল ক'টি ছাড়া ইফুগায়ো, সুবানুন, কলিঙ্গা, মাঙ্গিয়ান্ ও ইলোঙ্গোট্ এদেরও নাম করা যেতে পারে। ফিলিপাইনের কতকগুলো আদিম অধিবাসীর দল খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে, এবং ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণ করে দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের নেতৃস্থানীয় হ'য়ে উঠেছে। এই খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাগালো, ভীষায়ণ, ইলোকানো, বাইকোল, পাঙ্গাশীনানী, পাম্পাঙ্গান্ ও কাগায়ানী এই কয় দলই প্রধান।

কলিঙ্গা মেয়ে (এরা কাঁচুলী ধরণের জামা পরে এবং নাভির নীচেয় কটীবেশ বাঁধে)

ফিলিপাইনের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের নাম লুজোন। এটি দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য প্রদেশ। বনজঙ্গল একেবারেই নেই। তিঙ্গুইয়ানরা এই অঞ্চলেরই অধিবাসী। জঙ্গল ও শিকার উপযোগী পশু পক্ষীর অভাবে এই তিঙ্গুইয়ানদের প্রাণ ধারণের জন্য বাধ্য হ'য়ে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করতে

হ'য়েছে। কৃষিকার্য্য এদের অবলম্বন হ'লেও এরা এখনও একেবারে আমাদের দেশের নিরীহ চাষায় পরিণত হয়নি। এদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের নেশা ও নরমুণ্ড শিকারের একটা প্রবল ঝোঁক এখনও বিদ্যমান। তবে ক্রমশই এই নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা তাদের মধ্যে কমে আস্‌ছে। একখানা প্রকাণ্ড চাল, একটা টাঙি বা শাণিত যুদ্ধ-কুঠার ও বৃহৎ ছোরা এক একখানি এদের প্রত্যেকের নিত্য সঙ্গী। এদের এই প্রবল যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ও রক্তপিপাসা থাকায় আর কিছু হোক্ বা না হোক এদের মধ্যে একটা ধাতু-শিল্পকে খুব উন্নতির পথে ঠেলে দিয়েছে বল্‌তে হবে। সেটা হচ্ছে লৌহ-শিল্প। এদের কটা গ্রামেরই কামাররা যেসব অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে,

তুবালী ছোক্‌রা

(খেজুর-রস সংগ্রহের মতো এরা নারিকেল গাছ থেকেও রস সংগ্রহ করে। তার নাম হ'চ্ছে "তুবা"। "তুবা" এরা খেজুর রসের মতোই টাট্‌কা খায়। ফেনা উঠে, গাঁজ্‌লা কেটে তাড়ী হ'তে দেয় না। "তুবা" তাই নির্দ্দোষ সুমিষ্ট ও সুস্বাদু পানীয়।

আইগোরোট মহিলা

(এঁর জামার সূচীকার্য্য অনেক বিলাসিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো বটে, কিন্তু সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে সূক্ষ্ম উল্কীর কাজ কই!)

সে রকম উৎকৃষ্ট লোহার জিনিস সমস্ত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আর কোথাও পাওয়া যায় না। লুজোনের কামাররা সেইজন্য বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন ক'রে। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের কর্ম্মকারেরা এখনও যেমন সেই বৈদিক যুগের প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করেই তাদের কামার শালার কাজ চালাচ্ছে, এরাও অবিকল ঠিক তেমনি করেই এদের কামারশালার কাজ করে।

তিনুইয়ান মেয়েরা অত্যন্ত ছোট বহরের সূতির ঘাগ্‌রা ব্যবহার করে। কোমর থেকে মাত্র হাঁটু পর্য্যন্ত তার ঝুল। যখন কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, তখন আর তারা জামা পরে না। অবসর কালে হাতকাটা ফতুয়ার মতো জ্যাকেট পরে। খোঁপা ক'রে চুল বাঁধে, আবার খোঁপায় পুঁতির মালা জড়িয়ে দেয়। অলঙ্কারের মধ্যেও পুঁতির মালার কণ্ঠহার প্রচুর ব্যবহার করে; কিন্তু তাদের প্রধান অলঙ্কার হ'চ্ছে ওপর হাত ও নীচের হাতের গয়না। এগুলোকে তাবিজ তাগা যশম বাজুই বল বা চুড়ি বালা, বাউটি, খাড়ু কিম্বা ব্রেসেলেটই বল এর একটু বেশ

শেষত্ব আছে। ওই কাঁচকড়া আর পুঁতির মালাই ন কৌশলে গেঁথে তারা তাদের ওই 'কঙ্কণ-কিঙ্কিনী-ঞ্চি' বানিয়ে তোলে যে, সে দেখ্‌তে বেশ সুন্দর লাগে। ন্তু এই বর্ব্বর মেয়েগুলোর একেবারেই কোনও কাণ্ডজ্ঞান ই কি না; সৌন্দর্য্য-স্বাদ ও সৌন্দর্য্য-সাধ আছে বটে, ন্তু সৌন্দর্য্য-বোধ নেই মোটেই। সেই জন্যেই এই সুদৃশ্য

ণগুলোকে তারা যত পারে 'রে থাকে। কেউ কউ আবার দু'হাতের লী থেকে একে-ারে কনুই পর্য্যন্ত ই চুড়িতে ঢেকে াখে। সংযমের ভাবে ও শিক্ষার দোষে সৌন্দর্য্যের এত ড় দুর্গতি আর কোথাও দেখ্‌তে াওয়া যায় না।

তিনুইয়ানরা বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এমন কি যে সকল মানুষের ওপর দেবতার ভর হয়, এরা তাদেরও দেবতার প্রাপ্য পূজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে দেয়। বিশেষভাবে তারা এক পাষাণ-বিগ্রহের সেবা করে —এই বিগ্রহের নাম পীনাইঙ্"। ইনি

ফিলিপাইনের বনবালা (কূপ থেকে জল তুল্‌ছে)

অনেকটা আমাদের দেশের শিব ঠাকুরের মতো। পাথরের ড়ি মূর্ত্তি। যে কোনও একটা বড় গাছের তলায় অনেকগুলো একসঙ্গে জড় করা থাকে। প্রত্যেক শিলাখণ্ডের মধ্যভাগ গাছের বল্কল-ডোরে বাঁধা থাকে। পূজার সময় অর্চ্চক এই শিলাখণ্ডের উপর সুগন্ধ তৈল লেপন ক'রে। এই বিগ্রহের সম্মুখে শূকর-বলি দেওয়া হয়, এবং বলি-প্রদত্ত পশুর রুধির তণ্ডুল মিশ্রিত করে দেবতার শিরে বর্ষণ করা হয়। পরে উপাসকেরা সেই বলির পশু রন্ধন করে পরম ভক্তিভরে এবং অবশ্য বিশেষ তৃপ্তির সহিতই ভোজন করে।

এদের মধ্যে বালক-বালিকাদের অতি শৈশব অবস্থাতেই বিবাহ হয়। কিন্তু যৌবন-সমাগমের পূর্ব্বে স্বামী-স্ত্রীকে একত্র বাস করতে দেওয়া হয় না।

মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এদের মধ্যে একটা খুব সমারোহ ব্যাপার। মৃত ব্যক্তিকে তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ্য বেশভূষায় সুসজ্জিত ক'রে গৃহের মধ্যে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে উপবেশন করিয়ে রাখা হয়। শবদেহের আশে পাশে ঊর্দ্ধে ও পদতলে বহু মূল্যবান উপহার দ্রব্য সমূহ সাজিয়ে রাখা হয়। তিন দিন ধরে এই অন্ত্যেষ্টি-উৎসব চলে। মৃতের পত্নীকে এই তিন দিন সেই ঘরের মধ্যেই একখানি সাদা কম্বল চাপা দিয়ে রাখা হয়; এবং শোকার্ত্ত আত্মীয় বন্ধুর দল তিন দিন দিবা-রাত্রি সেই ঘরের চারিদিকে পাহারা দেয়। এ রকম কড়া পাহারা দেবার কারণ এ নয় যে, কম্বলের আবরণ ছিন্ন করে পাছে মৃতের

পত্নী কোনও সময় সে ঘর ছেড়ে পলায়ন করে! ঘরখানি পাহারা দেয় তারা এই ভয়ে যে, পাছে কোনও সুযোগে কোনও অপদেবতা সেই কক্ষে প্রবেশ ক'রে মৃত-দেহের কোনও ক্ষতি করে, বা পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের কোনও অনিষ্ট বা অমঙ্গল ঘটায়! তিন দিনের দিন মৃতের গৃহে সমবেত সমস্ত শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হয়। অন্ততঃ এক এক জনকে দেড়শ' ঘা বেত খেতে হয়। এই অদ্ভুত প্রথার উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃতের পরিবারবর্গের সঙ্গে তারাও অনেকটা সমান ব্যথা অনুভব ক'রতে পারবে বলে।

তার পর সমস্বরে স্ত্রীলোকদের রোদন সুরু হয়। মেয়েদের বেত খেতে হয় না বটে, কিন্তু তারা বেত্রাঘাত পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশী চীৎকার করতে থাকে। এই রকম প্রচণ্ড রোদন-রোলের ভিতর দিয়ে শবদেহটিকে গৃহ-সন্নিকটস্থ পারিবারিক সমাধি-ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে, তার পূর্ব্বপুরুষদের কবরের মধ্যেই সমাহিত করা হয়। আসছে বারে আমরা আইগোরোট্ প্রভৃতি অন্যান্য ফিলিপাইনীদের কথা ব'লে এই প্রবন্ধ শেষ কোরবো।

চির-তরুণ

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

আজকে মনে জাগে—
বয়স যখন তরুণ ছিল তিরিশ বছর আগে,—
অঙ্গ ঢাকি' স্বর্ণবাসে
উঠ্‌ত ঊষা পূর্ব্বাকাশে,
হাস্‌ত তপন দেখ্‌ত স্বপন নবীন অনুরাগে ;
দিবানিশি হাসি-খেলায়
কাট্‌ত বেলা অবহেলায়,
স্বচ্ছ তরল মনের কোণে দাগ্‌টি নাহি লাগে,—
গরল-বিহীন সরল প্রাণে, তিরিশ বছর আগে।

তখন ফাগুন মাসে—
নন্দনেরই গন্ধ আমার ভাস্‌ত চারি পাশে ;
দখিণ বায়ে চৈত্র রাতে
কত নবীন কল্পনাতে
চিত্র কত ফুট্‌ত আমার নবীন চিত্তাকাশে,—
প্রাণের নূতন জাগরণে
কার নূপুরের গুঞ্জরণে
চঞ্চলিয়া উঠ্‌ত হিয়া কোন অজানার আশে
ফাগুন-চৈত্র মাসে।

আষাঢ়-শ্রাবণে
জল-ভরা মেঘ দেখা দিলে গগন-প্রাঙ্গণে ;
ময়ূর যখন কলাপ ধরে'
ঊর্দ্ধমুখে নৃত্য করে—
পুলকভরে চিত্ত আমার নাচ্‌ত তাহার সনে,—
বিরামবিহীন বৃষ্টি-ধারায়
অন্ধকারে সৃষ্টি হারায়,
দিন-রজনী মেঘের ধ্বনি শুনি' শ্রবণে,
পরাণ আমার ভেসে যেত প্রেমের প্লাবনে,
—আষাঢ়-শ্রাবণে।

প্রাণটি ছিল খোলা,
পরকে আপন করে' তখন ছিলাম আত্ম-ভোলা ;
বর্ষা-শরৎ কোন্ ঋতুতেই
বিষণ্ণ নয় মন কিছুতেই,
নবীন প্রাণে প্রেমের টানে সবাই দিত দোলা,
—ছিলাম আপন-ভোলা।
জানেন অন্তর্যামী,—
তিরিশ বছর পরেও এখন তেম্‌নি আছি আমি ;

আজকে কোথায় ঘুচ্‌বে ভ্রান্তি,
বুঝ্‌বো নিজের কড়া-ক্রান্তি,—
কল্পনারই শৈল হ'তে আস্‌ব ধরায় নামি' ;
কর্‌বো হিসাব নিরবধি,
শুকিয়ে যাবে ভাবের নদী,
কাব্য-বনে ফুট্‌বে না ফুল, পাখী যাবে থামি'।
হায় রে কপাল, আজও কি না
প্রাণের মাঝে বাজে বীণা,
চল্‌ছি কোথায় আপন মনে প্রেমের অনুগামী,
—হায় গো, অন্তর্যামি!

মনুর শাস্ত্র মতে
ঘোরা উচিত এখন আমার কাননে-পর্ব্বতে ;
শীর্ণ শরীর ভস্মে কটা,
দুল্‌বে শিরে দীর্ঘ জটা,
মগ্ন রব বেদান্তে বা শ্রীমদ্ভাগবতে।
লাজের কথা বলি কোথায়
আজও কি না কলিকাতায়,
পুষ্ট দেহে তুষ্ট আছি গানে ও গল্পতে,
অত্রি-মনু বিষ্ণু-হারীত,
আমার লাগে সব বিপরীত,
চল্‌বো না ক যাজ্ঞবল্ক্য পরাশরের পথে,
—মন আমার হায়, যেতে না চায় পাহাড়ে পর্ব্বতে।

বল্‌বো কাহার কাছে,
পাকা দাড়ীর নীচে আমার কাঁচা হৃদয় নাচে!
প্রিয় মুখের মিষ্ট হাসি
আগের মতই ভালবাসি,
পাগল এমন পর কি আপন কিছুই নাহি বাছে ;
নয়ন জলে চরণ তলে হৃদয় নিয়ে যাচে,
বল্‌তে প্রাণে বাজে যে শেল,
আজও পড়ি নাটক-নভেল,
মাসিক পত্রের চিত্র দেখে, প্রাণটা যেন বাঁচে,
ধর্ম্ম গ্রন্থ বন্ধ থাকে আল্‌মারীরই কাঁচে
—বল্‌বো কাহার কাছে!

বিধির বিড়ম্বনা,
মোক্ষ লাভের মোটেই আমার নাইক সম্ভাবনা!
যৌবনেতে জাগ্‌ত মনে
পঞ্চাশোর্দ্ধে যাব বনে
প্রৌঢ়ে কিন্তু ঘুচে গেল সে সব দুর্ভাবনা!
পণ্ডিতেরা ক্ষমা করুন,
থাক্‌বো এবার চির-তরুণ,—
আস্‌ছে বারে ছাড়্‌তে গৃহ কর্‌বো বিলম্ব না—
এবার কিন্তু বনে যাবার নাইক সম্ভাবনা!

পুস্তক-পরিচয়

উৎপলা। শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা। প্রবীণ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বাবু বৌদ্ধযুগের সমাজ, ধর্ম্ম, আচার, নীতি লইয়া কাহিনী রচিয়াছেন। বৌদ্ধ যুগটাই আমাদের নিকট একটা বাস্তবের স্বপ্ন। তার অজ্ঞাত প্রভাব রহস্যে আবৃত। তার ইতিহাস কল্পনা-কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। এই ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা আবছায়ার জমীতে ছবির ফলাও হয় বেশ। তবে চিত্রকরের চিত্রাঙ্কনী ধাত, তুলির হাত রীতিমত থাকা চাই। বৌদ্ধ যুগের কথা যে বলিতে যাইবে, তাকে নালন্দার বিদ্যাপীঠে বিদ্যার্থী হইতে হইবে; তক্ষশিলার সংঘে শ্রমণের দলে মিশিয়া বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি ইত্যাদি জপিতে হইবে; দ্যূত-গৃহে সভিকের সহিত পরিচিত হইতে হইবে; তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রাজদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে!—এক কথায় এই গোটা-শতাব্দীকে তুলিয়া লইয়া সেই আদিম সভ্যতার স্বর্ণ-যুগের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হইবে। ভবানীচরণ বাবুর মধ্যে সেই ভোলা ভাব—একালকে সেকালে ভিড়াইবার উপযোগী একটা সহজ স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখিতে পাই। "উৎপলা"য় প্রথম চোখে পড়ে মঞ্জুলার উজ্জ্বলতা। এই চরিত্রে লেখক বেশ একটু অসম সাহসই দেখাইয়াছেন। কেন? তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সেকালে স্বৈরিণী মাত্রেই সমাজের উপেক্ষিতা ছিল না। উচ্চ স্তরের সেই সব রূপসী কলাবতীগণের গৃহে অভিজাত ও গুণী সম্প্রদায়ের সমাগম হইত।—তাঁদের উপর আধিপত্য

চলিত। সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাগণ ইহাদের দেখিয়া ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইতেন না; পরস্পর একাসনে উপবেশন ও পান-ভোজনে আপ্যায়িত হইতেন। তাহারা রাজপ্রসাদভাগিনী হইয়া প্রাসাদে অবাধ প্রবেশে ও এমন কি, রাজ্ঞীর সখীত্বে পর্য্যন্ত অধিকারিণী হইত। "উৎপলা"-কার এত বড় একটা রোমাঞ্চের উপাদান পাইয়াও মঞ্জুলাকে সোজাসুজি পতিতার পংক্তিভুক্ত করিয়া পাঠকের সমবেদনার দ্বারে মুক্তির জন্য ভিক্ষার্থী হন নাই। অথচ তাকে নৈতিকতার পাষাণ-পুত্তলী করিয়া রুক্ষ উপদেষ্টার আসনেও বসান নাই। সে পতিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন নয়। তার চাল-চলন, তার সঙ্কোচ অথচ স্বাতন্ত্র্য যেন কি এক রকম! কিন্তু যতই সে চরিত্রের গভীর হইতে সুগভীরে প্রবেশ করা যায়, ততই যেন সহজ-বোধ্যা মোহিনী অনধিগম্যা মহিমাময়ী হইয়া উঠে। সে যে অপাপবিদ্ধা, তা যেন ধরিয়াও ধরা যায় না। শুধু স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, অপ্রত্যাশিত পবিত্রতার জন্য মঞ্জুলার নৈতিক অভিমানই নাই। ভাল যেন তার জন্মগত অধিকার। একাধারে অসামান্য ধন-মান, রূপ-গুণ ও ললিতকলার অধিকারিণী দশের এই মনস্বিনী আমোদিনী পরের মঙ্গলার্থে পরিশেষে গৈরিক-চির-ধারিণী সর্ব্বত্যাগিনী! এ পরিবর্ত্তন আকস্মিক না হউক, অপূর্ব্ব না হউক, বড় সুন্দর। রচয়িতার শিল্প-সিদ্ধি ঘটাইবার জন্যই যেন সহস্র সহস্র নয়ন-মনের বিলাসিনী অকস্মাৎ মাতৃত্বে পরিণত!

উৎপলা-চরিত্রে বিশেষত্বের পরাকাষ্ঠা—যেখানে সে প্রাণ-প্রিয় দয়িতকে বিপদের মুখে পাঠাইয়া বিহ্বলার ন্যায় তখনও পরের মঙ্গল চিন্তাতেই বিভোর। সে সাদা প্রাণে কাঁদা নাই। শরতের আকাশবৎ স্ফটিক-হৃদয়ে সন্দেহের কাল মেঘ জমিতেই পায় না। গ্রন্থকার প্রমিতসেনের রক্ষা-কবচটীর ঠিক সন্ধানই পাইয়াছেন! তবু যে পতির কল্পিত সুখের জন্য সপত্নী-কণ্টককে পুষ্প-জ্ঞান করিতে পত্নীকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, তা শুধু নকলের নকল একটা মামুলী আত্মত্যাগ দেখাইবার জন্য। উহা যে আত্মহত্যা বা আত্মার হত্যা! উৎপলার ন্যায় সুস্থ ও বলিষ্ঠ চিত্তই নারীত্বের আদর্শ। অতি-মানবী কর্ত্তৃক তা অপহৃত হইবার উদ্যোগ হইয়াছিল! পুরুষের সহধর্ম্মিণী তার উত্থানের সাহায্যকারিণী—পতনের প্রশ্রয়-দাত্রী নয়। তা শুধু অন্যায়ই নয়, অস্বাভাবিক। জীবনের প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গিনী সেই—যে স্নেহে অবলা, কিন্তু কর্ত্তব্যে পাষাণী।

প্রমিতসেনের আত্মসংযম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু তার মূলে উৎপলার উদারতা আর মঞ্জুলার ত্যাগ। প্রমিতসেনের ওঢ়নির অমিত প্রভাব মঞ্জুলার মনকে যতই আন্দোলিত করুক, তার দৈহিক চাঞ্চল্য ঘটাইতে পারে নাই। মঞ্জুলার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী প্রমিতসেনের স্ফুরিত অধর পর্য্যন্ত না উঠিলেই ছিল ভাল।

অসঙ্গসেন, সংযুক্তা ও তাদের শিশু-পুত্র আমাদিগকে শ্রীশচন্দ্র, কমলমণি ও সতু বাবুকে থামথা স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বীকার করি—মহাকবি সেক্সপিয়র হইতে ছোট, বড়, মেজো, সেজো, সকলেই চুরি বিদ্যায় অল্পবিস্তর অভ্যস্ত। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরির বাহাদুরী—যদি সিঁদের দাগটী পর্য্যন্ত বেমালুম হয়। সরস্বতীর এজলাসে শুধু সেই চুরীরই সাজা নাই।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোক, মহারাজ্ঞী কারুবাকী, তথাগতের উপযুক্ত শিষ্য ভিক্ষুদেব উপগুপ্ত, কলিঙ্গরাজ প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং কলিঙ্গ-বিজয়, উপগুপ্তের উপদেশে অশোকের লুপ্তচৈতনের উদয়, ভিক্ষুর নিকট দীক্ষা ভিক্ষা, মহাপ্রচারের উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ের মানস ইত্যাদি বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। উহাতে অজ্ঞাতে সেই কোন্ বিস্মৃত স্বর্ণ যুগের সভ্যতার পুণ্যালোক, ধর্ম্মবিপ্লব, সাম্রাজ্যগঠন, জাতির জাগরণ—পাঠকের মানসে এক মহা-উপন্যাসের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে। কিন্তু ভবানীচরণ বাবু তো সে দিক্ দিয়া যান নাই। সুতরাং সে ভাবে বিচার করিতে গেলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হইবে। তথাপি তিনি একাল সেকাল সর্ব্বকালের মানব-মনের সেই চিরজিৎ ভাব—যার হৃদয়-সাম্রাজ্য-জয় যুগে যুগে কত বিপ্লবে, কত বিগ্রহে নর-নারীকে মাতাইয়াছে, তাহাই লইয়া ভবানীচরণ বাবু এই উপন্যাস রচিত। কিন্তু অশোকের শোভাযাত্রার মত বক্ষে শুধু নিরবচ্ছিন্ন মনস্তত্ত্ব আলোচনায় বৈচিত্র্য ও বিরামের কাজই করে না,—সেই চতুরঙ্গ বাহিনী, সেই ঝঞ্ঝার মর্দ্দল রব কেন এক উজ্জ্বল অতীতের বিজয়কাহিনী সগৌরবে বহন করিয়া আনে; সেই ভল্লধারিণী প্রহরিণীগণের বেষ্টনী লঙ্ঘন করিয়া গজেন্দ্র পৃষ্ঠে আসীন ভারতের সার্ব্বভৌম রাজেন্দ্রকে যেন বড়ই কাছে লইয়া আসে; এই গ্রন্থের গীতগুলিতেও সে কালের কণ্ঠই চিত্রিত, অথচ উহা একালের মাধুরীবঞ্চিত নয়।

"উৎপলা"য় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই সব। অথচ লেখকের লিপি-চাতুর্য্যে তাতে চেষ্টার চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই। আছে ভাবে জোয়ার, ভাষায় তরঙ্গ, রসে আবেশ, ইঙ্গিতে সঙ্গীত, ভঙ্গীতে স্বাবলম্বন। নাই কলা-কৌশলের নামে রুচির শুচিতা, কারুর চারুতা, শ্লীলতার শালীনতা-সীমা অতিক্রমের নষ্ট ও কষ্ট-চেষ্টা।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

কেল্লাফতে। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা। শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক দিন পরে ছেলে-মেয়েদের আনন্দ দানের জন্য এই নূতন গল্প-পুস্তকখানি তাহাদিগকে উপহার দিলেন। একালের ছেলে মেয়েরা সেকালের ছেলে মেয়েদের অপেক্ষা এক বিষয়ে সৌভাগ্যবান; তাহারা ব্রজেন্দ্র-নাথের ন্যায় সুলেখকের লিখিত ঐতিহাসিক গল্প-পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পায়। শিশু সাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য; কারণ, ইতিহাসের গল্পগুলি তিনি ইতিহাস ঘাঁটিয়া মালমসলা সংগ্রহ করিয়া যেভাবে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অন্য কোন সাহিত্য-সেবকের নিকট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ, এ ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহে ছেলেরা

ইতিহাস পড়ে না, ইতিহাসের কোন কথা জানে না, শেখে না। এ অবস্থায় এই সকল ঐতিহাসিক গল্প ছেলে-মেয়েদের পক্ষে ঔষধ ও পথ্যের কাজ করিতেছে। সমালোচ্য পুস্তকখানিতে ভারত-ইতি-হাসের ছয়টি সুন্দর গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সকল গল্পই সুখপাঠ্য, কৌতূহলোদ্দীপক, চিত্তাকর্ষক, অথচ সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত। রসেভরা এই গল্পগুলি পাকা আঙ্গুরের মত সুরস ও মিষ্ট। ছেলে-মেয়েদের ইহা বড়ই মুখরোচক হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রত্যেক গল্পেই সুন্দর ছবি থাকায় গল্পগুলির চিত্তাকর্ষিণী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রচ্ছদপটখানি মনোহর, এবং ছাপা কাগজ ঝরঝরে ও ঝক্‌ঝকে। ব্রজেন্দ্রনাথের এই গল্প পুস্তকখানি ছেলেদের গল্প সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

অরুণাপাতা।—শ্রীসুরুচিবালা রায় প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। উচ্চ শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম পরিবারের একটী অশিক্ষিতা মেয়ের বিবাহ ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা লইয়া এই উপন্যাসখানি রচিত; তাহা হইলেও লেখিকা মহোদয়া ঘটনাসূত্রে যে হিন্দুপরিবারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। এই উপন্যাসের নায়িকা যুথিকার চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটাইবার জন্য লেখিকা মহাশয়া যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে; যুথিকার ভ্রাতা যতীন বেশ খোলা প্রাণ যুবক; লেখিকা এই যুবকটীকে অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। সমস্ত উপন্যাসখানি পড়িয়া বিশেষ ভাবে মনে পড়ে যুথিকা আর যতীন এই দুই ভাই বোনের কথা। বিলাতফেরত প্রমোদ,—যেমন সচরাচর হইয়া থাকে—তেমনই হইয়াছে; কিন্তু যুথিকার স্বামী নরেন্দ্র বেচারী ঐ এক রকমের মানুষ; এ দিকে উচ্চশিক্ষিত অথচ একটুও চরিত্র-বল নাই; যুথিকাকে লাভ করিবার জন্য হিন্দুর ছেলে নরেন্দ্র অনায়াসে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিল; আবার তাহার পরই বাড়ী গিয়া পিতামাতার অনুরোধে হিন্দু মতে আর একটা বিবাহ করিল। তার পর বড়মানুষের ছেলের যা হয়, বিষয় বৈভব উড়াইতে লাগিল, মদ্যপ হইল। শেষে আবার অনুতপ্ত হইয়া যুথিকার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তাহার কাছে আসিবার জন্য উৎসুক হইল। যুথিকা প্রথমে দৃঢ়তার সহিত স্বামীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না; তাই গ্রন্থের শেষে লেখিকা মহোদয়া যুথিকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"নারীর অহঙ্কার শোভা পায় না; তাহা যদি এবারে দূর করিতেই হইবে, তবে তাহা দাদা ও বধূর দয়ার আশ্রয়ে কেন? মাথা যদি হেঁট করিতেই হইবে, তোমারই পায়ে হোক্, তোমারই চরণের তলে, তোমারই প্রেমের আশ্রয়ে এবার তবে আমার সকল তেজ, সকল গর্ব্ব লুপ্ত হইয়া যাক্। এই খানেই উপন্যাস শেষ হইয়াছে—লেখিকা মহোদয়ারও গল্প লেখা সার্থক হইয়াছে। এমন সুন্দর উপন্যাসের বহুল প্রচার আমরা প্রার্থনা করি।

সাথী।—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। শ্রীমান বিজয়রত্ন অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন; এই 'সাথী' উপন্যাসখানি তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই উপন্যাসখানির আখ্যান ভাগ অতি সুন্দর। নিকুঞ্জ বাবু বড়মানুষ। মধ্য বয়সে পত্নী ও একমাত্র পুত্র বিয়োগে কাতর হইয়া তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন; চিকিৎসকেরা তাঁহাকে জলপথে ভ্রমণের পরামর্শ দেন এবং বিশেষ ভাবে বলিয়া দেন যে, তিনি যেন কোন প্রকার উত্তেজনার প্রশ্রয় না দেন। এ নিষেধ লঙ্ঘন করিলেই তাঁহার জীবন সংশয় হইবে। এই কারণে তিনি দ্বিতীয়-বার বিবাহ না করিয়া জলপথে ভ্রমণে বাহির হন। পথের মধ্যে এক গ্রামে স্বজাতীয়া এক দরিদ্রা কুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া কলিকাতার বাড়ীতে লইয়া আসেন; কিন্তু নিজের শরীরের অবস্থা ভাবিয়া স্ত্রী সুশীলাকে পৃথক ভাবে রাখেন। তাহাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার সহিত বাস করেন না। সুশীলা মনের দুঃখে ধনী স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসে; সে যে মুহূর্ত্তে বাড়ী পৌঁছিল, তখনই সংবাদ পাইল, তাহার স্বামী অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সুশীলা যে সংজ্ঞাশূন্য হইল, সে সংজ্ঞা আর ফিরিল না—সেও তাহার স্বামীর সাথী হইল। ইহাই এই উপন্যাসের আখ্যান ভাগ। শ্রীমান বিজয়রত্ন এই গল্পটীকেই নিপুণতার সহিত সাজাইয়া এই সুন্দর উপন্যাসখানি গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমরা পড়িয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি, পাঠকপাঠিকাগণও বইখানি পড়িলে আনন্দিত হইবেন।

বিয়ে।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। এই উপন্যাসখানির লেখক শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ এই প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। প্রথম উদ্যমে তিনি যে এমন একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ ভাল, চরিত্র বিশ্লেষণেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আমরা শ্রীমান নরেন্দ্রনাথের উন্নতি কামনা করি।

রামেন্দ্র-সুন্দর।—শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী প্রণীত; মূল্য তিন টাকা মাত্র। শ্রীযুক্ত বাজপেয়ী মহাশয় যখন এই সুন্দর জীবন-চরিতখানির লেখা শেষ করেন, তখনই ইহার পাণ্ডুলিপি দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। আমরাই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া এই জীবন চরিতখানির যাহাতে সত্বর প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য অনুরোধ করি; রামেন্দ্রসুন্দরের পরম সুহৃৎ লালগোলার মহারাজা বাহাদুরের সাহায্যে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাজপেয়ী মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনকথা লিখিবার উপযুক্ত ব্যক্তি, কারণ রামেন্দ্র তাঁহার মাতুল-পুত্র; তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে আজীবন দেখিয়া আসিয়াছেন, রামেন্দ্রের মহনীয় জীবনের কোন কথাই বাজপেয়ী মহাশয়ের অবিদিত নহে; সুতরাং এই জীবনচরিতখানি যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে না। পুস্তকখানি আদ্যো-পান্ত পাঠ করিয়া আমরা রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জানিতে পারিলাম বলিয়া মনে হইল। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দরের নাম জানেন না এমন লোক বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজে নাই। রামেন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে

দেশের তথা বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। সেই সর্ব্বজনপ্রিয়, মহানুভব রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনচরিত যে জনাদর লাভ করিবে, সে-সম্বন্ধে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীসনাতন গোস্বামী।—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, রাজা গণেশ, বীরপূজা, বাঙ্গালীর বল, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত লেখক, প্রখ্যাতনামা উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র অনেক দিন পরে শ্রীল শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক জীবনচরিত লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। শ্রীসনাতন গোস্বামীর জীবন ভক্তির প্রস্রবণ, সে জীবন-কথা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও গলিয়া যায়। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র সফলকাম হইয়াছেন; পরম ভক্তের ন্যায় প্রেমে আকুল হইয়া তিনি এই জীবন-কথা লিখিয়াছেন। সুতরাং ইহা পরম উপাদেয় হইয়াছে।

দিল্লী-অধিকার।—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা। সুকবি নাট্যকার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত; তাঁহার গৌরাঙ্গ বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। তাঁহার নানা বিষয়িণী কবিতা রস-পিপাসু মাত্রেরই উপভোগ্য। অনেক দিন প্রমথ বাবুর বীণা নীরব ছিল; অকস্মাৎ তিনি 'দিল্লী-অধিকার' নাটক হস্তে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। এই নাটকের অংশ বিশেষ আমরা 'প্রাচী' পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম; এখন পুস্তকাকারে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। পাঠান-রাজত্বের অবসান, মোগলের দিল্লী-সিংহাসনে উপবেশন লইয়া এই নাটকখানি লিখিত। বাদশাহ বাবর যদিও ভারতে মোগল অভ্যুদয়ের অগ্রদূত, কিন্তু বাদশাহ আকবরই প্রকৃতপক্ষে মোগল-রাজত্ব ভারতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; প্রমথ বাবুও সেই কথাই এই নাটকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবির লেখনীসম্ভূত নাটক, সুতরাং ইহাতে নাট্যকলা তথা কাব্যকলা সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব।—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি প্রণীত; মূল্য আট আনা। শ্রীযুক্ত লাহা মহাশয় বৌদ্ধদিগের প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন; এখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ। ইহার দুই-একটী প্রস্তাব 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত লাহা মহাশয় ইংরাজী ভাষাতেই বৌদ্ধ প্রেততত্ত্ব আবদ্ধ না রাখিয়া তাহা যে বাঙ্গালানবীশ পাঠকগণের জন্য অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে সকলেই তাহাকে ধন্যবাদ করিবে।

জলখাবার।—কিরণলেখা রায় পরিবেষিত; মূল্য দুই টাকা। যিনি এই 'জলখাবার' সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি আর ইহজগতে নাই; দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী কিরণলেখা 'বরেন্দ্ররন্ধন' ও 'জলখাবার' পরিবেষণ করিয়া শ্রীকুমার বাহাদুর ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে ভুলাইয়া রাখিয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার এই 'জলখাবারে'র পরিচয় দিতে বসিয়া নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইতেছে। তিনি তাঁহার 'বরেন্দ্ররন্ধনে'র পরিশিষ্ট স্বরূপ এই 'জলখাবার' লিখিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা বরেন্দ্রভূমিরই জলখাবার, সহরের জলখাবার নহে। তাহা হইলেও এই 'জলখাবার' পরম উপাদেয়; বাঙ্গালা দেশের মাতা-কন্যা-বধূগণ এই জলখাবারের সদ্ব্যবহার করিলেই লেখিকা মহোদয়ার পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি হইবে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃতি।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" নামক গ্রন্থখানি পড়িলাম। ইহাতে পঞ্চদশী কথায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মবাণী অতি স্বচ্ছ এবং সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর ভাষার বিশেষত্বই এই যে, তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের ভিতরে হৃদয়ের পরিচয় খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা এইরূপ সহৃদয়তা পূর্ণ হওয়াই একান্ত উচিত। বড় বড় কথা অনেকেই লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হৃদয় স্পর্শ করে না এই জন্যই যে, তাহার পশ্চাতে লেখকের হৃদয় থাকে না। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়া যে কথা বলা হয়, তাহা "বোধির" ভূ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না; কারণ, মানুষ মাথা দিয়া চিন্তা করে, আর হৃদয় দিয়া বাঁচে। সাহিত্য হিসাবেও আলোচ্য গ্রন্থখানির বিশেষ মূল্য আছে।

পাখী।—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ বালকবালিকাগণের উপযোগী করিয়া লিখিবার ক্ষমতা সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের অনন্যসাধারণ; এমন বিশদ ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বর্ণনা করিতে আর কাহাকেও দেখি না। তাই যখন তাঁহার প্রণীত এই 'পাখী' হস্তগত হইল, তখন একাসনে বসিয়া বইখানির পড়া শেষ করিলাম। বইখানির লেখা যেমন মনোহর, ছাপাও তেমনই সুন্দর। আমাদের দেশের ছেলেরা এই বইখানি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

হিন্দু ডুবিল।—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা। বঙ্গের স্বাস্থ্য দিন দিনই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। চারিদিকে শুধু মরণের হাহাকার। সত্যসত্যই হিন্দুজাতি ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ ভাবে চলিলে হিন্দু ডুবিবে। প্রবীণ লেখক কামাখ্যা বাবু বহু দিন হইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন; সেই অনুসন্ধানের ফল এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। আমরা এই পুস্তকখানির দিকে হিন্দু মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহারা ইহা পাঠ করিয়া অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা।—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ প্রণীত; মূল্য আট আনা। একে 'ব্যাকরণ' তার উপর 'বিভীষিকা'—সত্যই যথেষ্ট ভয়ের কারণ। কিন্তু এ হেন 'বিভীষিকা'র তৃতীয় সংস্করণ হইল। এই সংস্করণে অধ্যাপক ললিত বাবু অনেক পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন, অঙ্গশ্রীও বর্দ্ধিত করিয়াছেন; সুতরাং এ 'বিভীষিকা' আবার একখানি করিয়া সকলকে কিনিতেই হইবে, নহিলে অনেক নূতন কথা অজানা থাকিয়া যাইবে। সত্য কথা বলিতে কি, এ বইখানি পড়িয়া এই বুড়া বয়সেও আমাদের অনেক ভ্রম সংশোধিত হইতেছে।

ক-কারের অহঙ্কার।—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ কর্ত্তৃক প্রকটিত; মূল্য এক শিকি ও শিকি শিকি। এখানির দ্বিতীয় সংস্করণ, এবারে পরিবর্দ্ধিত। দেখিতেছি, অধ্যাপক মহাশয় ক-কারের অহঙ্কার ক্রমেই বাড়াইয়া দিতেছেন। যাক্, ক-কারের 'ক' অক্ষর নিষিদ্ধ-মাংস, তাহারাও জাতি বাঁচাইয়া এই অহঙ্কারের বরদাস্ত করিতে পারিবেন।

তালপাতার শিপাই।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র বাবুর পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না; তিনি যে শিশু সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত, তাহাও অনেকেই জানেন। এবার তিনি এই 'তালপাতার শিপাই' লইয়া শিশুসাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শিপাই তালপাতার হইতে পারে কিন্তু ওস্তাদ খেলোয়ারের হাতে পড়িয়া এই শিপাই-ই যুদ্ধ জয় করিয়াছে। বইখানি সুলেখক দীনেন্দ্র বাবুরই উপযুক্ত হইয়াছে,—যেমন লেখার ঝাঁধুনি, তেমনি কৌতুকপূর্ণ গল্প; তেমনি ছবি, তেমনি ছাপা। পূজার বাজারে ছেলেরা এই শিপাইয়ের সঙ্গলাভে মহা আনন্দিত হইবে।

প্রবন্ধ-পঞ্চক।—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী প্রণীত; মূল্য এক টাকা। কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবর্ষের পাঠকগণের পরিচিত; তাঁহার সুচিন্তিত দার্শনিক প্রবন্ধাবলী মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহারই পাঁচটী এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি এতই সুন্দর ও সুচিন্তিত যে, কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তকখানিকে কলেজের পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের

(যেখানে বাঙ্গালা পড়ান হয়) দৃষ্টিও এই পুস্তকখানির দিকে আকৃষ্ট হইবে।

প্রমোদ।—শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুর প্রণীত; মূল্য আট আনা। প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় বহুকাল পরে তাঁহার এই 'প্রমোদে'র দ্বিতীয় সংস্করণ করিলেন। আমাদের সাহিত্য হইতে প্রমোদের পাঠ এক রকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এ সময় চৌধুরী মহাশয়ের এই উপদেশপূর্ণ অথচ রসাল গল্পগুলি পড়িয়া সকলেই তৃপ্তি লাভ করিবেন; ইংরাজীতে যেমন 'Tit-bits', এখানিও তাই।

শ্রীরঘুনাথ।—শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস নহে; কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষাও মধুর,—ইহা ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাসের জীবন কথা—ভক্তের নিকট ইহা অমূল্য। শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাসের জীবনকাহিনী পাঠ করিলে হৃদয় পবিত্র হয়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস ধন্য হইয়াছিলেন; সে সময়ের দেশবিখ্যাত ধনী গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া হরিনামে মত্ত হইয়া কত পাপী তাপীকে পরিত্রাণের পথ দেখাইয়াছিলেন। সেই কথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি সুন্দর প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

চিত্র-লেখা।—শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম-এ প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবুর এই চিত্রগুলি ইতঃপূর্ব্বে সাময়িক পত্রাদিতে পাঠ করিয়াছিলাম। এখন সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। চিত্রগুলি অতি সুন্দর, লিখন-ভঙ্গী মনোরম, সমস্তই গ্রাম ও পল্লীচিত্র; সেই জন্য অতি সুখপাঠ্য। এই 'চিত্র-লেখার' আদর হওয়া উচিত।

কালাজ্বর চিকিৎসা।—ডাঃ শ্রীরামচন্দ্র রায় সঙ্কলিত; মূল্য সাড়ে তিন টাকা। পূর্ব্বে আসাম অঞ্চলেই কালাজ্বর হইত বলিয়া শুনিয়াছি; এখন দেশের সর্ব্বত্রই ঐ ভীষণ ব্যাধির প্রকোপ দেখা যাইতেছে। এ অবস্থায় উক্ত রোগের চিকিৎসা-প্রণালী বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রায় মহাশয় বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। এত বড় পুস্তকে কালাজ্বর সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই কাজে লাগিবে।

জন্মাষ্টমী

ভাস্কর—শ্রীমতিমোহন দত্ত গুপ্ত

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১৪। কবিরাজ কে?

(ক) চিকিৎসকগণকে কবিরাজ বলে কেন? কবিরাজ শব্দে আমরা তাহা বুঝি, তাহার সহিত চিকিৎসক বা চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক আছে কি? কোন কোন চিকিৎসকের 'কবি-ভূষণ' উপাধি থাকিতেও দেখা যায়। ইহার কারণ কি এবং কোন সময় হইতে হইতে 'কবিরাজ' শব্দ চিকিৎসক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে?

(খ) প্রাচীন কবিগণের লিখিত পুস্তকাদিতে যে 'মেঘডুম্বর' সাড়ীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা কিরূপ ছিল এবং কোথায় প্রস্তুত হইত?

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী

১৫। নারায়ণের সম্মুখে বলি

শাস্ত্রে আছে যে, নারায়ণের সম্মুখে বলি দিতে নাই। কিন্তু তান্ত্রিক মতে যে সকল পূজা হইয়া থাকে, সে সকল পূজাতেও নারায়ণ ব্যতীত পূজা হয় না। অতএব সেস্থলে নারায়ণের সম্মুখে বলি হয় কিরূপে? এইরূপ পূজার কিরূপ নিয়ম আছে?

শ্রীসরযূ রায়

১৬। শাস্ত্রীয় পাঁতি চাই

(ক) স্বামী বর্ত্তমানে গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু হইলে স্বামী নিজ হস্তে তাহার (স্ত্রীর) উদর চিরিয়া সন্তান বাহির করার পর শব দাহ করা হয়। এরূপ করার কারণ কি? স্বামীর অবর্ত্তমানে গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়?

(খ) প্রাচীন স্মৃতিতে দেখা যায় অনুলোম বিবাহ অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নতর বর্ণের নারীর বিবাহ হইত। ঐ অনুলোম বিবাহ কত বৎসর যাবৎ রহিত হইয়াছে? শেষ অনুলোম বিবাহ কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল?

(গ) ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্ত্তে আনয়ন করেন, তখন গঙ্গার ব্রহ্মলোক হইতে পতনকালে স্বয়ং মহাদেব গঙ্গাকে তাঁহার মস্তকে ধারণ করেন। তৎপর মহাদেবের জটা হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা "বিন্দু সরোবরে" পতিতা হন। তথা হইতে শ্বেতবর্ণ সপ্তধারায় প্রবাহিতা হন। হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী, ধারাত্রয় পূর্ব্ব দিকে, সীতা, সিন্ধু ও সুচক্ষু পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তিনী একটী ধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে আসিতে জহ্নু মুনির যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভার ভাসাইয়া লয়েন। উপরিউক্ত "বিন্দু সরোবরে"র বর্ত্তমান নাম কি ও তাহা কোথায়? পূর্ব্ব ও পশ্চিমগামী ধারাগুলির বর্ত্তমান নাম ও উৎপত্তি, ও পতন স্থান কোথায়? জহ্নু মুনির যজ্ঞস্থল কোথায় ছিল? বর্ত্তমানে তাঁহার নাম কি?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৭। রুটী ফল

আমাদের বাড়ীতে একটী রুটী ফলের গাছ (Bread fruit) আছে। অনেক দিন হইল একটি ফলও ধরেছে। কিন্তু কি প্রকারে আমরা উক্ত ফলের সদ্ব্যবহার করিব, তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত অবগত হ'তে পারি নাই। ফলটি বেশ একটি ফুটবলের ন্যায় হয়েছে। উহা ব্যবহারের প্রণালী কিরূপ?

সৈয়দ আফজল আলি

১৮। গোরোচনা কি?

গোরোচনা কাহাকে বলে ও উহা কোথায় জন্মে? কেহ কেহ বলেন গরুর পিত্তস্থলীতে একটী সুপারীর আকারে যে জিনিস পাওয়া যায় উহাই গোরোচনা। ইহা সত্য কি না? গোরোচনার গুণ কি? উহা কি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়?

১৯। পাট ও রবি

দেখিতে পাওয়া যায় পাট গাছ সূর্য্য উদয় হইবার সময় পূর্ব্বদিকে হেলিয়া থাকে, আর মধ্যাহ্নে যখন সূর্য্য মধ্যস্থলে উপস্থিত হয় তখন গাছও সোজা হয়; আবার সূর্য্য অস্তের সময় গাছ আছে পশ্চিমদিকে হেলিয়া পড়ে। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি না?

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২০। ইলিশ মাছ

(ক) ইলিশ মাছ বিলাতী Salmon প্রভৃতি মৎস্যের ন্যায় টিনের কৌটায় অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায় কি না? যাইলে উহা রাখিবার উপায় কি? (খ) Fish Preservation ও Canning সম্বন্ধে ইংরাজি কি বই আছে? (গ) Preserved ইলিশ মাছ বিদেশে রপ্তানি হইবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? (ঘ) ইলিশ মাছ হইতে কড্‌লিভার অয়েলের মত কোন জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে কি না?

শ্রীহিমাংশুকুমার মিত্র

উত্তর

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব

শুধু শ্রীমদ্ভাগবতে নয়—মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও শ্রীমতী বা শ্রীরাধার উল্লেখ নাই।

শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমার রাত্রে গোপীগণের সহিত বিহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। ভাগবতকার ভগবানের প্রতি গোপীদের অনুরাগাধিক্য দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন যে ভগবানের সহসা অন্তর্ধানের পর গোপীগণ মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি হয় ত কোন প্রধানা গোপীকে লইয়া গোপনে প্রস্থান করিয়াছেন। মূলতঃ ভগবান নিজেই প্রস্থান করিয়াছিলেন, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যান নাই। গোপীদের ইহা ঈর্ষামূলক ভ্রম মাত্র।

ব্রজলীলার প্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধানা নায়িকা শ্রীরাধার অনুল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ গোপীদের অনুমিত ঐ প্রধানা গোপীকেই শ্রীমতী রাধা বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ অনুমানের যে কোন ভিত্তি নাই, তাহা উপরিউক্ত বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট হয় (বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র দ্রষ্টব্য)। তবে এই রাধা কোথা হইতে আসিলেন? ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলীর প্রাণে রাধাতত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাধাকে বাদ দিলে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা যেন সম্পূর্ণ হয় না। তাই মনে হয় রাধাতত্ত্ব বাঙ্গালীরই প্রাণের জিনিস এবং এই তত্ত্বের আংশিক বিকাশ বিষ্ণুপুরাণের বিষ্ণুশক্তি "শ্রী"তে এবং পূর্ণ বিকাশ বোধ হয় বাঙ্গালী বৈষ্ণব কর্তৃক রচিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এবং তাহার সুমধুর প্রতিধ্বনি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে। বিষ্ণুপুরাণকার বা হরিবংশ-রচয়িতা বোধ হয় বাঙ্গালী ছিলেন না বা রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের মূলতত্ত্ব পরকীয়া রস তাঁহাদের মধ্যে তত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, তাই বোধ হয় ভাগবতে বা বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাধার উল্লেখ নাই।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায়

রাজা গণেশ

রাজা গণেশ ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন। ভাতুড়িয়া পরগণা বর্ত্তমান রাজসাহী জেলায়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে শাণ্ডিল্য গোত্রে নন্দনবাসী (নান্তাসী) গ্রামে জগৎগুরু দিবাকর ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম বেদাঙ্গীর বংশে একত্রিংশ পর্য্যায়ে স্বনামখ্যাত তাহের পুরের রাজা কংসনারায়ণ এবং দিবাকরের তৃতীয় পুত্র পণ্ডিতবর কল্লুক ভট্টের বংশে ষড়বিংশে পর্য্যায়ে রাজা গণেশ রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আইন-ই অকবরী, তবকাৎ-ই অকবরী, রিয়াজ, ফেরিস্তা প্রভৃতি পারস্য ভাষায় লিখিত মুসলমান ইতিহাসে কংস (কাংস) রাজার বিবরণ বর্ণিত আছে। রাজা গণেশের নাম সম্বন্ধে একটু গোলযোগ আছে। বেভারিজ বলেন, "পারসী লেখকগণ কচিৎ স্বরবর্ণ যোগ করিয়া থাকেন। একণে গণেশ বা গণেশ পারসী বর্ণবিন্যাসে কনিশ বা কংস হইয়া পড়া সম্ভব; কারণ 'কাফ' একটি ক্ষুদ্র মাত্রার যোগে 'গাফ' হইয়া যায়।

১০৯০ শকে রচিত ঈশান-নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত। অদ্বৈতাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়াল সম্বন্ধে লিখিত আছে।—

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত॥
সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদসাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥
যার কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি।
লাউর প্রদেশে হয় যাহার বসতি॥

সুতরাং রাজা গণেশের নামই কংস রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে—বেশ বুঝা যায়।

ফেরিস্তা, আইন, ও তবকাৎ-ই অকবরীর মতে, সুলতান সামসুদ্দিনের মৃত্যুর পরেই কংস নামে একজন হিন্দু রাজা বাঙ্গালার সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ৭ বর্ষ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। রিয়াজের বিবরণ পাঠে জানা যায়,—রাজা কংস প্রথমে (নাটোরের অন্তর্গত) ভাতুড়িয়া পরগণার একজন প্রধান জমিদার এবং সুলতান সামসুদ্দিনের সভার একজন অমাত্য (আমীর) ছিলেন। সুলতানের মৃত্যু হইবার পরেই, তিনি মুসলমান রাজকোষ ও সমস্ত রাজকর লুট করিয়া বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। নূর-কুতব-উল্-আলম নামে একজন ফকির জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম-ই-সরকিকে বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখেন। জৌনপুরের সুলতান রাজা কংসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সসৈন্যে আগমন করেন।

আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মগরাজ মেঙ্গ সৌমুন ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে পলাইয়া আসেন। তিনি জৌনপুরের সুলতানের সহিত রাজা কংসের যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার সাহায্যে তিনি পুনরায় আরাকান রাজ্য প্রাপ্ত হন। রিয়াজ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ইব্রাহিমের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাজা কংস আরও কিছুকাল মুসলমানদিগের উপর অত্যাচার করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপর তাঁহার পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম ও জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বঙ্গের স্বাধীন রাজা হন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ রিয়াজ-উস্-সালাতিন প্রভৃতি গ্রন্থকারের ও তবকাৎ আকবরী নামক ঐতিহাসিকের মতে রাজা গণেশ সর্ব্বথা মুসলমান প্রজার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সদয় ব্যবহারে অপক্ষপাতে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহার অল্পকালব্যাপী অধিকারে প্রজার সুখশান্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কারণেই মৃত্যুর পর মুসলমানগণও রাজার পবিত্র দেহ সমাহিত করিবার জন্য আগ্রহ

দেখাইয়াছিল। ডাঃ বকম্যান ১৪০৪—১৪১৪ খৃঃ কংসের রাজত্ব কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু

"এণ্ডি ও মুগা"

রেশম যেমন গুটিপোকা হইতে উৎপন্ন হয়, 'আসাম সিল্ক' সেইরূপ 'এণ্ডি' ও 'মুগা' নামক দুই প্রকার কীট হইতে উৎপন্ন হয়। আসাম ও রংপুর জেলায় সাধারণতঃ ইহাদের আবাদ হইয়া থাকে।

প্রথমে 'এণ্ডির' কথা বলি। 'এণ্ডির' পোকা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে; আস্‌মের জঙ্গলে ইহা (এখন) কিয়ৎ পরিমাণে পালিত হয়,—অবশ্য পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে হইত। রংপুরের 'এণ্ডি' সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। আসাম প্রভৃতি প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসীরাই এই কীটের আবাদ করিয়া থাকে। তাহারা তাহাদের পুরাতন পদ্ধতিতে এণ্ডি-কীট প্রতিপালন করে। নূতন কিছু গ্রহণ করিতে তাহারা একেবারে অনিচ্ছুক। তাহাদের তেমন উৎসাহ নাই, বাহির হইতেও বড় কেহ তাহাদিগকে উৎসাহ দেয় না। ফলতঃ অনেক স্থলে এই শিল্প বিলুপ্ত হইয়াছে; সমগ্র রংপুরেও ইহা বিলুপ্ত-প্রায়।

গুটি পোকার ন্যায় "এণ্ডিরও" প্রথমে ডিম হইতে পোকা উৎপন্ন করা হয়। সেই পোকা এরণ্ডি প্রভৃতি পাতা খাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পরে আপনা আপনি এক প্রকার লালা পদার্থ দ্বারা গুটি রচনা করিতে থাকে। পরে সেই গুটির ভিতরের পোকা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই গুটি হইতে 'টেকোর' সাহায্যে সুতা কাটা হয়।

[এই স্থানে একটা কথা বলি। 'টেকোর' দ্বারা সুতা কাটিতে যাইয়া অনেক সময়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; সময়ও অনেক নষ্ট হয়। সেই জন্য চরকা চালাইতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু সাধারণ চরকায় দেখা গিয়াছে, কাজ ঠিক হয় না। ইহার জন্য অন্য প্রকার চরকা আবশ্যক; আজকাল অনেক ব্যক্তি চরকার উন্নতিকল্পে মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন যদি এ বিষয়ে চিন্তা করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়—অনেক পরিশ্রম লাঘব হয়, "এণ্ডি কাপড়েরও দাম কমিয়া যায়।]

যাহা হউক, এই সুতা তাঁতে ফেলিয়া "এণ্ডি" কাপড় ও চাদর প্রস্তুত করা হয়। 'মুগা' প্রস্তুতের প্রণালীও অনেকটা এইরূপ; কেবল, ইহার সুতা টেকোতে কাটিতে হয় না। রেশমের ন্যায়, ইহার গুটি হইতে সরু সুতা বাহির করা হয়। তাহারই দুই চারিটা লইয়া এক সঙ্গে পাক দিয়া তাঁতের সুতা করা হয়। এই কারণে 'মুগার' ব্যবসায় 'এণ্ডির' অপেক্ষা প্রশস্ত। ইহার পাক দিবার এক প্রকার সুন্দর যন্ত্র আছে, তাহাতে সুচারুরূপে কার্য্য হয়।

'এণ্ডি' ও 'মুগার' কাপড় দেখিতে অনেকটা সিল্কের মত হয়; ইহা প্রথম দর্শনে তাদৃশ মনোহর না হইলেও, যত ধৌত করা যায়, ততই মসৃণ, চিক্কণ ও কোমল হয়। ইহাই ইহার বিশেষত্ব। ইহার আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, এই বস্ত্র অত্যন্ত মজবুত হয়; ১২/১৪ বৎসরের পূর্ব্বে ছিঁড়িয়া যাইবার কোনও আশঙ্কা নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার সমস্ত গুণাবলীর তুলনায় মূল্য অতি অল্প; একখানি সাধারণ প্রমাণ চাদর ১০/১৫ টাকায় পাওয়া যায়। অবশ্য অধিক মূল্যেরও আছে।

এখন আমাদের প্রধান অভাব, অর্থ ও স্বাধীন জীবিকা। আমার বোধ হয় 'এণ্ডি' ও 'মুগা' হইতে আমরা এ উভয়ই পাইতে পারি। ইহার ব্যবসায় যে কিরূপ লাভজনক, তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। আমি এস্থানে একটি হিসাব উদ্ধৃত করিলাম।

এই হিসাবটি ১৩২৮ সনের (কার্ত্তিক সংখ্যা) "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়" প্রকাশিত (মিসেস্) আর্, এস্, হোসেনের "এণ্ডি শিল্প" নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিলে এ বিষয়ে আরও বিবরণ জানিতে পারিবেন।

১। তিন কাহন গুটি (একটি ৬×৩ হাত চাদরের জন্য)	—৸৹
২। ঐ সুতা কাটার মজুরী	—॥৹
৩। বয়নের মজুরী	—৩৲
	মোট—৪৷৹

অথবা

১। ১ সের সরু সুতা (হাট হইতে কিনিলে)	—৫৲
২। বয়ন ব্যয়	—৩৲
	মোট—৮৲

কিন্তু সেই চাদরের মূল্য ন্যূনাধিক ১২৲ টাকা। তাহা হইলে কেবল লাভ হয়, শতকরা ৫০৲ হইতে ১৮২৲ টাকা পর্য্যন্ত।

এটা অবশ্য শুধু 'এণ্ডির' কথা। 'মুগার' হিসাব অন্য প্রকার। তাহার ব্যবসায় 'এণ্ডি' অপেক্ষাও প্রশস্ত, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় ব্যবসায় করিতে হইলে 'এণ্ডি' ও 'মুগা' উভয়েরই করিতে হয়; তাহা না হইলে সুবিধা হয় না। একটি ছাড়িলে অপরটি থাকিতে পারে না। আর একটি কথা এই যে, খুচরা ব্যবসায় না করিয়া বিস্তৃত ভাবে করিতে পারিলে যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা। আসামের কোনও অঞ্চলে সুবিধামত অল্পমূল্যে কয়েক বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া যদি একটি কার্য্যালয় খুলিতে পারা যায়, ও তৎসঙ্গে গুটী প্রতিপালন করা হয়, তাহা হইলে এই মৃতপ্রায় শিল্প পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে। খুচরা ব্যবসায়ে যদি শতকরা ১৫০৲ টাকা লাভ হয়, তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে যে কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

---

* বঙ্গদর্শন ১৩০৯ ফাল্গুন সংখ্যা ৫৯৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'রাজা গণেশ' প্রবন্ধ এবং বিশ্বকোষ 'কুলীন' প্রস্তাব হইতে রাজা গণেশের বিবরণ সঙ্কলিত।

কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ের মত ইহাতেও যথেষ্ট শঙ্কার কারণ আছে। প্রকৃত তত্ত্বাবধানের অভাবে অনেক সময়ে গুটি নষ্ট হইয়া যায়। ফলতঃ সমূহ ক্ষতি হয়। এই সকল ও অন্যান্য কারণ বশতঃ ইহাতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকা আবশ্যক, নতুবা সকল শ্রমই বিফল। স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা উচিত,—অন্য কাহারও উপর এ ভার অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

এখন যে সকল 'আসাম সিল্ক' * বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল খাঁটি দেশী নহে, দেশী হইয়াও বিলাতী। কারণ, এইখান হইতে 'এণ্ডি' ও 'মুগার' গুটি বিদেশে চলিয়া যায়, সেখানে সুতায় পরিণত হইয়া, অনেক সময়ে বস্ত্র পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া, আবার এখানে আসে। এই কারণে জিনিস ঠিক খাঁটি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এইরূপ একটি ফ্যাক্টরী খুলিতে পারিলে, দেশের যে কত উপকার হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। গৌহাটী হইতে ১৪ মাইল দূরে এইরূপ একটি কার্য্যালয় আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি ক্ষুদ্র। তাহা হইলেও তাহার কার্য্য বেশ আশাপ্রদ হইতেছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাহার যেন উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

উপসংহারে এই মাত্র বলিবার আছে, যে, যাঁহারা অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যেন একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকেন। কোনও প্রকার ফ্যাক্টরী না খুলিলেও খুচরা ব্যবসায় করিলে লাভ আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রংপুর হইতে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, সেখানে ২ বিঘা জমি ১৫০৲ টাকায় ক্রয় করিয়া দুইজনমাত্র লোকের সাহায্যে পেঁকা পুঁজিতে আরম্ভ করিলে, মাত্র ৪০০৲ টাকা মূলধনে এ ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা। জমি খাজনা করিয়া লইলে আরও অল্প মূলধনে (প্রায় ২৫০৲ টাকায়) এ ব্যবসায় চলিতে পারে। এরূপ অল্প মূলধনে অন্য কোনও ব্যবসায় করা যায় কি না সন্দেহ। যাহা হউক, যদি জানিতে পারি যে, এই প্রবন্ধপাঠে একজনও 'এণ্ডি' ও 'মুগার' ব্যবসায় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা হইলে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আমার যথেষ্ট আশা আছে যে, এই অর্থ-সমস্যার দিনে ও দেশের এই সন্ধিক্ষণে, আমার এই নিবেদন কখনই উপেক্ষিত হইবে না। একজনও কি ইহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না?

শ্রী——

দীর্ঘকেশ

নালিকা, আমলকি ও অল্প ভাজা মেথী একত্র বাটিয়া নারিকেল তৈলের সহিত মিলাইয়া একটি মাটির পাত্রে করিয়া উহা ১৫ দিন মাটির নীচে পুতিয়া রাখিতে হইবে। পরে উহা উঠাইয়া ব্যবহার করিলে চুল দীর্ঘ ও ঘন হইবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী

* 'এণ্ডি' ও 'মুগা' ব্যতীত আর এক প্রকার বস্ত্রকেও মধ্যে মধ্যে এই নামে অভিহিত করা হয়।

মল্লভূমি ও মল্লরাজ

(প্রত্যুত্তর)

পৌষ মাসের "ভারতবর্ষে -মল্লভূমি ও মল্লরাজ" শীর্ষক যে প্রশ্নটী সম্পাদকের বৈঠকে প্রকাশিত হয়, গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সম্পাদকের বৈঠকেই তাহার একটী বিস্তৃত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। উত্তরদাতা মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়া উত্তরটী দিয়াছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সন্দেহের জন্য আমি প্রশ্নটী করিয়াছিলাম, উত্তরটী তাহার কোন সমাধান না করিয়া বরং আরও কতকগুলি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগাইয়া দেয়। বন-বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের কয়েকজন সামন্ত রাজার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ, তাঁহাদের রাজত্বের মেদিনীপুরের কতক অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতির বিবরণ ও ভক্তিরত্নাকরের ("মল্লভূমি মধ্যেতে রায়নী নামে গ্রাম") এই উক্তি পাঠ করিয়া আমার সন্দেহ হয় যে, রায়নী বা রোহিণী গ্রাম বীরহাম্বির বা বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের অধিকৃত কি না? এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যই আমি প্রশ্ন করি। তাহার উত্তরটী প্রদত্ত হইয়াছে এবং সেটী প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১ম) উত্তরদাতা মহাশয় বলেন, "মল্লভূমি মধ্যেতে রায়নী গ্রাম" এই উক্তির "মল্লভূমি" বিষ্ণুপুর মল্ল রাজাদের অধিকৃত মল্লভূমি নয়—উহা ঝাড় গ্রামের "মল্ল" উপাধিক রাজাদের। কেন না রায়নী বা রোহিনী গ্রাম বিষ্ণুপুর অপেক্ষা ঝাড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, দূরত্বই রাজ্য বিস্তৃতির অন্তরায় নয়। কেন না বিষ্ণুপুর রাজ্য এক সময় উত্তরে সাঁওতাল পরগণা ও দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (Oldham's Some Historical and Ethnical aspect of Burdwan District) ছোটনাগপুরও এক সময় বিষ্ণুপুর মল্লরাজগণের অধীনতা স্বীকার করিত। (১৩১০ সালের ফাল্গুনের আর্য্যাবর্ত্ত পত্রিকায় "বিষ্ণুপুর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) মল্লভূম হইতে মালভূম তাহা হইতে মানভূম নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। উত্তরদাতা মহাশয় ঝাড় গ্রামের প্রাচীনত্বের কোন প্রমাণ না দিয়া কেবলমাত্র দুইজন আধুনিক মল্ল রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। ঝাড় গ্রামের মল্ল রাজারা কত প্রাচীন তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজারা যে বহু প্রাচীন এবং প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। "During the reign of the Baidya family the kings of Bishenpur and Burdwan alone had a place in history." (Hunter's Annals of Rural Bengal, Appendix D., P. 428.) বর্দ্ধমান ও বিষ্ণুপুরের প্রাচীনত্ব দেখিয়া এবং ঝাড় গ্রামের মল্ল রাজাদের প্রাচীনত্বের ও পরাক্রমের ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে বিষ্ণুপুরের মল রাজাদের "মল্ল" উপাধি হইতে "মল্লভূমি" নাম হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও যুক্তিসঙ্গত অনুমান বলা যাইতে পারে

উত্তরদাতা মহাশয় লিখিয়াছেন, "রায়নী বা রোহিণীর রাজা অচ্যুতকে—রসিকানন্দের পিতাকে—মল্লভূমির অধিপতি বলিত। সুতরাং এই "মল্লভূমি" বনবিষ্ণুপুর না হইয়া রোহিণী ঝাড়গ্রাম প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে।" কেন? কারণ (উত্তরদাতা মহাশয়ের মতে) অচ্যুত কস্মিন্‌কালে বন বিষ্ণুপুরের অধিপতি থাকেন নাই।

"মল্লভূমি অধিপতি অচ্যুত-নন্দন"—এই উক্তির "মল্লভূমি" দ্বারা বরং অচ্যুতনন্দন রসিকানন্দের রাজ্য রায়নী বা রোহিণীকে বুঝাইতেছে; কিন্তু ঝাড়গ্রামকে কি করিয়া বুঝাইতেছে বুঝা গেল না। অচ্যুত বা তৎপুত্র রসিকানন্দ কস্মিন্ কালে মল্লভূমির অধিপতি থাকেন নাই বলিয়া ঐ "মল্লভূমি অধিপতি" বাক্যে ঝাড় গ্রামকেই বুঝাইবে, বিষ্ণুপুরকে বুঝাইবে না—কেন? বিষ্ণুপুরের রাজারাও মল্ল, বহু প্রাচীন ও পরাক্রান্ত ছিলেন। সুতরাং এই "মল্লভূমি"র দ্বারা বিষ্ণুপুরকেও বুঝাইতে পারে। (২য়) বীরহাম্বির ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে মুঘল বশ্যতা স্বীকার করেন; তার পূর্ব্বে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ছিলেন। রায়নী বস্তুতঃ তাঁহার অধিকৃত ছিল; তাহা হইলে টোডর মল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় ইহা "দওয়ার শরভূম" মহালের অন্তর্গত হইল কেন? সুতরাং রায়নী বা রোহিণী বিষ্ণুপুর রাজাদের রাজ্যান্তর্গত থাকে নাই—উত্তরের ইহাই ২য় অংশ।

রায়নী যে বিষ্ণুপুর রাজাদের নিশ্চয়ই অধিকৃত ছিল, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু উত্তরদাতা মহাশয় বীরহাম্বিরের মুঘল বশ্যতার যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ বাড়িয়া যায়। কারণ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুঘল পাঠানের যুদ্ধের সময় মহারাজ মানসিংহকে যে বীরহাম্বির সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (Bankura, District Gazetteer. p. 25.) টোডর মল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় বিষ্ণুপুর রাজাদের কর নির্দ্ধারিত হয়। "In the rent-roll of Todar malla, in 1582. the country, held by the family (Bishenpur Raj family) was assessed at a fixed tribute." (Imperial Gazetteer of India, Vol. VIII, p. 385) সুতরাং ১৬০৮ খৃঃ অব্দে যে বীরহাম্বির প্রথম মুঘল বশ্যতা স্বীকার করেন তাহা মনে হয় না। বিষ্ণুপুরের রাজারা কখনও বা করদ রূপে কখনও বা মিত্ররূপে মুসলমান রাজাদের সাহায্য করিতেন। (Imperial Gazetteer of India, Vol. VIII, p. 385.) বীরহাম্বির প্রথমে মুঘলকে সাহায্য করিয়া পরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করার চেষ্টা করায় বোধ হয়, পুনরায় ১৬০৮ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। এবং ১৫৮২ খৃঃ অব্দে বা তার পূর্ব্বেই তিনি মুঘল সংস্রবে আসিয়া অনেকখানি স্বাধীনতা হারাইয়া ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় রায়নী (যদি তাহা বীরহাম্বিরের সময়ও মল্লভূমির অন্তর্গত ও তাঁহার অধিকৃত ছিল) রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় "দওয়ার শরভূম" মহলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। (৩য়) হিজলীর রাজা বলভদ্র মহাপাত্রের নিকট মুঘলদের প্রাপ্য, অনাদায়ী লক্ষ টাকা রাজস্বের জন্য রায়নী অধিপতি অচ্যুত (বলভদ্রের বৈবাহিক) মুঘল কর্ম্মচারীর নিকট দায়ী থাকায় বলভদ্র মুক্তি পান। মুঘল কর্ম্মচারীর নিকট অচ্যুতের এই প্রতিপত্তির ভাব হইতে উত্তরদাতা মহাশয় অচ্যুতকে বীরহাম্বিরের করদ রাজা মনে না করিয়া মুঘলদের করদ রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অচ্যুত মুঘলদেরই করদ রাজা হউন বা বীরহাম্বিরেরই হউন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; যাহা সত্য তাহাই প্রকাশিত হউক। প্রতিপত্তির এই বিবরণটী উত্তরদাতা মহাশয় কোন প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থের সাহায্যে দৃঢ় না করিয়া কেবলমাত্র বৈষ্ণব গ্রন্থেরই মতটীকে স্থির বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বৈষ্ণবেরা ভক্তি গ্রন্থই লিখিতেন; যাহাতে ভক্তি বৃদ্ধি হয়—বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি হয়, সেই ঘটনাই—নিক্তির ওজনে ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারিত না করিয়া—স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ ইচ্ছা করিয়া এইরূপ করিতেন না—তাঁহারা সরল বিশ্বাসী; ভক্তিবর্দ্ধক বা বৈষ্ণব মাহাত্ম্যবর্দ্ধক যে কোন কাহিনী সমালোচকের চক্ষে দর্শন না করিয়া সরল বিশ্বাসীর চক্ষেই দেখিতেন। সুতরাং তাহাদের বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্য সমসাময়িক অন্যান্য বিবরণ হইতে সমর্থিত না হইলে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আর উক্ত ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও—অচ্যুত যে কখনও বীরহাম্বিরের অধীন থাকেন নাই বা থাকিতে পারেন নাই—মুঘলদেরই অধীনা ছিলেন—অচ্যুতের মুঘল কর্ম্মচারীর নিকট বিশেষ প্রতিপত্তির ভাব হইতে নিশ্চিতরূপে তাহা বুঝায়না। কেন না দুইজন স্বাধীন রাজার কর্ম্মচারীদের মধ্যে সদ্ভাব বা প্রতিপত্তি থাকিলেই কি তাহাদের মধ্যে প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে? রাঠোর রাজপুত দুর্গাদাস ও মুঘল সেনাপতি দিলির খাঁর সদ্ভাবের কথা ত বেশ শুনা যায়; কিন্তু মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে তখন বেশ বিবাদ চলিতেছিল। হয়ত তৎকালীন মেদিনীপুরের মুঘল কর্ম্মচারী ও অচ্যুত উভয়ের সততা ও সাধুতার জন্য পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া অচ্যুতের উক্ত মুঘল কর্ম্মচারীর নিকট প্রতিপত্তি। শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায়

দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের কারণ

কেরোসিনের ছোটা বাতি সাম্‌নে রাখিয়া লেখাপড়া বা কাজ করায়।

অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়ায়।

স্নানের সময় চোখে, নাকে, কাণে ও নাভিতে তৈল না দেওয়ায়।

সকাল বিকেলে মুখ ধোয়ার সময় একগাল জল পুরিয়া চোখে জলের ঝাপ্‌টা না দেওয়ায়।

প্রস্রাবের বাষ্প চোখে লাগায়।

অঞ্জনের অভাবে।

বংশগত চোখের দোষে।

সহরে সবুজ রংএর অভাবে।

সূক্ষ্ম জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করায়। শ্রীমনোমোহন শীল

বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা

(ক) Joint Secretaries to the High Commissioner to India (Indian Student Dept.) 42 Grosenor Gardens London S. W.)

(খ) তিন বৎসর degree অথবা Diploma নিতে লাগে। যদি সবগুলি পরীক্ষা নিয়মমত পাশ করা যায়)। অনেক Universitytে I. Sc. পাশ করিয়া আসিলেই ভর্ত্তি হওয়া যায়। প্রত্যেক Universityরই নিয়ম বিভিন্ন। সাধারণতঃ ৪০ হইতে ৬০ পাউণ্ড বাৎসরিক Tution fees.

(চ) Londonএ মাসিক প্রায় ২০ পাউণ্ডের কমে থাকা সম্ভবপর নহে। Provincial Townএ অপেক্ষাকৃত কম খরচ। আমেরিকা এবং জার্ম্মাণীতে Engineering ইত্যাদি পড়া যায়।

(গ) United Kingdomএর Gradnate হইলে chartered accountship পড়িতে তিন বৎসর সময় লাগে। Indian Universityর gradnate হইলে ভর্ত্তি হওয়া যায়। তাহা হইলে পাঁচ বৎসর সময় লাগে। প্রিমিয়াম দিয়া ফার্ম্মে ভর্ত্তি হইতে হয়। ফার্ম্ম বুঝিয়া Premiumও কমবেশী হয়। Indian Universityর graduate হইলে Belfast Universityর LL. B. পরীক্ষা এক বৎসরে দেওয়া যায় এবং এই পরীক্ষা পাশ করিতে পারিলে দুই বৎসরের Exemption পাওয়া যায়।

শিশিরেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

বাদলে

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী বি-এ

বাদল ধারার গানেরে।
নিশীথে আজ হৃদয়-বীণা কাঁদছে বেহাগ-তানেরে॥
আকাশে কার নয়ন ঝুরে, কার বেদনা হাওয়ার সুরে,
দূরকে নিকট টানেরে।
বৃষ্টিপাতের গানেরে॥
একলা শুয়ে ঘরের মাঝে
বাতায়নের ফাঁকেরে।
পলক্-হারা দিঠি আমার
কিসের ছবি আঁকেরে।
কি কলরব ঝরছে বনে, কি কথা সব পড়ছে মনে,
মনই কেবল জানেরে।
টুপটুপানির গানেরে॥
দিবসে কে বিদায় হল
রক্ত-কিরণ রথেরে।
ঝিলিক লাগে আঁধারে তার
আসা-যাওয়ার পথেরে।
কি স্মৃতি আজ বুকের পরে, অশ্রু-বিধুর, নিবিড় করে,
ব্যথার-শায়ক হানেরে।
বাদল ধারার গানেরে॥

কেষ্ট পাওয়ার ফল

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ

সেই ছেলেবেলায় কদমতলায় আমরা যে কেষ্ট ঠাকুরের খেলা খেলেছিলুম, কে জানত, এ ছেলে-খেলার সঙ্গে একদিন জীবন-মরণের খেলারও যোগ হবে।

সে বার বাঙ্গালায় স্বদেশীর বন্যা এসেছে, আমাদের পাড়াতেও সে বন্যার ঢেউ এসেছিল। স্বদেশীর সঙ্গে সঙ্গে তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানেরও একটা সাড়া দেশময় পড়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ কারো চেয়ে কম নয়, এও আশা আছে, এই সম্বন্ধ নিয়ে সেদিন ঘরের ছেলে সব পথে বেরিয়ে পড়েছিল। আমরা তখন সব ক্ষুদে ক্ষুদে স্বদেশী ছোক্‌রা, মাথায় পাগড়ী বেঁধে গলায় 'বন্দে মাতরম্' ব্যাজ্ ঝুলিয়ে বয়স্ক ভলাণ্টিয়ারদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াতুম।

আমাদের গ্রামে যিনি স্বদেশীর নেতা ছিলেন, তিনি প্রায়ই ভলাণ্টিয়ারদের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা, গীতার কর্ম্ম যোগের কথা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। আমরা সে সব মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝ্‌তুম না—প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়্‌তুম। তবে মাঝে মাঝে "নবদূর্ব্বাদলশ্যাম" শ্রীকৃষ্ণের কথা এসে কাণে পৌঁছত। কিন্তু সেই আধ্-জাগা, আধ্-ঘুমন্ত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমাদের মনের উপরেও শ্রীকৃষ্ণের চেহারার একটা ছাপ পড়ে গিয়েছিল।

বেশ মনে আছে, প্রায়ই কল্পনার চোখে শ্রীকৃষ্ণকে চোখে দেখ্‌তুম, আর কেন জানি না, চোখ ভরে জল আসত। পাড়ার আমাদের প্রায় সব ছোট ছোট ছেলেদেরই মনের অবস্থা এই রকম ছিল,—কেবল রায়েদের বাড়ীর রাধানাথ একটু আলাদা রকমের ছিল।

রাধানাথ নিজের লেখাপড়া নিয়েই থাকত, ক্লাসেও সে সব চেয়ে ভাল ছেলে ছিল। মাষ্টাররা তা'কে খুব ভালবাস্‌তেন; কিন্তু আমরা তা'কে দু'চোখে দেখতে পারতাম না। তার প্রধান কারণ—সে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের কথাটা তেমন আমল দিত না। পাড়ায়, যাত্রায় যখন কংশ-বধ পালা হ'ত, তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতুম, আর রাধানাথ বলত "তোরা কংশকে দেখিস্‌নে? আমার কিন্তু কংশকেই ভাল লাগে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন দেবতা, তাঁর সঙ্গে কংশ দেবতা না হ'য়ে যে লড়াই কর্‌চে, এতে আমি কংশকেই বাহাদুরি দিই। কংশ নিশ্চয়ই হার্‌বে জেনেই আমার কংশকে আরো ভাল লাগে।"

এই সব ম্লেচ্ছর মত কথা শুনে আমাদের গা জ্বলে যেত। আমরা কয়েকজনে মিলে রাধানাথকে জব্দ করার উপায় ঠাওরাতে লাগলুম। সেদিন একটা সভায় আমাদের সভাপতি অনেক কিছু বল্লেন। সে সব আমরা বিশেষ কিছুই বুঝিও নি, আজ তার একটা কথাও মনে নেই—কেবল মনে আছে, তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে, ইচ্ছে কর্‌লেই শ্রীকৃষ্ণকে স্বচক্ষে দেখা যায়।

এই কথাটা নিয়ে আমাদের ক্লাসে হৈ-চৈ পড়ে গেল। রাধানাথ তা'র বড় বড় চোখ তুলে বল্লে, "সব মিছে কথা। তোমরা ত সব কেষ্ট ঠাকুরের ভক্ত, তোমরা কেউ এ যাবৎ তাঁকে দেখেছ?"

আমরা বল্লুম, "ইচ্ছে তেমন নেই, তাই দেখিনি। তুমি ইচ্ছে কর্‌লে তুমিও দেখা পাবে।"

রাধানাথ বল্লে—"আচ্ছা, আমি দেখবার ইচ্ছে করব,—দেখি, দেখা হয় কি না।"

আমরা চাপা গলায় সভয়ে বল্লুম, "আচ্ছা দেখো, নিশ্চয়ই দেখা হবে।" এর পর আমাদের কাণ্ডকারখানা যা সব হ'ল, তা মনে ক'রে হাসিও পায়, লজ্জাও হয়। কোন্ রকম করে যাত্রার শ্রীকৃষ্ণের সাজ যোগাড় করলুম। তার পর আমাদের গ্রামে এক বাড়ীতে একটী সুন্দর দেখ্‌তে ছেলে এসেছিল, তাকে বেশ ভাল করে "কেষ্ট ঠাকুর" সাজালুম। সাজিয়ে তা'কে ঠিক্ সন্ধ্যার একটু পরে—মাষ্টারের কাছে পড়ে যে কদমতলা দিয়ে রাধানাথ

বাড়ী ফেরে—সেখানে সেই ছেলেটিকে দাঁড় করিয়ে রাখলুম। ছেলেটি তার কাল কাল ডাগর চোখ দুটি মেলে যখন ত্রিভঙ্গমুরারি হ'য়ে কদমতলায় বাঁশী নিয়ে দাঁড়াল, তখন আমরা আস্তে আস্তে কিছু দূরে একটা বাঁশ বনে গিয়ে লুকিয়ে রইলুম।

রাধানাথ জ্যোৎস্নার আলো-ছায়ায় শ্রীকৃষ্ণকে কদমতলায় দেখেই ত একেবারে ভয়ে মাটিতে বসে পড়ল। তখন আমাদের সাজানো শ্রীকৃষ্ণ, আমাদেরই যোগাড়-করা এক পিতলের রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি রাধানাথকে দিয়ে বল্লে "ভয় নেই, বৎস রাধানাথ, তুমি এই রাধাকৃষ্ণ রোজ পূজো কোরো।" এই বলেই সে ধীরে-ধীরে, অন্ধকারে মিশিয়ে আমাদের কাছে চ'লে এল। আমরা সেখান থেকে দৌড়ে যে যার বাড়ী পালালুম।

এ দিকে, সেই রাস্তা দিয়ে কিছু পরে চাটুয্যে মশাই লণ্ঠন্ হাতে ফির্‌ছিলেন। তিনি ত রাধানাথের মুখে সমস্ত কথা শুনে, একেবারে তা'কে কোলে করে নাচতে নাচতে বাড়ী এসে উপস্থিত।

সমস্ত গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। পর দিন সকালে দলে দলে পুরুষ, মেয়ে, রাধানাথের পাওয়া কেষ্ট ঠাকুর দেখতে আসতে লাগল। আমরাও ভয়ে ভয়ে দেখতে গেলুম। দেখি যে, রাধানাথ বেচারা একটা খাটের উপরে জড়সড় হ'য়ে বসে আছে,—তার সামনে সেই রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি রাখা হয়েছে—আর ফুল, ফল, বিল্বপত্রে রাধানাথকেও প্রায় ঢেকে ফেলেছে। রাধানাথের বাপ-মা উঠোনময় ছুটোছুটি করচেন। দলে-দলে লোক একবার রাধানাথকে দেখ্‌ছে, আবার একবার কদমতলায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সদ্য চলে যাওয়ার ছোট-ছোট পায়ের চিহ্ন দেখে আসছে।

দিনের পর দিন এই কেষ্ট পাওয়ার ব্যাপার আমাদের গ্রাম ছেড়ে আরো দূরের সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাধানাথদের বাড়ী সমস্ত দেশের এক তীর্থস্থান হ'য়ে উঠ্‌ল। রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিটী এক বিশাল মন্দিরে স্থাপিত হয়েছে। রাধানাথের দেওয়া মাটি নিয়ে দলে দলে লোক কবচ্ পর্‌তে লাগল। সে মাটির কবচ যে পরবে, তা'র জ্বরারোগ্য রোগও সারবে।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ এমন গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়াল যে, আমরা যে কয়েকটি ছেলে এই চক্রান্তের মূলে ছিলুম, তাদের সকলেরই মনে তখন বেশ একটু ভয় হ'তে লাগল। কিন্তু তখন আর ফিরবার পথ ছিল না। তখন আমরা যদি সমস্ত ঘটনা খুলেও বলতুম, কেউই আমাদের কথা বিশ্বাস করত না। তাই আমরা চুপচাপ রইলুম। তবে গ্রামে আমরা কয়েকজন রাধানাথের তেমন ধার ধারতুম না। প্রবীণেরা বলতেন, "ছেলেগুলো আজকাল নাস্তিক হ'য়ে উঠেছে।"

যাক্, আমরা বড় হ'য়ে গ্রাম ছেড়ে সব বিদেশে চাক্‌রী করতে বেরিয়ে পড়লুম।—রাধানাথের চাকরীর দরকার নাই। কত লোক তার শিষ্য। মেয়েরা ত রাধানাথ ঠাকুরের নাম বলতে অজ্ঞান।

এই রকম করেই যদি চলত, তো, আজ আর এই কাহিনী সকলের সামনে বলবার কিছুই থাকত না। কিন্তু এই পূজা-অর্চ্চনার আড়ালে প্রকৃতি দেবী বোধ হয় এত দিন মুচ্‌কি মুচ্‌কি একটু হাস্‌ছিলেন। তাঁর কাছে সাচ্চা ঝুঁটা কিছুই লুকোন থাকে না,—প্রতিশোধ তিনি নেবেনই।

(২)

ভট্‌চায্‌দের বাড়ীর বড় গিন্নী বিধবা হ'য়ে অবধি ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন দিয়েছেন। তাঁর নিজের ছেলেপুলে ছিল না। কুন্তীই ভট্‌চায্-গিন্নীর আদরের ধন। ভট্‌চায্-গিন্নীর বিধবা বোন মৃত্যুর সময় কুন্তীকে তাঁর হাতেই সমর্পণ করে গিয়েছিলেন।

ভট্‌চায্-গিন্নী প্রতি দিন রাধানাথ ঠাকুরের কাছে গিয়ে ধর্ম্ম-কথা শোনেন, আর রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন। তাঁর সঙ্গে এক সাজি নানা রকমের ফুল সাজিয়ে নিয়ে কুন্তীও যায়। ভোরের আলোতে, ভিজে এলো চুল মেলে, চেলীর কাপড় পরে, কুন্তী যখন মাসীমার সঙ্গে রাধানাথের বাড়ী যায়, তখন গাঁয়ের লোক পবিত্র সৌন্দর্য্যের এই মূর্ত্তি দেখে ধন্য ধন্য করতে থাকে।

রাধানাথের রাধাকৃষ্ণ এত দিনে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। যে দিন থেকে এই ভট্‌চায্-গিন্নী তার শিষ্যা হলেন, সেদিন থেকে রাধানাথ আবার কেমন যেন একটু সজাগ হয়ে উঠল। মন্দিরের শঙ্খ, ঘণ্টা আবার পুরোদমে বাজ্‌তে লাগল। ভট্‌চায্-গিন্নীর সঙ্গে সঙ্গে কুন্তী যখন

সাষ্টাঙ্গ হয়ে রাধানাথকে প্রণাম করল, তখন, কেন জানি না, রাধানাথেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এত দিন কত শিষ্য, শিষ্যা এসেছে, গিয়েছে,—রাধানাথ তাদের ধর্ম্ম-কথা শোনাত,—কিন্তু এবার তা হ'য়ে উঠল না। কুন্তীকে দেখ্‌লেই রাধানাথের কথা বন্ধ হয়ে যেত, সে তার সমস্ত উন্মুখ দৃষ্টি নিয়ে এই বালিকার দিকে তাকিয়ে থাকত। ভট্‌চায্-গিন্নীকে তার আর কোন উপদেশ দেওয়া হ'ত না।

কিন্তু সোহাগ-লোলুপ শিষ্যদের কাছ থেকে কিছু চাইবার যো নেই,—তারা ঠাকুরের, ভট্‌চায্-গিন্নীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বুঝতে পেরে বলতে লাগল—অল্প দিনেই ভট্‌চায্-গিন্নী ঠাকুরকে কেমন হাত করে নিয়েছে।

যাক্—এক দিন রাধানাথ মুখ ফুটে ভট্‌চায্-গিন্নীকে বল্লে—"বাছা, তোমার এই কুন্তী মেয়েটীর ধর্ম্মভাব আর ভক্তি দেখে আমি বড় খুসি হয়েছি। আমি দুপুর বেলা মেয়ে শিষ্যদের মহাভারত পড়ে শোনাই,—তুমি কুন্তীকে নিয়ে এসো,—তোমার, কুন্তীর, দুজনেরই উপকার হবে।"

গুরুর এই অত্যধিক অনুগ্রহে ভট্‌চায্-গিন্নী পুলকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভট্‌চায্-পরিবার বিপুল পরিবার—ভট্‌চায্-গিন্নীর দেবর হরিস ভট্‌চায্ গ্রামের মধ্যে বেশ সম্পত্তিপন্ন লোক। তাঁর বাড়ীতে লোকজন, চাকর-বাকরের অভাব নেই। এই সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে কাজ শেষ করতে প্রায় বেলা শেষ হয়ে যায়। ভট্‌চায-গিন্নীর মহাভারত-সভায় আসতে প্রায়ই দেরী হ'ত। এক-এক দিন তার যাওয়াই হত না। সেদিন রাধানাথের মহাভারত সভা কেমন যেন জম্‌ত না। রাধানাথ ভট্‌চায্-গিন্নীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেমন আনমনা ভাবে কুন্তীর দিকে চোখ ফেরাত, কুন্তী তখন তার বড় বড় ডাগর চোখ দুটি মেলে রাধানাথের দিকে তাকাত। এই চোখের মিলন রাধানাথ ভট্‌চায্-গিন্নীর দৃষ্টি এড়িয়েই করত। কুন্তীর কিন্তু তেমন সঙ্কোচ ছিল না।

রাধানাথের বিস্তৃত বক্ষ, মাথায় কুঞ্চিত একরাশ চুল, চন্দন-চর্চ্চিত মুখখানি, হৃষ্ট-পুষ্ট দেহখানির দিকে কুন্তী ভক্তি-গদগদ ভাবে মুগ্ধ চিত্তে যখন পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, তখন ক্ষণে ক্ষণে মহাভারত-সভায় রাধানাথের সমস্ত শরীরে পুলকের সঞ্চার হ'ত।

মহাভারত শ্রোতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিল কুন্তী। ভট্‌চায্-গিন্নী মাঝে-মাঝে শুন্‌তে-শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়তেন। তখন রাধানাথ এক একবার তার শ্রোতাদের মহাভারত সম্বন্ধে প্রশ্ন করত, সে প্রশ্নের সব চেয়ে সদুত্তর দিতে পারত কুন্তী।

উৎসাহে রাধানাথ সংস্কৃত বাংলায় মহাভারতের নানা রকম ব্যাখ্যা আরম্ভ করত। কুন্তী মুগ্ধ চিত্তে, সে ব্যাখ্যা কিছু না বুঝলেও, খুব মনোযোগ সহকারে শুনত।

রাধানাথের মন্দিরে এবার প্রায়ই উৎসবের ঘটা সুরু হ'ল। সে উৎসবের ভোগ রান্না, পরিবেষণ করার ভার ভট্‌চায্-গিন্নীর উপর। কুন্তীও সেদিন অক্লান্ত প্রাণে উৎসাহে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত; কোমরে আঁচল জড়িয়ে, এলো চুলটা কোন রকমে জড়িয়ে, কাজে লেগে যেত।

রাধানাথ তার অসংখ্য শিষ্যদের আশীর্ব্বাদ করচে, কখনও কখনও গীতার ব্যাখ্যা করচে, আর এক একবার অবসর মত এসে ভট্‌চায্-গিন্নীকে জিজ্ঞেস করচে—"কি রকম চলচে?" এক গাল হেসে গিন্নী উত্তর দিচ্ছেন—"কিছু ভাবনা নেই, ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে সব ঠিক চলচে।"

তার পরেই রাধানাথ হঠাৎ যেন কুন্তীকে দেখতে পেয়ে বলে উঠত, "আহা, কুন্তী, তুমি কেন এত ছুটোছুটি করচ, শেষে একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে?"

কুন্তী গুরুর এ কথা শুনে একটু স্মিত-হাস্যে গুরুর দিকে ডাগর চোখ দুটি মেলে তাকাত—তার বাম চোখের উপরে প্রায়ই অসাবধানে একগোছা কাল চুল এসে পড়ত। তার আড়াল থেকে কুন্তীর ডাগর চোখের দিকে তাকিয়ে রাধানাথের মত অকবির মনেও কবিত্ব জেগে উঠত, সেই হরিণীর মত চোখ দেখলে তার মনে হত, কুন্তী যেন তার চোখের ভিতর দিয়ে কোন্ সুদূরের, কোন্ অনন্তের সন্ধান জানিয়ে দিচ্ছে।

কুন্তীর সঙ্গে রাধানাথের পরিচয়ের পর এক বৎসর কেটে গেল। এত দিনে তাদের পরিচয় আরো নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। ভট্‌চায্-গিন্নী বুঝেছেন, রাধানাথ ঠাকুরের কৃপা তাঁর চেয়ে কুন্তীর উপরই অধিক। কিন্তু তাঁর মনে অন্য কোন সন্দেহ হয়নি। এদিকে রাধানাথের মন একেবারে

রঙীন হয়ে উঠেছে। এমন কি, শোনা যায়, রাধানাথ না কি অনেক কষ্টে কুন্তীর নামে দু' একটা কবিতাও রচনা করেছিল। কিন্তু প্রবীণের দল চিরকালই যৌবনের পথে বাধা দেয়,—এবারও একটা বাধা এসে উপস্থিত হল। কুন্তীর বয়স পনর হয়েছে,—ভট্চায্-গিন্নী তার দেবরকে ধরে বসল,—এই শ্রাবণেই কুন্তীর বিয়ে দেওয়া দরকার,—বয়সের মেয়ে, আর বেশী দিন রাখা ভাল দেখায় না।

৩

সেদিন ভোর থেকেই সমস্ত আকাশ ছেয়ে আষাঢ় এসেছে। গ্রামের পাশের ছোট নদীটি ভরা-যৌবনের বেগে ছল ছল, কল কল শব্দে ছুটে চলেছে। এইবার আষাঢ়ের ধারা নামবে, এই প্রতীক্ষায় গ্রামের বধূরা পুকুরের কাজ সেরে নিচ্ছে।

কুন্তী পুকুরে স্নান করে এক কলসী জল কাঁখে করে বাড়ী ফিরচে, এমন সময় রাধানাথ তার সামনে এসে উপস্থিত। আজ রাধানাথের মুখ আষাঢ়ের মেঘের চেয়ে কালো, কেমন একটা উস্কো খুস্কো ভাব তার সমস্ত চেহারায় ফুটে উঠেছে। রাধানাথ বল্লে, "কুন্তী, তুমি এই ৩।৪ দিন আর মন্দিরে যাচ্চ না যে?"

কুন্তী মুখ নীচু করে বল্লে, "মাসীমার অসুখ করেছে, তাই আর যাওয়া হয় না।"

রাধানাথ একটু মলিন হাসি হেসে বল্লে, "তোমার না কি আর আমার মহাভারত পড়া শুনতে ভাল লাগে না?"

কুন্তী বল্লে,—"কে বল্লে, মিছে কথা! আমি কতবার আপনাকে বলেছি, আপনার কাছে মহাভারত শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।" এই বলেই কুন্তীর সমস্ত মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, সে আর কথা বলতে পারল না, মাথা নীচু করেই রইল। রাধানাথ কেন জানি না, খুসী হয়ে উঠল। সে উৎসাহের সঙ্গে বল্ল, "কুন্তী, আজ নিশ্চয়ই মন্দিরে যেয়ো, আজ মহাভারতের খুব ভালো জায়গা পড়া হ'বে।"

কুন্তী মুখ না তুলেই মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানালো। রাধানাথ আস্তে আস্তে তার পথ ছেড়ে দাঁড়াল,—কুন্তী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঝর ঝর শব্দে আকাশের মনের কথা আজ আষাঢ়ের মেঘ ধরণীর কাণে কাণে জানিয়ে দিচ্চে। রাধানাথের আজ এই বর্ষা যেন বিধাতার নিতান্ত নিষ্ঠুরতা বলে মনে হচ্ছে। কখন বৃষ্টি থামবে, তার জন্যে সে ব্যাকুল নয়নে বার বার মেঘের দিকে তাকাচ্চে।

মাঝে-মাঝে বৃষ্টির বেগ যখন একটু কমে, তখন এক-একবার রাধানাথের মহাভারতের এক-একটি শ্রোতা এসে জুটতে লাগল। কিন্তু আজ রাধানাথ যেন কেমন চঞ্চল,—আকাশের মেঘ তারও বুকের উপর আজ ছায়া ফেলেছে।

কিছুক্ষণ পরে কুন্তী তাদের বাড়ীর পাশের হারুর-মার সঙ্গে এসে উপস্থিত হ'ল। তাদের কাপড় একটু একটু ভিজেছে। রাধানাথ জিজ্ঞাসা করলে, "কৈ, ভট্চায্-গিন্নী এলেন না যে? তাঁর বুঝি অসুখ করেছে?"

হারুর মা বল্ল—"না, তাদের বাড়ীতে আজ কারা সব এসেছে; তাই তার আসা হ'ল না। কুন্তীকেও আসতে দিচ্ছিলেন না,—মেয়ে কান্নাকাটি করে এসেছে,—মহাভারত শোনবার জন্যে মেয়ে একেবারে পাগল। ভট্চায্-গিন্নীর অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি তো—ভালই আছেন তবে বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম আসচে, তাই আর আসতে পারেন না।" রাধানাথ শঙ্কিত মনে জিজ্ঞাসা করল, "কি কাজ কর্ম্ম?"

হারুর-মা এক গাল হেসে কুন্তীর দিকে চেয়ে বল্ল, "তা বুঝি জানেন্ না,—কুন্তীর বিয়ের যোগাড় হ'চ্ছে যে।" কুন্তীর চোখ, মুখ, কাণ লজ্জায় একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছে। ধরণী দ্বিধা হলে যেন সে রক্ষা পায়, এমনি রকম তার মনের অবস্থা। রাধানাথ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল, "বেশ; এবার আরম্ভ করা যাক্।"

সেদিন পাণ্ডবদের বনবাস পড়তে পড়তে রাধানাথের চোখে বার বার জল আসতে লাগল। তার স্বর বার বার বন্ধ হয়ে আসচে। সেদিন সে আর শ্রোতাদের কারো মুখের দিকে তাকাল না। পড়া শেষ করে রাধানাথ অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে শিষ্যাদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে লাগল। এমন সময় হারুর-মা হঠাৎ মোক্ষদার সঙ্গে কি একটা বিশেষ দরকারী কথা বলতে বলতে একটু অন্যত্র গিয়াছে। রাধানাথ এবার আর সামলাতে পারল না।

সে অন্য শিষ্যাদের কোনরকমে তাড়াতাড়ি বিদায়

করে কুন্তীকে একলা পেয়ে বল্ল, "কুন্তী, তোমার বিয়ে সত্যি?"

কুন্তী লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে মাথা নীচু করে রইল। রাধানাথ ভাঙা গলায় অত্যন্ত জড়িত স্বরে বল্ল, "কুন্তী, তুমি জান, আমি তোমায় কত ভালবাসি?" এবার কুন্তীর, কেন জানি না, চোখ ভরে জল এল,—সে তার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে মহা বিব্রত হ'য়ে উঠল। রাধানাথ হঠাৎ আত্ম-সংবরণ করতে না পেরে, কুন্তীর সুকোমল হাতখানি ধরতে গেল। কুন্তী হাতখানি সরিয়ে নিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। রাধানাথ পাগলের মত জিজ্ঞাসা করল, "কুন্তী, তুমি আমায় ভালবাস না"?

এমন সময় হারুর-মা "কুন্তী" বলে ডাক দিল। কুন্তী "মাসী, যাই" বলে রাধানাথকে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি চলে গেল। রাধানাথ বজ্রাহতের মত বসে রইল।

বাইরে সন্ধ্যা হয়ে আসচে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দু' একটি তারা দেখা যাচ্চে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে এখন কেবল হু হু করে জোরে হাওয়া বইচে। বোধ হয়, সমস্ত রাত্রি, রাধানাথ সেখানে বসে ছিল, সেখানেই সে বসে রইল।

রাত্রির অন্ধকারে রাধানাথ সমস্তই অন্ধকার দেখেছিল। ভোরের আলোতে তার মনে আবার আশার আলোক জেগে উঠল। কাল রাত্রে তার মনে হয়েছিল, কুন্তী তাকে একটুও ভালবাসে না। আজ প্রভাতে তার মনে হ'ল, কুন্তী তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসার কথা বলার পরে কুন্তী যে কোন উত্তর দিল না, এতে এখন সে আশার অর্থই খুঁজে পেল। সে যদি সত্যই না ভালবাসত, তা হ'লে সে ভালবাসার কথা উচ্চারণ করার পরেই উঠে চলে যেত। এবং লজ্জায় তার মুখ লাল হত না। হাতখানা সে অবহেলা করে সরায় নি, সে চোখের জল মুছবার জন্যেই সরিয়ে নিয়েছিল।

আর সে যদি ভালোই না বাসে, তাহ'লে সে এত কান্নাকাটি করে মহাভারত শুনতেই, বা কেন আসে? আর ভালবাসার কথা বলার পরও সে আবার বিদায়ের সময় প্রণামই বা করল কেন? সে ত তাকে ঘৃণা করেই চলে যেতে পারত? না, না, কুন্তী আমার,—কুন্তী একমাত্র আমার, কুন্তী সুখী হউক্। উৎসাহে রাধানাথ সমস্ত রাত্রির নৈরাশ্যের চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। সে আর বিলম্ব করতে রাজী নয়, তার মনের কথা আর সে লুকিয়ে রাখবে না। সে ভট্চায্-গিন্নীকে ডাকিয়ে সেই প্রভাতেই তার মনের সব কথা খুলে বল্ল। ভট্চায্-গিন্নী "এ তো খুব সৌভাগ্যের কথা" বলে বল্লেন, "কিন্তু এ সম্বন্ধে একবার আমার দেওরের সঙ্গে কথা বলতে হবে,—সে যে আর এক জায়গায় কথা বলেছে।"

মহাউৎফুল্ল মনে ভট্চায্-গিন্নী তাঁর দেবরকে রাধানাথ ঠাকুরের ইচ্ছা জানালেন। তাঁর দেবর একটু গম্ভীর প্রকৃতির। তিনি এক দিন চিন্তা করে বল্লেন "দেখো, বৌদি, আমার মত যদি জিজ্ঞাসা কর, তো আমি বলি, রাধানাথের সঙ্গে বিয়ে দিও না। রাধানাথের চাল নেই, চুলো নেই, পাগলা রকমের,—ওর সঙ্গে বিয়ে দিলে কুন্তী কিন্তু সুখী হবে না।"

ভট্চায্-গিন্নী চাপা গলায় বল্লেন, "তা' ঠাকুরপো, তুমি আমার লক্ষ্মণ দেবর, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। কুন্তী আমার মা-মরা মেয়ে, ওকে আমি একটা ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। আমি আর ক'দিন বা বাঁচব? কিন্তু ঠাকুরপো, একটা কথা। রাধানাথ ঠাকুর কুন্তীকে যে এতটা ভালবাসেন তা তো জানতুম না। আর আমার বিশ্বাস কুন্তীও ওকে ভালবাসে। এখন এর কি উপায় করা যায়?"

হরিশ ভট্চায্ এক-টিপ নস্যি নিয়ে একটু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন "বৌদি, রাধানাথ ঠাকুরের কি কুন্তীর সঙ্গে বিয়ে সাজে? তিনি কেষ্ট-পাওয়া ঠাকুর, তাঁর ত রাধাই আছেন, এ'সব তো তাঁর লীলা। খবরদার, খবরদার, কেষ্ট-পাওয়া ঠাকুরের সঙ্গে কুন্তীর বিয়ে দিয়ে ইহকাল পরকাল ক্ষুইয়ো না।"

দেবরের এই কথায় ভট্চায্-গিন্নী যেন কিনারা পেলেন। তিনি রাধানাথের সাম্‌নে এসব কথা বল্‌তে না পেরে, তার মাকে গিয়ে সব কথা খুলে বল্লেন। রাধানাথের মা তো শুনে অবাক! কুন্তী মেয়েটিকে তাঁরও খুব ভাল লাগত। আর তা ছাড়া, কুন্তীর সঙ্গে বিয়ে হলে হরিশ ভট্চায়ের মত বড়লোকের সঙ্গে রাধানাথের একটা সম্বন্ধও হ'ত। কিন্তু রাধানাথ যে কেষ্ট পেয়েই সব মাটি করে ফেলেছে,—সংসারে তার কোন মন নেই।

এই ভেবে রাধানাথের মা আজ না কেঁদে থাকতে পারলেন না।

রাধানাথের মা আজ আহারের সময়, ধীরে-ধীরে, সব কথা রাধানাথকে খুলে বল্লেন। রাধানাথ হেঁট্‌মুখে সব কথা শুনতে শুনতে খেতে লাগল। তার চোখ ভরা জল তা'র মায়ের দৃষ্টি এড়াল না। মা বল্লেন "তা, বাছা, কুন্তী ছাড়া কি আর মেয়ে নেই? তুই যদি বলিস, আমি খুব ভাল ভাল মেয়ে আন্‌তে পারি।"

রাধানাথ গম্ভীর ভাবে বল্ল, "না, তোমরা আমার কথা ছাড়া কিছু কোরো না।" রাধানাথের স্বভাব রাধানাথের মার বেশ ভাল করেই জানা ছিল। তিনি আর কোন কথা বল্লেন না। রাধানাথ তার পরে ভট্‌চায-গিন্নী বা কুন্তীকে আর কোন দিন একা পায়নি। একদিন রাত্রে সে তার মন্দিরের রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, শঙ্খ, ঘণ্টা সব নদীর জলে ফেলে দিয়ে এল। পরদিন রাধানাথের শিষ্যেরা বলতে লাগল, "যে বেটা রাধাকৃষ্ণ চুরি করেছে, তার আর রক্ষা নেই।" রাধানাথ এসব কথার কোন উত্তর দিল না, সে যে সেই চুপ করল, আর তার মুখে কোন কথা—সে যতদিন বেঁচে ছিল,—গ্রামের কেউ শুনতে পায়নি। এলোমেলো মাথাভরা চুল, মুখভরা দাড়ি, বড় বড় লাল চোখ আর গম্ভীর মুখ নিয়ে সে যখন গ্রামের পথে চলে তখন ছোট ছেলে-মেয়েদের ত দূরের কথা, আমাদেরই ভয় করে।

সাময়িকী

এ মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে পরলোকগত ধর্ম্মাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। কলিকাতার দক্ষিণে বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে কলিকাতা হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছু কাল পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন; তাহার পর মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার হন এবং সেখান হইতেই শেষে অবসর গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তাঁহার সময়ে যে সমস্ত প্রথিতনামা সাহিত্য-সেবক ছিলেন, তিনি তাঁহার অন্যতম। ইনি ব্রহ্মসাধন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, আত্ম-জীবনচরিত, সেকাল ও একাল প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা, তাঁহার মহানুভবতা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। শেষ জীবনে তিনি দেওঘরে অবস্থান করিতেন এবং সেখানেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর পরলোকে গমন করেন। প্রখ্যাত-নামা শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র ঘোষ রাজনারায়ণ বাবুর দৌহিত্র। আমরা এখন হইতে প্রতি মাসেই ভারতবর্ষের প্রচ্ছদ পটে, যে মনীষি যে মাসে পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতিকৃতি সেই মাসে প্রকাশ করিব।

কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। চীন দেশের পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের নিমন্ত্রণ পাইয়া ঠাকুর মহাশয় সেখানে গমন করেন; চীন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এমন কি, চীন সম্রাট পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কবি, ভারতের কবি, বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর, সুচিন্তিত ও কবিজনোচিত বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই পুলকিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, প্রাচ্য-দেশবাসীদিগের মহা-সম্মিলন প্রয়োজন হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি এই মহাব্রত সংসাধনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি। চীনদেশে তিনি যে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

শুনিলেও হৃদ্‌কম্প হয় যে, এই কলিকাতা সহরে দুই হাজারের উপর বালিকা পশুপ্রকৃতি কামান্ধ নরকুল-কলঙ্কদিগের কামানলে উৎসর্গীকৃত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে! সহরের এই অবস্থা,—মফস্বলে যে এমন কতশত বালিকা এই পাপের ভার বৃদ্ধি করিতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে,

কে-ই বা তাহার প্রতীকারের জন্য অগ্রসর হয়। কলিকাতায় সেদিন শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় স্থির হইয়াছে যে, এই সকল বালিকাকে উদ্ধার করিয়া কোন আশ্রমে রাখিয়া প্রতিপালন করা উচিত। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীযুক্ত লাট বাহাদুর সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। যতদূর বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহাতে সত্বরই একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং অনেক বালিকা নরপশুদিগের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

কিন্তু, এই উপায়ে কি এ পাপ-ব্যবসায়ের দমন হইবে? কেন সহস্র সহস্র বালিকা এই সহরে এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের জন্য আনীত হয়? মালের চাহিদা থাকিলেই মাল আমদানী হয়। এই সকল বালিকারও চাহিদা আছে, তাই সরবরাহ করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। বলিতে দুঃখ হয়, লজ্জায় অধোবদন হইতে হয় যে, দেশের অনেক শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি না কি এই ব্যবসারের খরিদদার! যদি এই পাপ-ব্যবসায় দমন করিতে হয়, তাহা হইলে এই সব খরিদদারদিগকে সায়েস্তা করিতে হইবে; তাহা হইলেই চাহিদা কমিয়া যাইবে, সুতরাং আমদানীও কমিবে। যাঁহারা মনে করেন, সভাসমিতি করিয়া বক্তৃতা দিলেই কাজ হইবে, তাঁহারা ভ্রান্ত। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। বক্তৃতায় কাজ হইবে না। এ সম্বন্ধে কাজে নামিয়াছে সিন্ধুদেশ। সেখানে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার সভ্যেরা বক্তৃতা করিবেন না, ধর্ম্মের দোহাই দিবেন না। তাঁহারা দলে দলে গণিকালয় ও সেই শ্রেণীর স্থান সকলে পাহারা দিবেন। যে সমস্ত লোক এই সকল স্থানে যাতায়াত করে, যাহারা এই পাপের প্রশ্রয় দেয়, তাহাদিগকে প্রথমে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, সেই সকল লোকের নামধাম, তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ প্রমাণসহ সংবাদ-পত্রাদির মারফৎ বা অন্য উপায়ে দেশময় ঘোষিত করিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিবেন। এ পাপ নিবারণের ইহাই এক মাত্র পথ। আমাদের দেশেও কলিকাতায় ও বড় বড় সহরে এই প্রকার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে ধর্ম্ম ভয়ে না হউক, লোকলজ্জা ও মানসম্ভ্রমের ভয়ে অনেক নরপিশাচ সাবধান হইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টে একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়া দুই এক অঙ্কের অভিনয় শেষ হইতে না হইতেই অকস্মাৎ যবনিকা পড়িয়া গেল; দর্শকেরা ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। ব্যাপার এই—বিগত বজেট আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশের ভোটে বাঙ্গলার মন্ত্রীদিগের বেতন সম্পূর্ণ নামঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর বিগত জুলাই মাসে যে অধিবেশন হইবার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মন্ত্রীদিগের বেতনের প্রস্তাব পুনরায় তুলিবার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। গবর্ণমেণ্ট-পক্ষের ভরসা ছিল যে, বজেট-বিতর্কের সময় যখন একটী ভোট অধিক হওয়ায় মন্ত্রীদিগের বেতন নামঞ্জুর হইয়াছিল, তখন এবারে যেন-তেন প্রকারেন ভোট বাড়াইয়া প্রস্তাবটী মঞ্জুর করাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে; সেই ভরসাতেই বেতন নামঞ্জুরী সত্ত্বেও মন্ত্রীদিগকে পদস্থ রাখা হইয়াছিল।

কিন্তু, সরকার পক্ষ আইনের ধারাগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়; কারণ উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইলেই ব্যবস্থাপক সভার দুইজন সদস্য, এই বিজ্ঞাপন রদের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিলেন। তখন সভার অধিবেশনের মাত্র তিন চারি দিন বাকী; সুতরাং আবেদনকারিগণ মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে ঐ প্রস্তাব সভায় উঠিতে না পারে, তাহার জন্য ইনজংসন প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা আইন খুলিয়া দেখাইলেন যে, তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, কোন ব্যয়ের প্রস্তাব যদি একেবারে অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সে বৎসর উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হইতে পারিবে না। হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, আইনের ধারাগুলি দেখিয়া ইনজংসন মঞ্জুর করিয়া বিচারের দিন ফেলিলেন।

তিন দিন পরেই সভার অধিবেশন, এদিকে সভাচার্য্যের উপর হাইকোর্ট ইনজংসন জারী করিলেন; সুতরাং বেগতিক

দেখিয়া বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুর প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য, পরে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হইল।

এইবার দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ। যে দুইজন ভদ্রলোক এই মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, ব্যবস্থাপক সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, সুতরাং সভাপতি যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাহাও বাতিল হইয়া গেল, তখন তাঁহারা হাইকোর্টে পুনরায় আবেদন করিলেন যে, সভাই যখন বাতিল হইল, তখন আর তাঁহারা মামলা চালাইবেন না, তাঁহাদের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সফল হইয়াছে। কিন্তু, আর এক অভিনেতা সহসা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন; তিনি বলিলেন, যাঁহারা পূর্ব্বে আবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা করদাতা রূপেই আবেদন করিয়াছিলেন; তিনি নিজেও একজন করদাতা; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি এই মামলা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন, কিন্তু তিনিও যখন করদাতা তখন তিনি এই মামলার বাদী—মামলা চালাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী; অতএব তিনি মামলা তুলিয়া লইতে দিবেন না, তিনি নিজে মামলা চালাইবেন। হাইকোর্ট বলিলেন, তা ত ঠিক কথাই; এই তৃতীয় ব্যক্তিই মামলা চালাইবেন। তখন ইনজংসনের মামলার বিচারের দিন স্থির হইল; উভয় পক্ষের উকীল ব্যারিষ্টারগণ মহা উৎসাহে আইনের নজীর খুঁজিতে লাগিলেন।

এমন সময় একেবারে যবনিকা পতন! যে দিন হাইকোর্টে এই মামলার শুনানির দিন, সেই দিন প্রাতঃকালে ভারত গবর্ণমেণ্টের গেজেটের এক অতিরিক্ত পত্র প্রকাশিত হইল। তাহাতে ঘোষিত হইল যে, ব্যবস্থাপক সভার আইন সংশোধিত হইল। এই আইন হইল যে, কোন ব্যয়ের প্রস্তাব যদি একেবারে অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সেই বৎসরেই উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হইতে পারিবে। ব্যস্, এত গণ্ডগোল, এত আইন নজীর, এত উকীল ব্যারিষ্টার, এত বড় হাইকোর্ট—সব চুপ। লাট-সাহেবের অধিকার আছে, তিনি এক কথায় 'পারিবে না' কথাটীর ছোট্ট 'না' শব্দটী তুলিয়া দিলেন; সব শেষ হইয়া গেল। ২৬এ আগষ্ট আবার সভা বসিবে, মন্ত্রীদিগের বেতনের প্রস্তাবও উঠিবে। আবার ভোট-যুদ্ধ হইবে। সকলে ভাবিতেছেন 'কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয়।'

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি প্রণীত "বোলশেভিকবাদ" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য—৸০।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য—২৲।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "সখের সয়তানী" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য—১৲।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "স্বর্ণমন্দির" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য—১।০।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কবি প্রণীত "রাণীর রেণুদা" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য—১৲।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "নায়েব মহাশয়" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য—২॥০।

শ্রীসুরুচিবালা বসু প্রণীত "ঝরাপাতা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' ২৫শে ভাদ্র ও কার্ত্তিক সংখ্যা ১০ই আশ্বিনের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণকে আশ্বিনের বিজ্ঞাপন ১৫ই ভাদ্রের পূর্ব্বে এবং কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপন ৩রা আশ্বিনের পূর্ব্বে ঠিক করিয়া দিতে হইবে। আশ্বিনের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে ও কার্ত্তিকের পরিবর্ত্তন ২রা আশ্বিনের মধ্যে হস্তগত হওয়া প্রয়োজন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

দরগা-দুয়ারে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.